প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক সমাজতত্ত্ব

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায়

ESO-05 : 17-20

	রচনা	সম্পাদনা
একক 58	অধ্যাপিকা মধুমিতা সেন	অধ্যাপিকা রেখা সাহা
একক 59	ঐ	ঐ
একক 60	ঐ	ঐ
একক 61	ঐ	ঐ
একক 62	ড. বাসবী চক্রবর্তী	অধ্যাপক অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়
একক 63	ঐ	ঐ
একক 64	ঐ	ঐ
একক 65	ঐ	ঐ
একক 66	ড. বাসবী চক্রবর্তী	অধ্যাপক প্রশান্ত রায়
একক 67	ঐ	ঐ
একক 68	ঐ	ঐ
একক 69	ঐ	ঐ
একক 70	অংশুমান চক্রবর্তী	অধ্যাপক স্বপন কুমার প্রামাণিক
একক 71	ঐ	ঐ
একক 72	ঐ	ঐ
একক 73	ঐ	ঐ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ESO – 05

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়

17

একক	58	নগরায়ণের অর্থ সূচনা ও প্রকৃতি	9-21
একক	59	নগরীয় সামাজিক কাঠামো ও নগরায়ণ সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ	22-40
একক	60	নগরের শ্রেণি কাঠামো : শ্রমিক শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ব্যবসায়ী শ্রেণি এবং এলটি বা অভিজাত শ্রেণি	41-55
একক	61	নগরায়ণের সমস্যা	56-61

পর্যায়

18

একক	62	কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব	65-82
একক	63	বার্জেস ও এককেন্দ্রিক মতবাদ/এককেন্দ্রিক বলয়তত্ত্ব	83-89
একক	64	বৃত্তকলা মতবাদ	90-95
একক	65	বহুকেন্দ্রিক মতবাদ	96-101

পর্যায়

19

একক 66 রৈখিক পারম্পর্যের ধারণা 105-118

একক 67 আধুনিক শহরের বিকাশ 119-132

একক 68 তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণ 133-147

একক 69 নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন 148-158

পর্যায়

20

একক 70 গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো 161-175

একক 71 গ্রামীণ অর্থনীতি : জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক স্বরূপ 176-186

একক 72 গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো : পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা 187-196

একক 73 গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী 197-208

ভূমিকা

সমাজবিজ্ঞানে নগরায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নতশীল এবং উন্নয়নশীল প্রায় সবদেশেই নগরায়ন প্রক্রিয়া সক্রিয়। ভারতীয় সমাজের বাস্তবিক দিক থেকে নগরায়ন ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে শুরু হয়। স্বাধীনতার পর নগরায়ন প্রক্রিয়ার গতি আরও দ্রুততর হতে থাকে। প্রথম এককে নগরায়নের অর্থ, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। নগরায়নের ফলে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়। কারণ শিল্পায়ন-নগরায়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিল্পায়নের ফলে নগরায়ন হয়। আবার নগরায়ন শিল্পায়নকে আহ্বান করে। একক ২-এ নগরায়নের ফলে সামাজিক কাঠামোর কী রকম পরিবর্তন হয় তা আলোচনা করা হয়। নগরায়ন সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করে থাকেন। এই এককেই নগরায়নের বিভিন্ন তত্ত্বগুলির উপর আলোকপাত করা হয়।

নগরের সামাজিক কাঠমোতে নানা শ্রেণির উদ্ভব হতে থাকে। নগর আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধায় পরিপূর্ণ থাকে। এই সুযোগ-সুবিধাগুলি যে শ্রেণির লোক যেমনভাবে সদ্ব্যবহার করে সে শ্রেণি সেইভাবে চিহ্নিত হয়। একক ৩-এ নগরের সামাজিক কাঠামোতে শ্রমিক শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ব্যবসায়ী শ্রেণি এবং এলিট বা অভিজাত শ্রেণির প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়। সর্বশেষে নগরায়ন সমস্যাযুক্ত প্রক্রিয়া নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছে নগরায়ন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নানা সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং একক ৪-এ নগরায়নের সমস্যাগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

একক ৫৮ ☐ নগরায়ণের অর্থ, সূচনা ও প্রকৃতি

গঠন

৫৮.১ উদ্দেশ্য

৫৮.২ প্রস্তাবনা

৫৮.৩ নগরায়ণের সংজ্ঞা

৫৮.৪ ভারতে নগরায়ণ : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৫৮.৪.১ প্রাচীন নগরের শ্রেণিবিভাগ

৫৮.৪.২ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে নগরায়ণের কিছু বৈশিষ্ট্য

৫৮.৪.৩ ঔপনিবেশিক যুগে নগরায়ণের নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

৫৮.৫ সমকালীন ভারতে নগরায়ণের নমুনা (pattern)

৫৮.৫.১ নগর বা শহরের সংজ্ঞা

৫৮.৫.২ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (demographic) দিক বা রূপ

৫৮.৫.৩ ব্যাপনস্থল (spatial) দিক বা রূপ

৫৮.৫.৪ অর্থনৈতিক রূপ বা দিক

৫৮.৫.৫ সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপ বা দিক

৫৮.৬ নগরায়ণের বর্তমান প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ

৫৮.৭ গ্রাম্য এলাকায় নগরায়ণের প্রভাব

৫৮.৮ সারাংশ

৫৮.৯ অনুশীলনী

৫৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৫৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককে নগরায়ণ সম্পর্কে ধারণা এবং ভারতে নগরায়ণের সনাতনী ও আধুনিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন।

- নগরায়ণের সংজ্ঞা।
- ভারতে নগরায়ণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।
- ভারতে নগরায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এবং
- ভারতের গ্রাম্য জীবনে নগরায়ণের প্রভাব।

৫৮.২ প্রস্তাবনা

এই এককে নগরায়ণ আলোচনায় আপনি জানতে পারবেন কীভাবে নগরজীবনে ক্রমশ ভারতের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় পরিণত হয়েছে। এককের শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে নগরায়ণের সংজ্ঞা। এই আলোচনায় নগরায়ণের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হয়েছে। সমকালীন নগরায়ণের বিভিন্ন রূপ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বিস্তৃতভাবে নগরায়ণের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ব্যাপনস্থল, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকের উপর আলোকপাত করেছি। এই এককে নগরায়ণের বর্তমান প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যাসমূহও ব্যাখ্যা করা হয়। সর্বশেষে, গ্রাম্য এলাকার নগরায়ণের প্রভাবও আলোচনা করা হয়।

৫৮.৩ নগরায়ণের অর্থ ও সংজ্ঞা

প্রায়শ আমরা 'শহর' ও 'নগর' শব্দদুটিকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করি। গ্রিক, মেসোপটেমিয়া ও সুমেরীয় সভ্যতার যুগে শহরে (civitus) কথাটি পরিবার ও উপজাতির ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝাত। নগর ছিল জনসমাবেশ বা পারিবারিক সংগঠনের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট স্থান।

সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে শহর শব্দটি অন্য অর্থে ব্যবহার করা শুরু হয়। শহর বলতে বোঝানো হয় একটি বিশেষ ধরনের জায়গা। আর শহরে যে ধরনের জীবনযাত্রা প্রচলিত তাকে নাগরিক জীবন বলা হয়। লোকবসিত প্রকৃতি ও সাংগঠনিক জটিলতার ওপর ভিত্তি করে গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে বড় শহর এবং বড় শহর থেকে মহানগরকে পৃথক করা হয়। গর্ডন চাইল্ড, ম্যাক্স ওয়েবার-এর মতো সমাজবিজ্ঞানীদের মতে শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাজারের অবস্থান ও সেখানে বিশেষ শ্রেণির ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিপূরক হিসাবে অন্যান্য ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান, জটিল শাসন পরিকাঠামো, ধর্মীয় স্থানের উপস্থিতি শহরে দেখা যায়। এটি বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি রূপ। বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং বিবিধ উৎস থেকে আগত মানুষকে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একই জায়গায় নিয়ে আসতে পারে। তারা সকলেই একসঙ্গে বাস করতে শেখে। বিভিন্ন প্রয়োজন ও আগ্রহ পূরণের জন্য, নাগরিকরা নিজেদের অপেক্ষাকৃত জটিল প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের মধ্যে সংগঠিত করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অপ্রত্যক্ষ (indirect) সম্পর্ক ও যুক্তি নির্ভর পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় কার্যপদ্ধতি গড়ে ওঠে। শহরের অন্যান্য মুলগত বৈশিষ্ট্যগুলি হল জটিল দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ, জনবসতির অসমতা, নামহীনতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীরা নগরায়ণের নানা সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। সকল সংজ্ঞা থেকে পাওয়া নগরায়ণ সম্পর্কে যে মূল সত্য হল—নগরায়ণ হল গ্রাম্য মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে অকৃষি পেশার জন্য যেখানে শিল্প, ব্যবসা গড়ে উঠেছে সেসব স্থানে আস্তানা বা বসবাস গড়ে তোলা। ব্যাপক অর্থে নগরায়ণ হল একটি প্রক্রিয়া। তাই এই প্রক্রিয়া বোঝার জন্য আমাদের তিনটি দিক আলোচনা করতে হবে :

(১) জনসংখ্যা ও ব্যাপনস্থল দিক (demographic and spatial aspects)

(২) অর্থনৈতিক দিক এবং

(৩) সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক।

এই পর্বে আমরা সমকালীন ভারতবর্ষে নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় তিনটি দিক কীভাবে কার্যকরী হয় তা আলোচনা করব। এখন এই তিনটি দিক কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা জানব।

নগরায়ণের জনসংখ্যা ও ব্যাপনস্থল দিক আলোকপাত করে গ্রাম্য এলাকা থেকে জনগণ শহরে এলাকায় অনুপ্রবেশ, শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব, জমির ব্যবহারের পরিবর্তন অর্থাৎ কৃষিজমির ব্যবহারের হার হ্রাস এবং কৃষিজমি, শিল্প, কলকারখানায় ব্যবহৃত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

নগরায়ণের অর্থনৈতিক দিক হল কৃষি পেশা থেকে শিল্প পেশায় পরিবর্তন। স্বাধীনতার পর যেসব স্থানে কলকারখানা স্থাপিত হচ্ছে, সেইসব শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে। গ্রাম থেকে নগরে বসতি স্থাপন করার প্রবণতাকে সমাজতত্ত্ববিদগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা মোটামুটি দুটি শ্রেণির অন্তর্গত। অনেক সময় গ্রামের প্রতিকূল পরিবেশ কিছু সংখ্যক মানুষকে গ্রাম ছেড়ে আসতে বাধ্য করে। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ এই জাতীয় কারণকে Push factor বলে অভিহিত করেন। আবার অনেক সময় শহরের নানারকম সুযোগ-সুবিধে কিছুসংখ্যক গ্রামবাসীকে শহরে আকর্ষণ করে আনে। এই জাতীয় কারণকে সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ Pull factor বলে আখ্যা দেন। ভারতবর্ষে নগরের আয়তন এবং সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য Push factor এবং Pull factor উভয় কারণই দায়ী।

নগরায়ণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক শহরের বৈচিত্র্যময় জীবনের নানা দিক আলোচনা করে। নগরায়ণের ফলে শহরে ধর্ম, বর্ণ এবং কৃষ্টির ভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়।

৫৮.৪ ভারতে নগরায়ণ : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে ভারতে নগরায়ণ সভ্যতার প্রথম থেকে শুরু হয়। অবিভক্ত ভারতের নগর পত্তন ও উন্নতি আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে ভারতে নগরায়ণের আরম্ভ প্রায়, ৫,৫০০ বছর আগে। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ বছরে মহেঞ্জদরো ও হরপ্পায় সিন্ধু নদীর তীরে নগরসভ্যতা গড়ে ওঠে। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের মতে, হরপ্পা সভ্যতায় গারিগরি, জ্যামিতি, কৃষি এবং জলসেচ প্রণালী ক্ষেত্রে চরম উন্নতির লক্ষণগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতে নগরায়ণের আর একটি পর্যায় দেখতে পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ বছরে ঐতিহাসিক নগরগুলির গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে রাজারা যে স্থানে তাদের রাজধানী তৈরি করতে সে স্থান পরবর্তীকালে শহরে পরিণত হত। উদাহরণস্বরূপ পাটলীপুত্র (আজকের পাটনা) এবং বৈশালী খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ বছরে মগধ রাজত্বের সময় শহরে পরিণত হয়। খ্রীষ্ট পরবর্তী সময়ে ৭০০ বছরে হর্ষবর্ধনের রাজত্বের সময় কনৌজ রাজধানীতে পরিণত হয়। সেইরূপ খ্রীষ্ট পরবর্তী ১৩০০ বছরে মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে আসেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য ও ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের সাথে সাথে সপ্তদশ শতাব্দীতে দিল্লি, কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাজ শহরের পত্তন শুরু হয়। দিল্লি বাদ দিয়ে প্রায় সব শহরগুলির সমগ্র উপকূলবর্তী এলাকায় গড়ে ওঠে যেখানে থেকে ব্রিটিশরা তাদের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করত।

৫৮.৪.১ প্রাচীন নগরের শ্রেণিবিভাগ

প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন রকমের শহর দেখা যায়। বাস্তুশাস্ত্র (সনাতনী স্থপতি গবেষণার আলোচনা গ্রন্থ) এই শহরগুলি বিশেষ বিশেষ নিজস্বতানুযায়ী বিভক্ত করে থাকে। যাই হোক না কেন, প্রাচীন শহরগুলিকে তাদের কার্যাবলীর ভিত্তিতে ভাগ করা হয়।

(১) ব্যবসা ও উৎপাদনকারী নগর : প্রাচীন ভারতে কতকগুলি স্থানকে নগর, পত্তন, দ্রোনামুখা, ক্ষেতা নিগামা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হত। সাধারণ অর্থে নগর বোঝায় একটি স্থান যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠে অথবা ব্যবসাকেন্দ্র। পত্তন হল কোনো নদী বা সমুদ্রের তীরে গড়ে ওঠা বৃহৎ বাণিজ্যিক বন্দর। পত্তনের বিশেষত্ব হল এখানে ব্যবসায়ী শ্রেণীর বসবাস এবং এলাকায় দামি দামি মণিমুক্ত, সিল্ক, সুগন্ধিসহ অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের কেনাবেচা হয়ে থাকে। দ্রোনামুখা, ক্ষেতা ইত্যাদি হল ছোট ছোট ব্যবসাকেন্দ্র। আবার নিগামা হল শিল্পী কারিগরদের বাসস্থানসহ গড়ে ওঠা বাজার নগর।

(২) রাজনৈতিক অথবা সামরিক নগর : রাজধানী হল সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক শহর বা নগর যেখানে রাজা বা শাসক বাস করতেন এবং রাজত্ব চালাতেন। দুর্গ হল সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্যভাণ্ডার নিয়ে তৈরি সুরক্ষিত নগর। অনুরূপভাবে, সেনামুখ এবং সানিয়া সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে গড়ে ওঠা নগর।

(৩) শিক্ষা অথবা তীর্থ এবং মন্দির নগর : প্রাচীনকালে **মঠ** এবং **বিহার** হল শিক্ষা ও ধর্মীয় কার্যাবলীকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নগর। এই ধরনের নগরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল নালন্দা। আবার, মন্দির নগর হল দ্বারকা, তিরুপতি, পুরী ইত্যাদি। তীর্থকেন্দ্র হল হরিদ্বার, গয়া ইত্যাদি।

৫৮.৪.২ প্রাচনী ও মধ্যযুগীয় ভারতে নগরায়ণের কিছু বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার ব্যাপনস্থলভিত্তিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়।

ক. রাজনীতি, জনসংখ্যা এবং ব্যাপনস্থল ইত্যাদি উপাদানসমূহ :

প্রাচীন ভারতে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস ও বিভিন্ন রাজাদের উত্থান-পতনের গভীর যোগাযোগ ছিল। সেই সময় রাজনৈতিক বিবেচনায় নগরগুলি গড়ে উঠত। এই সকল নগরগুলি গঠিত হত প্রধানত শাসক ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের অনুগামীদের নিয়ে যাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষি-উৎপাদনকে নিজেদের এলাকায় রেখে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভোগ করা।

নগরগুলির বিশেষত্ব ছিল যে সেগুলি পরিখা ও প্রাচীন দিয়ে ঘেরা থাকত। সেই সময়ের স্থপতিরা নগর পরিকল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে নগর সুরক্ষার চিন্তা করতেন। নগর পরিকল্পনার একটি বিশেষ দিক ছিল যে নগরগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে বা ওয়ার্ডে ভাগ করা থাকত যেখানে বিভিন্ন বর্ণের (caste) লোকজন বসবাস করত। অঞ্চলভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।

খ. অর্থনৈতিক :

রাজনৈতিক ক্ষমতা উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে নগরগুলি গড়ে উঠত ঠিকই। তবে প্রাচীন ভারতে নগরপত্তনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির অবদান কম নয়।

সমবায় সংঘ (Guild) গঠন সনাতনী নগরগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। বণিক ও শিল্প-সম্প্রদায় যে সমবায় সংঘ গঠন করত তাকে শ্রেণি (Shreni) বলা হত এক-একটি পেশাভিত্তিক বর্ণ গঠিত হত। সেই বর্ণভিত্তিক সমবায় সংঘকে শ্রেণি (Shreni) বলা হত। পেশাভিত্তিক সমবায় সংঘকে পূজা (Puja) বলা হত। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, তৎকালীন সমবায় সংঘগুলি সনাতনী নগরগুলিতে আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন ও বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী পালন করত।

গ. ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক :

প্রাচীনকালে নগরপালেরা বিশেষ বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নগরগুলির সামাজিকীকরণ ও সাংস্কৃতায়ন হত। উদাহরণস্বরূপ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে পাটলীপুত্রে হিন্দু ব্রাহ্মণ সভ্যতা গড়ে ওঠে। সম্রাট অশোকের রাজত্বে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়। সেইরূপ মুসলমান রাজাদের শাসনকালে আগ্রা, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ ও হায়দ্রাবাদে ইসলামিক সভ্যতার বিকাশ হয়। বিশেষ বিশেষ ধর্ম এবং ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতি গড়ে উঠলেও সনাতনী নগরগুলি ছিল বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণের সংমিশ্রণ ও বৈচিত্র্যে ভরা। বড় বড় নগরগুলিতে বিশেষ কয়টি শ্রেণি যেমন পুষ্পজীবী (florist), মিস্ত্রি, দর্জি (tailor) দেখা যেত। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ ধর্মের রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। সমবায় সংঘগুলি রাজনৈতিক বিধিনিষেধ দ্বারা পরিচালিত হত।

৫৮.৪.৩ ঔপনিবেশিক যুগে নগরায়ণের নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ভারতের ইউরোপীয় বণিকরা আসতে শুরু করলে নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় নতুন দিগন্ত খুলে যায়। সমুদ্র উপকূলবর্তী বন্দর ও ব্যবসাকেন্দ্র ঘিরেই নগরপত্তন শুরু হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিকরা শুধুমাত্র ব্যবসা করার জন্য ভারতে আসে। তাই নগরগুলি শুধুমাত্র ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ব্রিটিশদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজ শহরগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতারও কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। অবশ্য সেইসময়ে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংস্থার উদ্ভব হয়। টেলিগ্রাফ, রেল ও সড়কপথে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় সাফল্য নগরায়ণ প্রক্রিয়াকে সহজ ও প্রশস্ত করে। সাধারণ মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার নতুন দিগন্ত খুলে দেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নগরায়ণ খুব সহজভাবে চলতে থাকলেও ব্রিটিশ শাসনের ফলে অবশিল্পায়ন দেখা দেয়। ফলে গ্রামের কারিগর ও শিল্পীরা নিজেদের রুজিরোজগারের পথ হারায়। ছোট, বড় কুটিরশিল্পগুলি নষ্ট হতে থাকে। এই অবস্থায় নতুন অর্থনৈতিক সুযোগের সন্ধানে গ্রামের এক বড় অংশ মানুষ শহরমুখী হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাবে বিহার এবং উত্তর প্রদেশের বেকার কারিগররা কলকাতাসহ অন্যান্য শিল্প এলাকায় জীবিকার সন্ধানে আসতে শুরু করে। ক্রমে ক্রমে কুটিরশিল্পের শিল্পীরা শিল্প শ্রমিকে পরিণত হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ী শ্রমিক হয়, কেউ কেউ অস্থায়ী অর্থ উপার্জনের পর নিজ এলাকায় ফিরে যান।

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নগরগুলিতে পরিবেশগত পরিবর্তন হতে শুরু করে, নগরের শিক্ষিত সম্প্রদায় নতুন নতুন জীবিকা গ্রহণ করতে থাকে। শিক্ষক, আমলা, সাংবাদিক ও আইনজীবী শ্রেণি তৈরি হয়। নগরগুলি ক্রমশ নতুন নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণা তৈরি হওয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বিশ্বায়ন চলতে থাকে। ফলে নতুন নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ ও কার্যকলাপ নগরগুলির চেহারা বদলে দেয়। সামাজিক

গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। গ্রামে সামাজিক গতিশীলতা না থাকার দরুন অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করার সীমাবদ্ধতা বা বিধিনিষেধ ছিল, কিন্তু নগরে বা শহরে সীমা বা বিধিনিষেধ অদৃশ্য হতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, বর্ণের লোকেদের বাসস্থান নগর বা শহরগুলি অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা উচ্চ, নিম্নবর্ণ ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সমানভাবে ভোগ করা, পথ প্রশস্ত করে দেয়। ফলে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার গতি দ্রুততর হতে থাকে।

ব্রিটিশদের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ণের যে নতুন প্রক্রিয়া শুরু হয় বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও শিল্পায়নের জন্য সে প্রক্রিয়ার গতি নতুন পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

৫৮.৫ সমকালীন ভারতে নগরায়ণের নমুনা (Pattern)

বর্তমান সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও খুব দ্রুত নগরায়ণ শুরু হয়েছে। আধুনিক নগরকেন্দ্রগুলি অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি কাজকর্ম করে থাকে। এখন কোনো একটি বিশেষ কাজের ভিত্তিতে শহর ও নগরের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ করা বড় শক্ত কাজ। সাধারণভাবে, লোকেরা কতকগুলি প্রকৃষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে নগর ও শহরের শ্রেণিবিভাগ করে। উদাহরণস্বরূপ, লোকেরা দিল্লি, কলকাতা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি ঐতিহাসিক শহর, গাজিয়াবাদ, মোদীনগর, কানপুর, জামশেদপুর, ভিলাই শিল্প শহর, মথুরা, মাদুরাই, এলাহাবাদ ইত্যাদিকে তীর্থ শহর হিসাবে চিহ্নিত করে। চলচ্চিত্র শহর বোম্বাই ও মাদ্রাজ খুব সহজেই গ্রাম্য যুবকদের আকর্ষণ করে থাকে। আমরা সমকালীন ভারতে নগরায়ণের নমুনা আলোচনা করব জনসংখ্যা, ব্যাপনস্থল, অর্থনীতির দিক থেকে। তবে এই বিষয় আলোচনা করার আগে আমরা ভারতীয় প্রসঙ্গে শহর বা নগর কাকে বলে তা আলোচনা করব।

৫৮.৫.১ শহর বা নগরের সংজ্ঞা

ভারতে শহর বা নগরের সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য জনসংখ্যা এবং অর্থনীতিকে নির্দেশক সূচক (index) হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষে শহরের এলাকায় সংজ্ঞা দেওয়ার স্থিতিমাপ (parameter) এর বহু পরিবর্তন হয়। ১৯০১ সালের গণনায় শহর সম্বন্ধে যে বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা হয় সেগুলি ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ :

(ক) প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটি, ক্যান্টনমেন্ট এবং পৌর এলাকা;

(খ) কতকগুলি বাড়ির সমষ্টি যেখানে পাঁচ হাজার-এর বেশি লোকের বাস।

১৯৬০ সালের গণনায় শহরের সংজ্ঞায় অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে ধরা হয় না। প্রশাসনিক কাঠামোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে বাস্তবতার দিক থেকে অনেক শহরকে বর্ধিষ্ণু গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

১৯৬২ সালে নগর এলাকার নতুনভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সংজ্ঞা নির্ধারণে জনসংখ্যা ও প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যকেও গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালের সংজ্ঞা ১৯৭২ এবং ১৯৮১ সালেও গ্রহণ করা হয়। এই সংজ্ঞানুসারে নগর বা শহর হল :

(ক) একটি জায়গা যেখানে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অথবা নগর কমিটি আছে,

(খ) একটি জায়গা যেখানে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে :

- অন্তত পাঁচ হাজার লোক বাস করে
- অন্তত ৭৫% লোক বাস করে যারা অ-কৃষি পেশায় নিযুক্ত
- প্রতি স্কোয়ার মাইলে এক হাজার লোকের বসতি এবং
- যেখানে অন্তত কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে এবং পৌর সুযোগ-সুবিধা নাগরিক ভোগ করে থাকে।

১৯৬১ সালের গণনার পর থেকে ভারতবর্ষে নগর নির্ণয় করার জন্য জনসংখ্যাকে নির্দেশসূচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ১,০০,০০০ কম জনসংখ্যা বসতি এলাকাকে বলা হয় 'নগর' (Town), ১,০০,০০০ বেশি লোকবসতি এলাকাকে বলা হয় শহর (City) এবং নগর এলাকা যেখানে কয়েক কোটি লোক বাস করে, শিল্প গড়ে উঠেছে, নানা আধুনিক সুযোগসুবিধা আছে, শিক্ষা, তথ্য সরবরাহ করে থাকে, তাকে মেট্রোপলিটান শহর বা মহানগর (Metropolitan City) বলা হয়। মুম্বাই, কলকাতা হল এই ধরনের মেট্রোপলিটান শহর। এই শহরগুলির নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অনুন্নত এলাকার লোকজন এই শহরগুলিতে অর্থনৈতিক নিরাপত্ত ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক সুযোগের জন্য ভিড় করতে থাকে।

৫৮.৫.২ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (demographic) দিক বা রূপ

ভারতে নগরায়ণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শহরে বা নগরে জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত হওয়া। গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা একটা অতি পরিচিত দৃশ্য। ফলে শহরের জনসংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার পূর্বে শহরগুলির জনসংখ্যা একটা পরিমিত হারে বৃদ্ধি পেত। স্বাধীনতার পরে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ভারতের শহরগুলোতে জনসংখ্যা ১২৫.০৫ কোটি বৃদ্ধি পায়। শহরগুলিতে ক্রমাগত জনসংখ্যা ঘনত্ব বাড়তে থাকে বিভিন্ন কারণে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশভাগ (partition), গ্রাম্যগুলিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ (natural disaster), কুটিরশিল্পের জনপ্রিয়াতা হ্রাস, অসম কৃষি উন্নয়ন, অবশিল্পায়ন, বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক কারণগুলো গ্রামের মানুষদের শহরের প্রতি আকর্ষণ পারে। শহরে রয়েছে শিল্প ও নানা অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা।

৫৮.৫.৩ ব্যাপনস্থল দিক (Spirrtial Pattern)

ভারতের শহর বা নগরগুলিতে ব্যাপনস্থলে অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়। প্রাদেশিক অসমতা এবং জনসংখ্যার ভারসাম্যহীন কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্য ব্যাপনস্থল সংক্রান্ত সমস্যাগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আমরা দুটি ধারণা আলোচনা করব। ধারণাগুলি : অতি-নগরায়ণ (over-urbanisation) এবং উপ-নগরায়ণ (sub-urbanisation)।

অতি-নগরায়ণ

নগরগুলি আয়তন জনসংখ্যার ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। শহরগুলির সীমিত আয়তন, পৌর সুযোগ-সুবিধা (civic amenities), স্কুল, হাসপাতাল ব্যবস্থা প্রায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে যদি শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শহরের প্রশাসন নগরবাসীদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দিতে অসমর্থ হয়। কলকাতা ও মুম্বাই হল এমন দুটি শহর যেখানে অতি-নগরায়ণের জন্য জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এত উচ্চ যে নগর প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।

উপ-নগরায়ণ

অতি-নগরায়ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হল উপ-নগরায়ণ। যখন শহরগুলির জনসংখ্যা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে যায় তখন উপ-নগরায়ণ হয়ে থাকে। শহরের সকল সুযোগ-সুবিধাগুলি নিঃশোষিত হয়ে গেলে সেই শহরের নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলগুলির খুব দ্রুত নগরায়ণ হতে থাকে। দিল্লি হল উপ-নগরায়ণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উপ-নগরায়নের জন্য দিল্লি নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলগুলি সহজেই শিল্প, বাণিজ্য, পৌর সুযোগ-সুবিধা নিয়ে গড়ে ওঠে। যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থারও দ্রুত উন্নতি হয়।

নগরায়ণে ব্যাপনস্থল অসমতা নানাদিক থেকে দেখা যায়। (১) ভারতে নগর বা শহর উন্নয়নে নানা তফাত দেখা যায়। নগর (Town) এবং শহর (City)-র সংজ্ঞার পরিবর্তন হওয়ার দরুন নগরায়ণে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাজস্থানে ১৯৫১ সালে ২২৭টি নগর চিহ্নিত হয়, কিন্তু সংজ্ঞা পরিবর্তনের জন্য ১৯৮১ সালে নগরগণনায় সেই ২২৭টি ২০১-এ নেমে আসে। সেইরূপ অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে এইরূপ নগর হ্রাস হয়। (২) ভারতে সকল প্রদেশে নগরায়ণ একই পদ্ধতিতে হয় না। পাঁচটি রাজ্যে যথাক্রমে মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু , পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ শতাংশ লোক বাস করার দরুন নগরায়ণ খুব দ্রুত হতে থাকে। অন্যদিকে ওড়িশা, হরিয়ানা, আসাম, জম্মু এবং কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ এবং নাগাল্যান্ড-এ ৫ শতাংশ লোক বাস করে। এইসকল রাজ্যে নগরায়ণের গতি অত্যন্ত ধীরে, জনবহুল রাজ্যগুলিতে গড়ে প্রতি স্কোয়ার মাইলে ২৯৪৮ জন লোক বাস করে। (৩) স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে ভারতের অধিকাংশ লোক (প্রায় ৯০%) গ্রামেই বাস করত। কিন্তু শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে শহরগুলির দ্রুত নগরায়ণ হতে থাকলে শহরে লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৮১ সালে দেখা যায় প্রায় ৬০% লোক শহরে বাস করে। গ্রামে বাস করা জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। (৪) ভারতে নগরায়ণের একটি দিক হল নতুন নতুন মেট্রোপলিটান শহর গড়ে ওঠা। স্বাধীনতার পূর্বে কলকাতা এবং স্বাধীনতার পরে মুম্বাইকে মেট্রোপলিটান শহর আখ্যা দেওয়া হয়। এই শহর দুটির সীমিত আয়তনের মধ্যে জনবসতির ঘনত্ব খুব বেশি ছিল কারণ লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটিরও অধিক। ২৫ শতাংশ লোক এই শহর দুটিতে বাস করত। পরবর্তীকালে আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, পুনা, দিল্লি শহরগুলি এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাসস্থান সমস্যা হল এই শহরগুলির প্রধান সমস্যা। আকাশচুম্বী বাড়ি নির্মাণ, ফুটপাত বাসিন্দাহ্ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়।

৫৮.৫.৪ অর্থনৈতিক রূপ বা দিক

নগরায়ণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ণ হয়। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন গ্রাম্য এলাকায় কৃষিশ্রমকে শিল্পশ্রমে পরিণত করে। ভারতের নগরায়ণের জাতীয় কমিশনও এ সত্যকে স্বীকার করে। এই কমিশন আরও মনে করে যে নগরায়ণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুঘটক। শহরগুলির কোটি কোটি জনগণ নিয়ে যত সমস্যাই থাকুক না কেন শহরে জীবন নাগরিককে উন্নীত জীবনের সন্ধান দেয়।

ভারতীয় শহর বা নগর পত্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ নগর বা শহরগুলি স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক দশকে গড়ে উঠেছে। এই নগরগুলি জঙ্গল বা অনুন্নত স্থানে তৈরি হয়। বিহারের জামশেদপুর, ওড়িশার রাউরকেল্লার কথা ধরা যাক। বর্তমানে জামশেদপুর ভারতের জনসংখ্যার বিরাট

অংশের বেকারত্ব দূর করেছে। পূর্বে এই জামশেদপুর ছিল জঙ্গল ও সাঁওতালদের বাসস্থান। নির্জন, ভারতের বড় বড় শহরগুলোর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এলাকা ধীরে ধীরে শিল্প নগরীতে পরিণত হল। বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক এখানে এসে বসবাস করার জন্য সাঁওতালদের জীবনযাত্রায় আধুনিকীকরণ হতে থাকে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। এইভাবেই মধ্যপ্রদেশের ভিলাই, ওড়িশার রাউরকেল্লা এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর-এ নগর পত্তন হয়। ভারী ভারী ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার জন্য এই এলাকাগুলির চালচিত্র পাল্টাতে থাকে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়তে থাকে।

সমকালীন ভারতে নগরায়ণের অর্থনৈতিক রূপ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধান দুটি দিক হল : পেশাগত বৈচিত্র্যের অভাব এবং অভিপ্রয়াণ (migration)।

(১) পেশাগত বৈচিত্র্যের অভাব : স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়েও নগরায়ণ ও শিল্পায়ন ভারতের পেশাগত কাঠামোর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। ১৯০১ সালে এবং ১৯৭১ সালেও ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় ৬৯.৪ এবং ৬৯.৭ শতাংশ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। যদিও এই সময় ভারতে নগরায়ণের গতি বেশ দ্রুত ছিল এবং শিল্পকেন্দ্রিক বহু নগর বা শহরের পত্তন হয়, তথাপি কলকারখানা, উৎপাদনকারী সংস্থায় শ্রমিকের সংখ্যা সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়নি। নগর জনসংখ্যার অধিকাংশই প্রাথমিক ক্ষেত্রে যেমন কৃষি, গৃহস্থালি শিল্প, খনি, মৎস্য-এ নিযুক্ত থাকতে আগ্রহী। সেই অনুপাতে শিল্পক্ষেত্রে, যেমন কলকারখানায় নিয়োগকে অনাগ্রহে এড়িয়ে চলত। ব্যবসা-বাণিজ্যে আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। ফলে ভারতের নগর বা শহরগুলিতে নগরের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য প্রতিচ্ছবিও ভেসে উঠত। নগরের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ গ্রাম্য জীবনের খুঁটি আঁকড়ে শহরে বসবাস করত। ফলে শহরগুলিতে বেকারত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বড় বড় শহরগুলিতে শিক্ষিত বেকার ও অদক্ষ শ্রমিক বেকার দেখতে পাওয়া যায়। এই বেকারত্বের একটি প্রধান কারণ, পুরোনো বা সনাতনী পেশা আঁকড়ে থেকে নতুন পেশা গ্রহণ করায় অনিচ্ছা।

(২) অভিপ্রয়াণ (migration) : ভারতের নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় গ্রাম-সমাজ পরিত্যাগ করে নগর-সমাজে বসতি স্থাপন করার প্রবণতা দেখা যায়। ভারতের নগর কমিশন মনে করে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গ্রাম শহর অভিপ্রয়াণ (rural-urban migration)-এর প্রয়োজন আছে। কমিশন পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে শহরমুখী অভিপ্রয়াণ (migration) গ্রামের অতিরিক্ত শ্রম (surplus labour)-কে কাজে লাগানো ছাড়া আমাদের সংবিধানে যে অধিকারগুলির কথা বলা হয়েছে তাও আদিবাসী হরিজনদের ভোগ করার সুযোগ করে দেয়। কোটি কোটি জনগণের কাছে শহর আলো ও নতুন ভবিষ্যতের ঠিকানার সন্ধান দেয়।

গ্রাম ছেড়ে শহরমুখো হওয়া বা অভিপ্রয়াণ বিষয়টি ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। ১৯৩০ সালে এর প্রথম সূচনা হয়। অভিপ্রয়াণকারীদের (migrants) মধ্যে ২০% তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তু, ৫১% একই রাজ্যে গ্রাম থেকে শহরে আসা জনসংখ্যা এবং ২৫% হল অনুন্নত রাজ্যগুলি থেকে অন্য রাজ্যের উন্নত ও বড় শহরে ভিড় করা জনগোষ্ঠী। এই অভিপ্রয়াণ-স্রোতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অভিপ্রয়াণকারীরা প্রধানত পুরুষ চরিত্র। মহিলা-শিশু প্রায় অনুপস্থিত।

অভিপ্রয়াণের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে একটি প্রধান কারণ হল গ্রামে জমির অসম বণ্টনের জন্য কৃষিক্ষেত্রে বেকারত্ব ও ছদ্ম-বেকারত্বের প্রকোপ। ফলে অতিরিক্ত শ্রম, দারিদ্র্য, আর্থিক নিরাপত্তার অভাব

গ্রাম্য জনগণকে শহরমুখো করে তোলে। গ্রামের শিক্ষিত জনগণ শহুরে জীবনের মোহিনী জীবনযাত্রা ও নানা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধায় আকর্ষিত হয়ে শহরে অভিপ্রয়াণ করে। এছাড়াও গ্রাম্য জীবনের বর্ণ প্রথা, ধর্ম, স্থানীয় রাজনীতির প্রভাব এত বেশি যে আক্রান্ত জনগণ জীবনের নিরাপত্তার জন্য শহরমুখো হয়ে থাকে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার 'দ্য স্টেটসম্যান' [The Statesman]

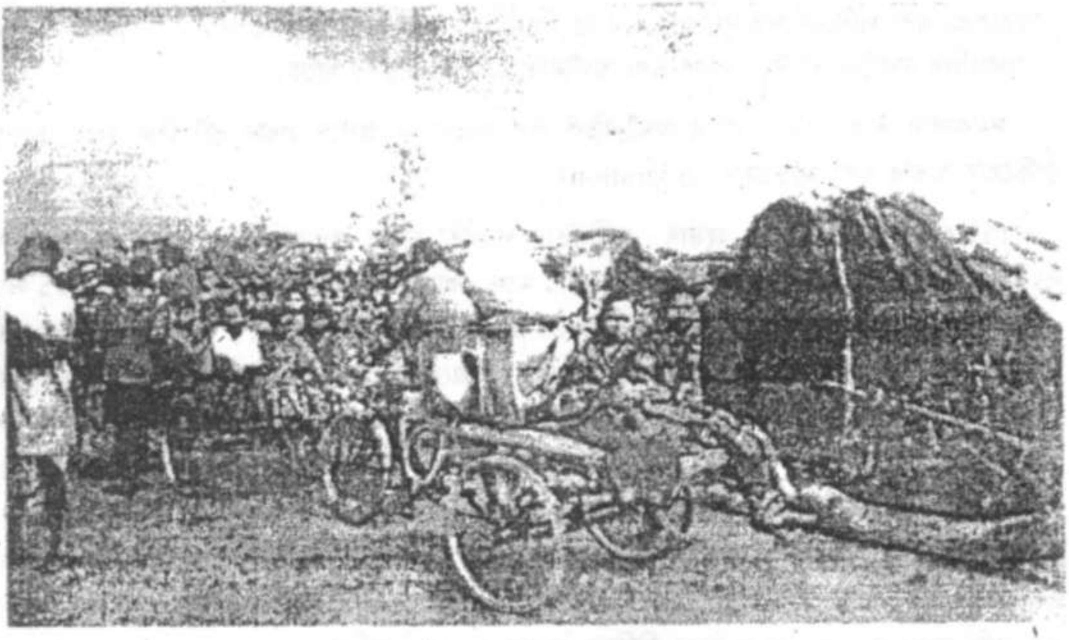

।। গ্রাম থেকে শহরের উদ্দেশ্যে জীবিকার সন্ধানে ।।

৫৮.৫.৫ সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপ ও দিক

নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে ভারতের শহর বা নগরগুলো ভাষা, বর্ণ, প্রথা, শ্রেণি, ধর্ম, সংস্কৃতির দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ। নগরে এতসব বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও জনগণ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে থাকে।

পরীক্ষামূলক গবেষণা করে দেখা যায় যে শহরের এই বৈচিত্র্য শহরগুলির সনাতনী চরিত্রকে নষ্ট করতে পারে না। অভিপ্রয়াণকারীরা নিজের ভিটে ছেড়ে শহরে আস্তানা গাড়লেও গ্রাম্য সংস্কৃতিকে ভুলে যায় না। সমাজবিজ্ঞানী এন. কে. বোস বলেন যে অভিপ্রয়াণকারীরা শহরে এসে নিজ ভাষা-সংস্কৃতির লোকেদের সঙ্গে বাস করে। কলকাতা ফুটপাতবাসীদের সমীক্ষা চালিয়ে দেখা যায় যে অধিকাংশ অভিপ্রয়াণকারীরা গ্রামের লোকেদের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে। কারণ সকলে সকলের দেখাশোনা করে এবং গ্রামের খবরাখবর আদানপ্রদান করতে পারে। অতএব সংস্কৃতির বৈচিত্র্য শহুরে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক।

ভারতের অধিকাংশ শহরগুলির একটি মিশ্র চরিত্র দেখা যায়। শহরগুলির কোনো ব্যবসাকেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে লোকজন আর্থিক সুযোগ-সুবিধার জন্য শহরগুলিতে ভিড় করে। কিন্তু দেখা যায় যে-কোনো শহরে সংস্কৃতি, বর্ণ, ধর্মের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ভাষার

কারণে একই এলাকায় কেন্দ্রীভূত হয়। বম্বে শহর এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আবার ভারতের পুরাতন শহর আগ্রাতে অভিপ্রয়াণকারীরা ধর্মের ভিত্তিতে এলাকাকেন্দ্রিক বাসস্থান তৈরি করে। আগ্রা শহরে আর্থিক সুবিদা আশানুরূপ নয়। মুসলমান সংস্কৃতি-ভাস্কর্য ভারতের অন্যান্য এলাকার মুসলমান সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করে থাকে।

সাম্প্রতিককালে শিল্পায়নের ফলে বারতের নগর বা শহরগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাল্টাতে শুরু করেছে। শিল্পকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা নতুন শহরগুলোতে ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি, ভাষা কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। শিক্ষার বিস্তার ও সামাজিক জীবনের রাজনীতিকরণ শহুরে জীবনকে নানাভাবে বদলে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সুপরিকল্পিত চণ্ডীগড় শহরে প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব তৈরি হয় স্বার্থের বা অন্যান্য বিষয়ের সাদৃশ্যের (commoninterest) ভিত্তিতে। এই শহরে ধর্মীয় কার্যাবলী, বন্ধুত্ব এবং শিক্ষার মাপকাঠি ইত্যাদি সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়।

শহুরে সমাজে সামাজিক স্তরীকরণ একটা নতুন রূপ নিয়ে থাকে। নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ (caste) শ্রেণির (class) ভূমিকা নেয়। অর্থনীতি শহুরে জীবনে স্তরবিন্যাস করে থাকে। লক্ষ্ণৌ শহরের রিক্‌শাওয়ালারা বিভিন্ন ধর্মের লোক। কিন্তু তাদের মধ্যে একতা ও সংহতি গড়ে উঠেছে পেশার ভিত্তিতে।

বিবাহ ও পরিবার সামাজিক জীবনের অঙ্গ। গ্রাম্যজীবনে বিবাহে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে বর্ণ (caste)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু শহুরে জীবনে এর প্রভাব নেই বললেই চলে। শহুরে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশায় সামাজিক চলাচল (social mobility) অত্যন্ত সুপরিবর্তনীয়। ফলে বর্ণবহির্ভূত বিবাহ হয়ে থাকে। শহরের নানা সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো এই ধরনের বিবাহকে উৎসাহ দিয়ে থাকে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে শহরে বিবাহ, পরিবার ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বন্ধন অত্যন্ত দুর্বল। বিবাহবিচ্ছেদ, একক পরিবার, যৌথ পরিবারের ভাঙন শহর জীবনেই দেখা যায়। যে ধর্ম ও সংস্কৃতি এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধনে আবদ্ধ রাখত, শহুরে জীবনে তাদের প্রভাব কমতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, চলচ্চিত্র ইত্যাদি শহরের জনগণকে ভোগ্য সংস্কৃতির দিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বন্ধন আলগা হতে শুরু করেছে।

৫৮.৬ নগরায়ণের বর্তমান প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নগরায়ণের বর্তমান প্রক্রিয়ায় নানা সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। এই সমস্যাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শহরের বস্তি উন্নয়নের সমস্যা। ভারতের সব বড় বড় শহরেই বস্তি আছে। এমনকি সুপরিকল্পিত চণ্ডীগড়েও বস্তি এলাকা আছে। কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ শহরের বস্তিতে বসবাস করে জনসংখ্যার ৩২%, ২৫% এবং ২৪%। বস্তিগুলিকে চিহ্নিত করা হয় কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঘনজনবসতি, কাঁচা বাড়ি, বিদ্যুতের অভাব, নিম্নশ্রেণির পয়ঃপ্রণালী এবং পানীয় জলের সমস্যা। বস্তিগুলি শহরের অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা। কারণ বস্তি এলাকায় অপরাধপ্রবণতা, জুয়ার আড্ডা ও সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখতে পাওয়া যায়। দারিদ্র্য এই এলাকাগুলিকে নানাভাবে গ্রাস করে থাকে।

নগরায়ণ প্রণালীর অন্যতম সমস্যা হল বাসস্থান সমস্যা। প্রতিদিন প্রায় শত শত লোক জীবিকার সন্ধানে

শহরের এসে ভিড় করে। ফলে শহরের সীমিত জমির উপর নানাভাবে চাপ সৃস্টি হয়। শহরের বাসস্থান সমস্যা সাধারণত নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগণের সমস্যা। এই সমস্যার বিভিন্ন রূপ হল জমির উর্ধ্ব মূল্য ও অস্বাভাববিক ঘর ভাড়া। এই সমস্যার প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকারসহ রাজ্য সরকার শহরের জমির সীমিত আইন (Urban Land Ceiling Act) এবং ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন (Rent Control Act) পাস করে। নগরায়ণের জাতীয় পরিষদ (The National Council on Urbanisation) সুপারিশ করে যে নগর উন্নয়নের অন্তত ২৫% জমিতে দরিদ্র শ্রেণির বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

যথাযথ যানবাহন ও যাতায়াতের সুবিধার অভাব ভারতের নগরগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। যদিও শহরগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করে উন্নত ধরনের যাতায়াতব্যবস্থা করা হয় তবুও প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় তা সামান্য। এই তিনটি সমস্যা ছাড়াও নগরগুলিতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে পরিকাঠামোও বিপর্যস্ত হয়। এর কুফল সর্বত্রই লক্ষ করা যায়—যেমন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, কর্মনিয়োগ ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ অনুভূত হয়। অতি-দূষিত অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালে রোগীর ভিড় ভারতের শহরগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য ভারতের নগর উন্নয়ন নীতিতে শহরের বাসস্থান সমস্যা সমাধান, বস্তি উন্নয়ন, জমি অধিগ্রহণ এবং উন্নয়নের উপর নজর দেওয়া হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দিল্লি শহর ও সংলগ্ন এলাকাগুলির উন্নয়নের পরিকল্পনাসূচি নেওয়া হয়। দিল্লি শহরের নিকবর্তী রাজ্যগুলি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ-এর উন্নয়নে নজর দেওয়া হয়।

৫৮.৭ গ্রাম্য এলাকায় নগরায়ণের প্রভাব

ভারতে পাশ্চাত্তীকরণ ও আধুনিকীকরণসহ নগরায়ণ খুব দ্রুত গ্রাম ও শহরে সামাজিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। নগরায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল অভিপ্রয়াণ (migration)। অভিপ্রয়াণ হল একটি ক্রমাগত প্রণালী (continuous process) যা গ্রামের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করে। সমাজবিজ্ঞানীরা গ্রাম্যজীবনের উপর শহরের প্রভাবকে তিন দিক থেকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। প্রথমতা, শহরের পৌর সুবিধাগুলো গ্রামে অনুপস্থিত, ফলে গ্রামের লোকজন সেই সুবিধাগুলোকে ভোগ করার জন্য শহরমুখী হয়। দ্বিতীয়ত, শহরে কর্মনিয়োগের প্রাচুর্য আছে। উপরন্তু শহরের কর্মনিয়োগ গ্রামে উচ্চ মর্যাদা বহন করে। তৃতীয়ত, ভারতীয় গ্রামগুলো ধর্ম বর্ণ দ্বারা জনগণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে সেই নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গ্রামের মানুষ শহরের জীবন জটিল হওয়া সত্ত্বেও শহরমুখো হয়।

শ্রীনিবাস মনে করেন যে ভারতের নগরায়ণে বর্ণ (caste) প্রথা সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারতের গ্রামগুলোকে বর্ণভিত্তিক স্তরীকরণে ব্রাহ্মণরা সর্বোচ্চ অধিষ্ঠিত। ফলে সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা তারা ভোগ করে থাকে। ব্রাহ্মণ শ্রেণি প্রথমে শহরের শিক্ষা ও আধুনিক পেশার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে শুরু করে। তাঁরা একই সঙ্গে গ্রামের অর্থনীতি এবং শহরের পেশাদারী কর্মের সুযোগ-সুবিদা ভোগ করে থাকে। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলন এবং ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক মন্দার জন্য ব্রাহ্মণ শ্রেণিকে গ্রাম ছেড়ে বড় বড় শহরগুলিতে ভিড় করতে দেখা যায়।

অভিপ্রয়াণের প্রভাব গ্রামগুলিতে নানাভাবে পড়তে দেখা যায়। গ্রামের লোকজন শহরে কর্মে নিয়োগ

হওয়ার ফলে গ্রামে অর্থস্রোত (money flow) হতে থাকে। এই শহরের অর্থ গ্রামে নানাভাবে বিনিয়োগ হওয়ার দরুন গ্রাম এলাকায় উন্নয়ন হয়। গ্রামে দোকানপাট, বিদ্যালয় তৈরি হয়। গ্রামের সংস্কৃতির উপর এর প্রভাব পড়ে। শহুরে পোশাক-পরিচ্ছদ, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন গ্রাম্যজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। শহরের আধুনিকীকরণ গ্রামের কৃষিব্যবস্থারও পরিবর্তন আনে। কৃষি উন্নয়নের জন্য উন্নত কৃষিবিজ্ঞান, কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি শহর থেকে গ্রামে আসে। সুতরাং নগরায়ণের প্রক্রিয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নগরায়ণের প্রভাব নিকটবর্তী এলাকাগুলিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

৫৮.৮ সারাংশ

এই এককে আমরা নগরায়ণের সংজ্ঞা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছি। সমকালীন ভারতবর্ষে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার যে বিভিন্ন দিক আছে—জনসংখ্যাগত, ব্যাপনস্থলগত এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিকগত—সেগুলির উপর আলোকপাত করা হয়। নগরায়ণ প্রক্রিয়ার নানা সমস্যা আছে—সেই সমস্যাগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। পরিশেষে, গ্রাম্যজীবনে শহরের প্রভাবও আলোচনা করা হয়।

এই আলোচনা করে দেখা যায় যে বর্তমান ভারতে নগরায়ণ খুব দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন আনে। নগরায়ণ একদিকে গ্রাম্যজীবনের নানা সমস্যার সমাধানের সূত্রের সন্ধান দেয়, অন্যদিকে শহরের জীবনে পৌরসুবিধাগুলির দ্রুত নিঃশেষ, তীব্র প্রতিযোগিতা, বাসস্থান সমস্যা, অপরাধ প্রবণতা, বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে। সুতরাং নগরায়ণ কোনো আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ঘটনা নয়। এ আন্তঃরাজ্য ঘটনা। নগরায়ণ থেকে উদ্ভুত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রচেষ্টা।

৫৮.৯ অনুশীলনী

(১) নগরায়ণের অর্থ কী? কী কী কারণে নগরায়ণ হয়ে থাকে?

(২) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে নগরায়ণের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

(৩) ঔপনিবেশিক যুগে আমরা কী ধরনের নগরায়ণের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই?

(৪) নগরায়ণের ব্যাপনস্থল এবং অর্থনৈতিক রূপ বা দিক আলোচনা করুন।

(৫) টীকা লিখুন : গ্রাম্যজীবনে নগরায়ণের প্রভাব।

৫৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. Rao, M. S. A. (ed), *Urban Sociology in India*, 1974, Orient Longman : New Delhi.
2. Saberwal, S. (ed), *Process and Institutions in Urban India : Sociological Studies*, Vikas Publishing House, New Delhi.

একক ৫৯ ☐ নগরীয় সামাজিক কাঠামো ও নগরায়ণ সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ

গঠন

৫৯.১ উদ্দেশ্য

৫৯.২ প্রস্তাবনা

৫৯.৩ নগরীয় সামাজিক কাঠামোর অর্থ ও সংজ্ঞা

৫৯.৪ নগরীয় জীবনের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

৫৯.৫ ভারতীয় নগরীয় সম্প্রদায়ের গঠনগত ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক

৫৯.৫.১ ভারতীয় নগরজীবনে পরিবার, বিবাহ এবং জ্ঞাতিত্বের প্রভাব

৫৯.৫.২ বর্ণ বা জাতি (Caste)

৫৯.৫.৩ নগরীয় রাজনীতি (Urban politics)

৫৯.৫.৪ নগরীয় সামাজিক বিষয়সমূহ

৫৯.৬ নগরায়ণ সম্পর্কিত লুইস হুরথের তত্ত্ব

৫৯.৬.১ হুরথ-এর তত্ত্বের সমালোচনা ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীদের মতামত

৫৯.৬.২ নগরজীবনের আলোচনায় পরিবেশগত তত্ত্ব

৫৯.৬.৩ গ্রামাঞ্চলের নগরায়ণ (Rurbanization) : রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্ব

৫৯.৬.৪ শহরের প্রাধান্য

৫৯.৬.৫ উপনগরীয় গুরুত্ব

৫৯.৭ সারাংশ

৫৯.৮ অনুশীলনী

৫৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৫৯.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- নগরীয় সামাজিক কাঠামোর অর্থ ও সংজ্ঞা।
- সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্ঞাতিত্ব, ধর্ম, বর্ণ এবং রাজনীতির ভিত্তিতে নগরীয় সামাজিক কাঠামো,
- নগরীয় সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন,
- ভারতে নগরীয় সামাজিক কাঠামো আলোচনায় সামাজিক বিষয়সমূহ,
- নগরায়ণ সম্পর্কে লুইস হুরথ-এর তত্ত্ব,

- নগরজীবন আলোচনায় পরিবেশের প্রভাব,
- নগরায়ণ সম্পর্কে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্ব,
- শহরের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য ও উপনগীরর গুরুত্ব।

৫৯.২ প্রস্তাবনা

পূর্ব একক পড়ে আপনারা নগরায়ণের প্রক্রিয়া প্রণালী এবং বিভিন্ন রূপ জানতে পেরেছেন। এই এককে প্রধানত আলোচনা করা হচ্ছে ভারতের নগরীয় সামাজিক কাঠামো। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে তা হল নগরীয় ভারতের সামাজিক সংগঠনগুলি।

এই এককে প্রথম আলোচনা করা হচ্ছে নগরীয় সামাজিক কাঠামোর অর্থ ও সংজ্ঞা। বর্ণনা করা হচ্ছে নগরীয় সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্পভিত্তিক সমাজের মধ্যেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। ভারতের নগরীয় সম্প্রদায়ের গঠনগত এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক দিকও বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে খুব স্পষ্টভাবে জানা গেছে যে নগরীয় জীবনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সবসময় ভারতে দেখা যায় না। বরং ভারতের নগরীয় পরিবার, জ্ঞাতিত্ব এবং বর্ণের প্রভাব অপরিসীম।

নগরায়ণ শব্দটির সঙ্গে একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া জড়িত। শহরের অধিবাসীগণ সাধারণত একটি বিশেষ সামাজিক আচরণ ও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। এ প্রক্রিয়া হল নগরসভ্যতার উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

শহর কীভাবে কার্য সম্পাদন করে এই প্রশ্নটি বিংশ শতকে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব পেতে থাকে। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল নাগাদ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আলোচনা কয়েকজন লেখক মারফত প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবার্ট পার্ক, আরনেস্ট বারজেস (Earnest Burgess) এবং লুইস হুরথ (L. Wirth)। এদের প্রকাশিত ধারণা অনেকদিন পর্যন্ত নাগরিক সমাজতত্ত্বের মূলভিত্তি রূপে স্বীকৃতি ছিল। এ প্রসঙ্গে শিকাগো স্কুলের উল্লিখিত দুটি ধারণার কথা বলা হয়। একটি হল নগরসংক্রান্ত আলোচনায় পরিবেশগত মত, অন্যটি হল নগরজীবনের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ নাগরিকত্বের ধারণা। নাগরিক জীবন সংক্রান্ত ধারণাটি লুইল হুরথ-এর। ম্যাক্স ওয়েবারের নৈর্ব্যক্তিক নাগরিক জীবনের ধারণার সঙ্গে হুরথ-এর ধারণার মিল আছে।

এখন গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ কমে আসছে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় গ্রামাঞ্চলের নগরায়ণ (Rurbanization)-এর ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এইটি গ্রাম এবং শহরের মধ্যবর্তী একটি ধারণা। এর মধ্যে গ্রাম এবং শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি মিশ্রিত হয়ে গেছে।

৫৯.৩ নগরীয় সামাজিক কাঠামোর অর্থ ও সংজ্ঞা

নগরীয় সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে ভৌগোলিকরা, সমাজবিজ্ঞানী, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌রা নানা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকেন। ভৌগোলিক বা নগরীয় সামাজিক কাঠামোকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ জনগণের আকার, সংখ্যা ও ঘনত্বের ভিত্তিতে নগরীয় সামাজিক কাঠামো বিচার করা অনেক সহজ।

উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌রা বাস্তব্য দৃষ্টিভঙ্গি (ecological approach) প্রয়োগ করে থাকেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারে তাঁরা উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যার সাহায্য নিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, কোনো নগরের সামাজিক কাঠামো ব্যাখ্যা করার সময় তাঁরা বিচার করেন সেই নগরে কোন্ কোন্ শ্রেণির লোক বাস করে। তাদের প্রকৃতি, জীবনযাত্রার ধারার উপর তারা জোর দিয়ে থাকেন।

সমাজবিজ্ঞানীরা নগরীয় সামাজিক কাঠামো আলোচনায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি নগরীয় জীবনের সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং অন্যান্য সামাজিক দিকের আলোচনা করেন। এই দিকগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে নগরের মানুষগুলির উদ্দেশ্য, মনোভাব, চিন্তাভাবনা এবং সামাজিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে থাকেন।

নগরীয় সামাজিক কাঠামো বর্ণনায় জনসংখ্যার আকার, ঘনত্ব ও বৈচিত্র্য—এই তিনটি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বৈচিত্র্য (heterogeneity)-এর অর্থ হল নগরে বিভিন্ন ধর্মের বর্ণ বা জাতির, ভাষার লোক দেখতে পাওয়া যায়। এই বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় পোশাক, খাদ্যাভ্যাস (food habit) সংস্কৃতির এবং জীবনযাত্রার প্রণালীতে। সুতরাং বৈচিত্র্য বিনা নগরীয় জীবন অর্থহীন।

৫৯.৪ নগরীয় জীবনের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

নাগরিক জীবন সংক্রান্ত বিবিধ সমীক্ষায় দেখা গেছে, জীবনযাত্রার ধরন গ্রাম ও শহরে অনেকখানিই আলাদা। এই বৈপিরীত্যের যথার্থ আলোচনা করলেই আধুনিক যুগের নগরায়ণের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। লুইস ওয়ার্থ সহ সমাজবিজ্ঞানী বা নগরায়ণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেন। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলি সবক্ষেত্রে ভারতে দেখা যেত না। ক্রমাগত শিল্পায়নের ফলে বৈশিষ্ট্যগুলির উপস্থিতি বর্তমান ভারতীয় সমাজে লক্ষণীয়। নগরীয় জীবনের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(১) **শহরগুলোতে জনবসতি খুব বেশি** : নগরের লোকসংখ্যা হল ক্ষমতা এবং গুরুত্বের সূচক। নগর অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের তুলনায় আকৃতিতে বড়। জনবসতি বেশি হলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণও বেশি হয়ে থাকে। মুখোমুখি সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আকৃতিতে ছোট গোষ্ঠীতে সরল সামাজিক পরিকাঠামো বিদ্যমান থাকে। জনবসতি বেশি হলে তা রাজনীতি, আইন, সামাজিকীকরণ, যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিশেষীকরণের পথ প্রশস্ত করে।

(২) **শহরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যিকে উৎসাহিত করে** : নাগরিকেরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা সংগ্রহ করতে পারেন না। তাই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে ভ্রমণ এবং সংযোগ বৃদ্ধি পায়। জীবনধারণ এবং বিলাসিতার প্রয়োজনে বাণিজ্যের সহায়তা মানুষ চায়। এর মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে আচরণে যুক্তিগ্রাহ্যতা আসে এবং কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের পরিবেশে মানুষের জীবনে বিভিন্ন বিভাগ আসে; তার সঙ্গে একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নেয়। অনেক সময় পরিবার-বহির্ভূত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহারে নাগরিক মানুষ নির্মমতা দেখিয়ে ফেলে।

(৩) **শহরে শ্রমবিভাগ খুব জটিল** : বাণিজ্যক্ষেত্রের বাইরেও শ্রমবিভাগ প্রচলিত। সমাজজীবনের সর্বত্র শ্রমবিভাগের প্রভাব লক্ষিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষকের উপস্থিতি বিদ্যমান। শ্রমবিভাগে অভ্যস্ত

নগরবাসী কর্মকুশলী হয়ে থাকে। শহর ক্রমশ সবচেয়ে কুশলী উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হতে থাকে।

(৪) **শহর আমাদের সামনে বহুবিধ বস্তু এবং পরিষেবা তুলে ধরে** : বিশেষীকরণের দৌলতে শহরে বিবিধ বস্তু সুলভে পাওয়া যায়। আপনার চাহিদার বস্তু-কম্পিউটার বা চাইনিজ খাবার—যা কিছুই হোক না কেন, শহরে তা মিলবেই। তাই বলা যায় মানুষের চাহিদা মেটাবার আদর্শ স্থান শহরই হতে পারে। শহরে বাজার, দোকান, ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী সংগঠন, অফিস, কারখানা, আদালত, পুলিশ, গ্রন্থাগার, থিয়েটার, বিদ্যালয়, পার্ক, হাসপাতাল, দমকল ইত্যাদি সবই থাকে। ক্যাপলো (Caplow)-এর মতে প্রাচীন রোম নগরীতেও এসব ছিল।

(৫) **শহর জীবনে অসমতা থাকতে পারে** : বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে শহর অচেনা বিদেশী ব্যক্তিদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। ব্যক্তিদের কয়েকজন সেখানে স্থায়ীভাবে থেকেও যায়। শহরে বহু মানুষ বাস করে। শহরবাসীরা একে অন্যের চেয়ে ভাষা, পোশাক, খাদ্যাভাস, পারিবারিক পরিকাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে একেবারেই আলাদা। এই পার্থক্যের কারণে শহরবাসীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যের চাহিদা হয়। শহরবাসীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রকাশ শহরের মধ্যে দেখা যায়। শহর এ ধরনের বৈচিত্র্যগুলির যথার্থ পালন এবং মিশ্রণ করে থাকে। এধরনের পরিবেশের মধ্যে বাস করাটা শহরবাসীর কাছে খুবই রোমাঞ্চকর। এজাতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বড় হয়ে উঠলে মানুষ সাধারণত সৃষ্টিশীল এবং স্থিতিস্থাপক মানসিকতার হয়ে থাকে। রবার্ট পাকের মতে যাঁরা বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে বাস করে, তাঁরা সাধারণত বিশ্বজনীনতায় (cosmopolitanism) বিশ্বাসী হন। অন্যদের চেয়ে তারা বেশি গভীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং তীব্র অনুভূতি ও বোধসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাঁদের মতামতও অন্যান্যদের তুলনায় বেশি যুক্তিসঙ্গত হয়ে থাকে।

(৬) **শহরের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সংযোগ থাকে** : বিভিন্ন ভ্রমণার্থীর নিরন্তর আনাগোনার মাধ্যমে এই সংযোগ রক্ষিত হয়। বিভিন্ন শহরের মধ্যে সড়কপথ, জলপথ এবং বিমানবন্দরের মাধ্যমেও এই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। বিভিন্ন পরিবহন পথের সংযোগস্থলে সাধারণত শহর গড়ে ওঠে। শহর প্রকৃতপক্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি বিশেষ কেন্দ্র। নৃতত্ত্ববিদ রবার্ট রেডফি'র মতে পারস্পরিক যোগাযোগের প্রকৃতিগত পরিবর্তন এবং সংখ্যাবৃদ্ধির কারণেই গ্রামাঞ্চল শহরে রূপান্তরিত হতে থাকে।

(৭) **শহরে সামাজিক সম্পর্কগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান** : শহরের অধিকাংশ মানুষই নিজের ভূমিকাটুকুকে কেন্দ্র করে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় মানুষ তার সমগ্র সত্তা নিয়ে অংশগ্রহণ করে। এ ধরনের আচরণের ফলে তাদের মধ্যে নামহীনতা (anonymity) আসতে পারে। এক্ষেত্রে শনাক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই তাই শাস্তির ভয়ও থাকে না। শহরে অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি আচরণ অনেকক্ষেত্রেই স্বার্থপর চরিত্রের পরিচয় বহন করে।

(৮) **শহর প্রতিনিয়তই বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়** : শহরে সর্বদাই কিছু না কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে। পরিবর্তনের হার শহরে খুব দ্রুত। পূর্বোক্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই শহরে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। আবার এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেও পরিবর্তন আসাটা অস্বাভাবিক নয়। গত কয়েক হাজার বছর ধরে শহরের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

(৯) **নগরজীবনে নিয়মনিষ্ঠ এবং নৈর্ব্যক্তিক মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে** : শহরের আয়তন বিশাল হয়ে থাকে বলে শহরবাসীদের মধ্যে মুখোমুখি ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। শহরে মানুষ একে অপরের সঙ্গে বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই সম্পর্ক গড়ে তোলে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যায় শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, দোকানে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে সম্পর্ক, চিকিৎসাকেন্দ্র রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে সম্পর্ক।

সাধারণত শহরবাসীরা একে অন্যকে সমগ্র মানুষ হিসাবে জানার সুযোগ পায় না। কারণ তারা একে অন্যের ব্যক্তিগত জীবনধারা বিষয়ে সংযুক্ত নয়। পরিবারের সদস্য ও বন্ধুরা ছাড়া কম মানুষের সঙ্গেই তাদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যের ফলশ্রুতি নিয়মনিষ্ঠ, নৈর্ব্যক্তিক, অগভীর, বিচ্ছিন্ন, অস্থায়ী নাগরিক সম্পর্ক। গ্রামীণ জীবনে ব্যক্তিগত, ঘনিষ্ঠ, মুখোমুখি সম্পর্কের অস্তিত্ব আছে। সেদিক থেকে নাগরিক জীবন গ্রামীণ জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ বিপরীত।

'ব্যস্ততাময় শহরে নির্লিপ্ততা'

(১০) **নাগরিক সম্পর্কগুলি যুক্তিনির্ভর** : সেই সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক দিক যেমন আছে, তেমনই নাগরিকত্বের মধ্যে উপযোগিতাবাদের একটা উল্লেখও আছে। সম্ভাব্য লাভ-লোকসানের হিসেব করার পর মানুষ কোনো সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত সন্তুষ্টির প্রশ্ন ওঠে না। এখানে সম্পর্ক মূলত চুক্তিনির্ভর। তাই লাভ-লোকসানের মূল্যায়ন যত্ন সহকারেই করা হয়। চুক্তির মেয়াদ ফুরলেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। উদাহরণ হিসাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সের সঙ্গে অসুস্থ রোগীর সম্পর্কের কথা বলা যায়। তবে একথা ভাবা উচিত নয় যে নাগরিক জীবনে সব সম্পর্কই উপযোগিতাবাদের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিবিশেষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতিও বিবিধ প্রকার হতে পারে।

(১১) **ধর্মনিরপেক্ষতা নাগরিক জীবনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য** : নাগরিক জীবনে গোষ্ঠীগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ফলশ্রুতি দেখা যায় বহুবিধ জীবনধারণ প্রণালী এবং মূল্যবোধের প্রকাশের মাধ্যমে। এই বহুবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে বাস করাটা মানুষের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। নিজেদের থেকে পৃথক অন্য ধরনের মানুষকে দেখাটা নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত ব্যক্তির কাছে নতুন নয়। যুক্তিবাদ ও পরমতসহিষ্ণু আচরণের জন্য শহরবাসীদের মধ্যে ধর্মনিরপক্ষেতা প্রকাশ পায়। সাধারণভাবে বলা যায় যুক্তিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা বা এজাতীয় ধারণাকে পরিমাপ করা যায় না। ধরে নেওয়া হয় ধর্মনিরপেক্ষতা নাগরিক-

সামাজিক পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত। ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় ভাবের বিপরীত একটি ধারণা, যদিও সাম্প্রদায়িক বিরোধ গ্রামের চেয়ে শহরে বেশি দেখা যায় তবুও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে বলা যায়, ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ নাগরিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত।

(১২) **শহরের জনঘনত্ব বেশি হলে শ্রমবিভাজনও বেশি হয়ে থাকে**: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ ও জমির ঘনত্ব বাড়ে। একেই দুর্খেইম বস্তুগত ঘনত্ব (material density) বলে ব্যাখ্যা করেছেন। দুর্খেইম দু'ধরনের ঘনত্বের কথা বলেছেন—(ক) বস্তুগত ঘনত্ব বলতে মানুষ ও জমির অনুপাত বোঝানো হয়। (খ) গতিশীল বা নৈতিক ঘনত্ব (dynamic or moral desity) হল পারস্পরিক বিনিময় বা যোগাযোগের হার। দুর্খেইম তাঁর সামাজিক উন্নয়নের তত্ত্বে প্রাক্-নাগরিক বা প্রাক্-শিল্প যুগে উপজাতি বা পরিবারকে মূল সামাজিক একক বলে ধরেছেন। জনবসতির আকৃতি বৃদ্ধি পেলে একসাথে বস্তুগত ঘনত্ব ও গতিশীল ঘনত্বও বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ, পূর্বে বিচ্ছিন্ন সামাজিক এককগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ঘটতে শুরু হয়। এককগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য শ্রমবিভাজনকে উৎসাহিত করে। অনেক সময় একই ধরনের কিছু বিচ্ছিন্ন সামাজিক এককগুলো ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক ক্রিয়ার একত্রে মিলে বৃহৎ ও বেশি ঘনত্বসম্পন্ন স্থানে পরিণত হয়। শ্রমবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় নতুন বৃহৎ এককগুলিতে পূর্বের বিচ্ছিন্ন এককগুলির চেয়ে অনেক বেশি বিশেষীকরণ হয়েছে।

(১৩) **নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে পরিবারের কার্যাবলীর গুরুত্ব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে** : গ্রামের যৌথ পরিবারে শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ, বিনোদনমূলক কাজ মূলত পরিবারের মধ্যে সম্পন্ন হয়। কিন্তু নগরজীবনে এই কাজগুলি বিদ্যালয়, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মতো অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি করে থাকে। শহরে পরিবার এবং কর্মস্থলের মধ্যে বিভাজন রেখা খুবই সুস্পষ্ট। ফলত নাগরিকদের অস্তিত্ব মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে পরিবারের সঙ্গে বিকৃত নয়। ভৌগোলিক সচলতার কারণে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও কম হয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে নাগরিক সমাজে পরিবারের প্রয়োজন কম।

(১৪) **নাগরিক জীবনের বৈচিত্র্য একটি উল্লেখযোগ্য দিক**: শহরবাসী সকলকে একইরকম মনে করাটা ভ্রান্ত ধারণা। সমাজতাত্ত্বিক হারবার্ট জে. গানস নাগরিকদের পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) **বিশ্বনাগরিক (cosmopolitanism)** : এ ধরনের অধিবাসীরা সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিক সুবিধাগুলো গ্রহণ করার জন্য শহরে বাস করে। এদের মধ্যে লেখক, শিল্পী ও জ্ঞানী মানুষদের কথা বলা যেতে পারে। (২) **অবিবাহিত সন্তানহীন** : শহরের সদাচঞ্চল সক্রিয় জীবনযাত্রা এবং বহুবিধ বিনোদনমূলক কার্যের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য এ জাতীয় মানুষেরা শহরে বাস করেন। (৩) **গোষ্ঠীভিত্তিক গ্রামবাসী** : এ ধরনের শহরবাসীরা তাঁদের নিজেদের দৃঢ় সংবদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকাটাই পছন্দ করেন। সুপ্রতিষ্ঠিত নাগরিকদের থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখার জন্য বহিরাগত গোষ্ঠীরা নিজেদের পৃথক করে রাখেন। (৪) **বঞ্চিত মানুষেরা** : খুব দরিদ্র মানুষেরা পরিবারসহ কম ভাড়ায় শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে। (৫) **শহরের ফাঁদে আটকে পড়া মানুষেরা** : কিছু শহরবাসী শহর ছেড়ে চলে যেতে চান। কিন্তু তাদের অল্প পুঁজি ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার পারেন না। গেনস্ নিম্নমুখী সচল (downward mobile) ব্যক্তিদেরও এই বিভাগের অন্তর্গত করেছেন। এ ধরনের মানুষেরা একটা সময় উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতেন। কিন্তু জীবিকানির্বাহের পথ বন্ধ হলে বাধ্য হয়ে বৃদ্ধ বয়সে তুলনামূলকভাবে কম মর্যাদাসম্পন্ন পরিবেশের মধ্যে বাস করতে হচ্ছে। এধরনের মানুষেরা মনে করেন তাঁরা শহরের ফাঁদে আটকে পড়েছেন। এরা সাধারণত

অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিরক্তি ভাব পোষণ করেন। বহিরাগত প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁদের অসহজ আচরণের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে এরা অন্যত্র বাস করতে আগ্রহী। এর থেকে বোঝা যায় শহরে দু'ধরনের মানুষ বাস করে, কারণ একদল মানুষের কাছে বাসস্থান হিসেবে শহর পছন্দসই। অন্যদের কাছে শহর বিভীষিকার মতো।

প্রতিবেশী সম্পর্কিত ধারণা নাগরিক জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আরনেষ্ট বার্জেস (Earnest Burgees) ১৯২০ সালে শিকাগো শহরে তাঁর জীবনযাত্রা সংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন গোষ্ঠীগত প্রতিবেশিত্বের (ethnic neighbourhood) ওপর। বহুদিন পরেও গ্রিকটাউন বা চায়না টাউনের অধিবাসীরা নিজেদের গোষ্ঠীগত সম্প্রদায়-এর সঙ্গে যথেষ্ট যুক্ত বলে মনে করে। তারা সাধারণত নিজেদের বৃহৎ শহরের অংশ বলে মনে করে না।

এসব বৈশিষ্ট্যগুলি নাগরিক মনোভাবকে বিশেস গুণসম্পন্ন করে তুলেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নাগরিক জীবনকে অ-নাগরিক জীবন থেকে পৃথক করে দেয়। নাগরিক সংস্কৃতি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এর অর্থ অধিকাংশ মানুষই নাগরিক মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তৎসত্ত্বেও গ্রাম ও নগরের বিভাজন এখনও খুব সুস্পষ্ট।

৫৯.৫ ভারতীয় নগরীয় সম্প্রদায়ের গঠনগত ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক

নগরায়ণ সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। ভারতে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসে অর্থনৈতিক উন্নতি, রাজনৈতিক পরিবর্তন, নতুন মূল্যবোধ এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। নগরায়ণ গ্রাম্য ও শহুরে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করে। সুতরাং আমরা এখন আলোচনা করব ভারতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন পরিবার, জ্ঞাতিবর্ণ ইত্যাদিকে যেগুলির নগরায়ণের ফলে পরিবর্তন হতে চলেছে। নতুন নতুন ধারণা ও মূল্যবোধ ভারতীয় জনতার মধ্যে জাগরিত হচ্ছে এই নগরায়ণের জন্য।

৫৯.৫.১ ভারতীয় নগরজীবনে পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিত্বের প্রভাব

এটা সর্বজনস্বীকৃত মতবাদ যে নগরায়ণ পরিবারের আকার, পারিবারিক বন্ধন এবং যৌথ পরিবারে ভাঙন এনেছে। যৌথ পরিবার ভারতীয় গ্রাম্য সমাজজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের কৃষিব্যবস্থা যৌথ পরিবার গঠন করতে সাহায্য করেছে।

শহরেও যৌথ পরিবার দেখতে পাওয়া যায়। শহরের যৌথ পরিবার সাধারণত সুবিধার ভিত্তিতে গঠিত হয়। পারিবারিক ব্যবসা এবং যৌথ আয় শহরে যৌথ পরিবার গঠন করতে সাহায্য করে থাকে। তবে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীদের মতে শহরের বৈচিত্র্য এবং শিল্পায়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যৌথ পরিবার তৈরি হয়ে থাকে।

শহরে জ্ঞাতি ও বিবাহেরও যথেষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামের আত্মীয়স্বজন ডাক্তারি, পরামর্শ, অর্থনৈতিক কাজকর্ম করার জন্য শহরে আত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। দীর্ঘদিন শহরে বাস করলেও নাগরিক সন্তান-সন্ততির বিবাহ বা অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠানের সময় গ্রামের জ্ঞাতি বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পরামর্শ বা সক্রিয় অংশগ্রহণ দাবি করে থাকে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে নগরায়ণের ফলে শহরের পরিবারের কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তনগুলি হল :

(১) পরিবার পরিবকল্পনার সচেতনার বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন শহরে পরিবারের আকার ছোট হয়েছে। ''হাম দো, হামারা দো'' এই শ্লোগান শহরেই জনপ্রিয়। (২) পূর্বতন পরিবার কিছু কিছু শিক্ষামূলক আনন্দদায়ী কাজ করে থাকত, কিন্তু বর্তমানে নানা সমাজিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার জন্য পরিবার এই কাজগুলি থেকে অব্যাহতি পায়, এবং (৩) শহরেই মহিলাদের মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হয়। ফলে মহিলাদের নানা কর্মসংস্থানের সুযোগ ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার-এর ব্যবস্থা হয়।

শহরে নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশায় কোনো বিধিনিষেধ না থাকার দরুন ধর্ম বহির্ভূত, বর্ণ বা জাত বহির্ভূত এবং রাজ্য বহির্ভূত বিবাহের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। শহুরে পুরুষ জীবনসঙ্গী নির্বাচনে প্রাচীন প্রথা ত্যাগ করে শিক্ষিতা চাকুরিজীবী পাত্রী পছন্দ করে থাকে। বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানেরও নানা সংক্ষেপ করা হয়েছে। বিবাহের বয়সসীমাও বেড়েছে। শহুরে নাগরিকের ধারণায় বিবাহ কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নয়, ফলে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যাও কিছু কম নয়।

নগরায়ণের ফলে জ্ঞাতিত্বের প্রভাবও আর আগের মতো নেই। শহরের যুবক-যুবতী জ্ঞাতি সম্পর্ক থেকেও বন্ধুবান্ধব, অফিসের সহকর্মী, পাড়া-প্রতিবেশীর সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও প্রভাব জ্ঞাতিত্বকে বিলীন করে দেয়।

তবে একথা ঠিক হবে না যে শহরের মানুষের জীবনে পরিবার, বিবাহ, জ্ঞাতির প্রভাব নেই। প্রভাব এখনও আছে। তবে প্রভাবের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি নানাভাবে আধুনিক হয়েছে।

৫৯.৫.২ বর্ণ বা জাতি (Caste)

সাধারণ অর্থে জাতি বা বর্ণ (caste) হল এমন একটি বিষয় যা ভারতীয় গ্রাম্যজীবন ও কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। ভারতীয় সমাজকে বর্ণ বা জাতির ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস করা হয়। শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরবিন্যাসে নানা পরিবর্তন আসে।

শ্রীনিবাস, গোরে ঘুরিয়ে প্রমুখ ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীরা নগর এলাকায় বর্ণ বা জাতির প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণায় দেখা যায় যে নগরজীবনে বর্ণ বা জাতির প্রভাব কিছু কম নয়। গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে মানুষ নিজের বর্ণ বা জাতির পরিচয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তার প্রতিদিনের বাঁচার লড়াইতে বর্ণের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। লক্ষ্ণৌ শহরের রিকশাওয়ালাদের মধ্যে বর্ণের প্রভাব নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে পেশায় রাজ্য, ধর্ম-এর বিভিন্নতা থাকলেও নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় বর্ণ বা জাতির ভিত্তিতে। ব্রিটিশ শাসনকালেও দেখা যায় যে উচ্চবর্ণের লোকেরা সমাজে উচ্চশ্রেণিতে বাস করেন। স্বাধীনতার পরে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হলেও ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে বর্ণভিত্তিক নগরে অভিজাত শ্রেণি তৈরি হয়। নির্বাচনে, ক্ষমতা বণ্টন এবং সামাজিক রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার ক্ষেত্রেও বর্ণ বা জাতির প্রভাব অনস্বীকার্য। নগরে বর্ণ বা জাতি ব্যবস্থার রূপ কিছুটা শিথিল, গ্রামের মতো অনমনীয় নয়। কিন্তু শহুরে লোক অধিকাংশ সময়ে বর্ণ বা জাতির মধ্য দিয়ে নিজ পরিচয়পত্র বহন করে থাকে।

৫৯.৫.৩ নগরীয় রাজনীতি (Urban politics)

ব্রিটিশ শাসনকালে নগরগুলিতে সবচেয়ে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের পরীক্ষানিরীক্ষা চলে। আঞ্চলিক সরকারগুলিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বে ভারতীয় নগরগুলিতে সীমিত ক্ষেত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। পৌর সরকারগুলি জনপ্রতিনিধিত্বের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কলকাতা পৌর প্রশাসনে অংশগ্রহণ করতে পারেন শুধুমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হওয়ার জন্য। পরবর্তীকালে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রধানত নগরগুলিতে প্রথম সংগঠিত হয়। স্বদেশী আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করা ইত্যাদি সবগুলিরই একটা নগরীয় চরিত্র ছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতে নগরীয় রাজনীতির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় পৌর প্রশাসনে এবং রাজ্য ও জাতীয় স্তরের নির্বাচনে। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নগরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। নগরীয় রাজনীতিতে অর্থ, সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণি ও বর্ণ সচেতনতা প্রভাব ফেলতে শুরু করল। প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এই উপাদানগুলির ব্যবহার শুরু হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, নানাধরনের স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাগুলিরও নগরীয় রাজনীতির উপর প্রতিচ্ছায়া পড়তে থাকে। সাম্প্রতিককালে Citizens for Democracy, People's Union for Civil Liberties (PUCL), Sampura Kanti Manch, Sampradayikata Virodhi Samiti প্রমুখ অ-রাজনৈতিক সংস্থাগুলি নগরে গণতন্ত্রীকরণ, রাজনীতিকরণ এবং নিরপেক্ষতাকরণে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

৫৯.৫.৪ নগরীয় সামাজিক বিষয়সমূহ

এখন আমরা নগরায়ণে কোন্ কোন্ সামাজিক বিষয়গুলি প্রাধান্য লাভ করে তা আলোচনা করব। ভারতীয় শহরগুলিতে সামাজিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া থেকে দেখা যায় যে শহরে অর্থনীতির ভিত্তিতে যে শ্রেণি তৈরি হয় সেখানে বর্ণ বা ধর্মের কোনো প্রভাব নেই। নতুন নতুন চাকরির সুযোগ-সুবিধার ফলে শহরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়। এই সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করার ক্ষেত্রে শত্রুতা ও সহযোগিতা দুইই দেখতে পাওয়া যায়। নানারকমের শ্রেণির উদ্ভব হতে দেখা যায়। এইসকল শ্রেণিদের মধ্যে সামাজিক সচলতা (social mobility) কীরকম হয়ে থাকে তা সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় হতে পারে।

শহরে নানা জায়গা থেকে লোকজন আসতে থাকে। ফলে শহরে গ্রাম্য ও শহুরে সংস্কৃতির সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। নানারকমের সামাজিক বিষয়ের উদ্ভব হয়। উপরন্তু সমতা, স্বাধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে নতুন মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি, রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলি শহুরে লোকেদের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলে থাকে। অনেকসময় পুরাতন ও নতুন মূল্যবোধের সংঘাত ব্যক্তি, পরিবার এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অনুভব করা যায়। পরিবারে মহিলাদের পদমর্যাদার পরিবর্তনও দেখতে পাওয়া যায়।

৫৯.৬ নগরায়ণ সম্পর্কিত লুইন হুরথ-এর তত্ত্ব

নাগরিকত্ব নিয়ে হুরথ-এর গবেষণা শহরের অভ্যন্তরীণ পার্থক্যের প্রতি কম দৃষ্টি দেয়। সামাজিক অস্তিত্ব হিসাবে নাগরিকত্বের রূপটিও সেখানে গুরুত্ব পায়। হুরথ দেখেছেন, বর্তমান পৃথিবীকে কতটা পরিমাণে শহুরে বলা যায় তা পুরোপুরি জনবসতি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। মানুষের জীবনে শহরের প্রভাব আর

শহরবাসীর সংখ্যা দুটিকে অনুপাতে প্রকাশ করলে দেখা যায় প্রথম সংখ্যাটি দ্বিতীয়টির চেয়ে অনেক বেশি। কারণ শহর কেবল বাসস্থান এবং কর্মস্থল নয়, এটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নিয়ন্ত্রক। তাই পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও শহরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হুরথ বলেছেন যে শহরে বহুসংখ্যক মানুষ একে অন্যের খুব কাছে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয় তাদের মধ্যে প্রায় থাকেই না। এটি সনাতন গ্রাম্য সভ্যতার একটি বিপরীত বিষয়। শহরবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ যোগাযোগই আংশিক। এই যোগাযোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যে পৌঁছোবার উপায়। নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছা এক্ষেত্রে থাকে না। পারস্পরিক ক্রিয়া আধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলতে চলতে ঘটে যাওয়া সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে ঘটে থাকে।

যেহেতু নগরবাসী খুব গতিশীল, তাই তাদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধন গড়ে ওঠে না। মানুষ সারাদিন বিভিন্ন কার্যাবলী ও পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়ে চলে। শহরের জীবনযাত্রার গতি গ্রামাঞ্চলের থেকে অনেক দ্রুত। দ্বন্দ্ব বিরোধের প্রক্রিয়াগুলো সহযোগিতার তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। হুরথ-এর মতো সামাজিক জীবনের ঘনত্ব থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রতিবেশিত্ব গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ঐতিহ্যপূর্ণ যোগাযোগ দেখা যায়। সেখানে অধিকাংশ মানুষ একে অপরকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে। নাগরিক জীবনধারা এ ধরনের অঞ্চলগুলিতে যত অনুপ্রবেশ করবে, তত এই অঞ্চলগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হবে।

নগরজীবনে অন্তরঙ্গহীনতা এবং নৈর্ব্যক্তিকতার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আধুনিক শহরে দৈনন্দিন যোগাযোগ নৈর্ব্যক্তিক কিছু ক্ষেত্রে বলা যায়, এই নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক আধুনিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

হুরথ-এর তত্ত্বে নাগরিকত্বকে কেবল সমাজজীবনের একটি অংশ রূপেই ধরা হয় না। বৃহৎ সামাজিক পরিকাঠামোর ওপর এর যে প্রভাব তার প্রতিও নজর দেওয়া হয়। নাগরিক জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো সমাকভাবে আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলো এখন কেবল শহরবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

৫৯.৬.১ হুরথ-এর তত্ত্বের সমালোচনা ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীদের মতামত

লুইস্ হুরথ-এর তত্ত্বের বেশ কয়েকটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আধুনিক সমাজতত্ত্বের ধারণা অনুসারে বলা যায়, শহর মানেই বিচ্ছিন্ন নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক—এই ধারণাটি অবাস্তব। শহর ও অন্যান্য অঞ্চলের মতো পরিবর্তিত হতে থাকে। এই পরিবর্তনের হার অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতেই পারে। নাগরিক জীবন মানেই দ্রুত গতিসম্পন্ন, বিপজ্জনক এবং অপছন্দসই আর গ্রাম্যজীবন ধীর গতিসম্পন্ন, সুন্দর ও বন্ধুত্বপূর্ণ—এই ধারণাটি অতিমৌলিক পরীক্ষালব্ধ গবেষণায় ধরা যায় না। অভ্যন্তরীণ শহর জীবন বন্ধুত্বপূর্ণ, আগ্রহপূর্ণ, সামাজিক সম্পর্কযুক্ত এবং বিশ্বনাগরিকত্বের পরিচয়বাহী হতে পারে। সর্বদাই সেখানে বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব এবং সংগ্রামী জীবনধারা প্রবাহিত হয় না।

পরিবেশগত ধারণার সঙ্গে এই মতবাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। মূলত আমেরিকার শহরগুলো পর্যবেক্ষণ করে হুরথ তাঁর নাগরিকত্ব সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি গড়ে তুলেছেন। নাগরিকত্বের ধারণা কিন্তু সবসময় সবস্থানে একরকম হয় না। প্রাচীন শহরগুলিতে মানুষের যে ধরনের জীবনযাত্রা, এখনকার গ্রামাঞ্চলে জীবনযাত্রার সঙ্গে তার তুলনা করলে দেখা যাবে প্রথম ক্ষেত্রটির চেয়ে দ্বিতীয়টি অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক এবং নামহীনতার দোষে দুষ্ট।

আধুনিক নাগরিক জীবনের নৈর্ব্যক্তিকতার তত্ত্ব নিয়ে হুরথ কিছুটা অতিকথন করেছেন। তিনি যতটা বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি স্থায়ী, ঘনিষ্ঠ, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক আধুনিক জীবনে তৈরি হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরই সহকর্মী ইবারেক্ট হাগস বলেছেন, লুইসের মতে এখন নাগরিক জীবনে সবকিছুই নৈর্ব্যক্তিক; যদিও আত্মীয়-বন্ধু সমাবেশে একসঙ্গে বাস করার বিষয়টি অতিমাত্রায় ব্যক্তিগত (Kasanda & lanowity; 1974)। আধুনিক শহরগুলিতে শহুরে গ্রামবাসীদের সংখ্যাও অনেক। হারবার্ট জানসই এদের নাম দিয়েছিলেন 'শহুরে গ্রামবাসী'। শহর-জীবনে প্রতিবেশীদের মধ্যে গভীর আত্মীয়তার বন্ধন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা কেবলমাত্র পূর্ব প্রচলিত জীবনধারা অংশবিশেষই নয়, তারা নতুন শহরজীবনের শরিক।

ক্লড ফিশার ব্যাখ্যা করেছেন, কেন বৃহৎ আকারে নাগরিক মনোভাব একই ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির জন্ম দেয়। সকলকে নামবিহীন একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে টেনে আনার পরিবর্তে শহরবাসীরা স্থানীয় যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমমনস্ক ও একই ধরনের প্রেক্ষাপট থেকে আসা মানুষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেন। তারা বহুবিধ ধর্মীয়, জাতিগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারেন। ছোট শহর বা গ্রামগুলি কিন্তু এধরনের বহুবিধ বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দেয় না।

শহরে যারা গোষ্ঠীভিত্তিক সম্প্রদায় গড়ে তোলে, হয়তো তাদের একে অপরের জন্মস্থান সম্পর্কে ধারণা খুব অস্পষ্ট। শহরে এসে তারা খুঁজে নেয় একই ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা অন্য আধিবাসীদের। এরা সবাই মিলে নতুন উপ-সম্প্রদায় (sub-community) গড়ে তোলে। একজন শিল্পী গ্রামে বা ছোট শহরে নিজের সহযোগী কাউকে খুঁজে পেতে পারে। তবে নাগরিক জীবনে সে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বুদ্ধিজীবী সমাজের অঙ্গ বলেই মনে করে।

কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে হুরথ যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে নাগরিক বৈশিষ্ট্য বলেছেন সেগুলি গ্রাম ও ছোট শহরেও কিছুটা লক্ষিত হয়। পিটার মান দক্ষিণ ইংল্যান্ডের সাসেক্সের ছোট একটি গ্রামের সঙ্গে উত্তরের হাডার্সফিল্ডের তুলনা করেছেন। গ্রামটি থেকে লণ্ডন যাওয়ার সড়কপথ ও রেলপথ আছে। অনেক গ্রামবাসীই পরিবহন ব্যবস্থার সাহায্য শহরে যাতায়াত করেন। তাঁরা উত্তরাঞ্চলের শহরবাসীদের চেয়ে অনেক অভিজাত এবং বিশ্বনাগরিক মনোভাবাপন্ন। উত্তরের শহরাঞ্চলের সঙ্গে লণ্ডনের দূরত্ব অবশ্যই গ্রামটি থেকে লন্ডনের দূরত্বের চেয়ে বেশি। সম্ভবত উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্র সাসেক্সের গ্রামাঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। তাই বলা যায়, শহরের কেন্দ্রস্থলে অধিবাসী মানুষগুলো গ্রামে চলে আসায় এখনকার পুরোনো ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো ক্রমশ নষ্ট হয়ে পড়ছে। এটি সত্য হলে ধরে নিতে হবে নৈর্ব্যক্তিক এককগুলোর পরিবর্তনই এর কারণ। সম্যকভাবে নাগরিক অস্তিত্বকে এর জন্য দায়ী করা যায় না।

একটি বৃহৎ নগর অপরিচিত মানুষদের সম্মিলিত স্থান। তবে এদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটা কিন্তু হেঁয়ালি নয়। জনজীবনে অপরিচিত ব্যক্তিদের যোগাযোগ আর ব্যক্তিগত যোগাযোগ (পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী) এক কথা নয়। গ্রাম্যজীবনে প্রবেশ করলে সহজেই অন্য মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু শহরের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে না। শহরে স্বাভাবিক অপরিবর্তিত ব্যক্তি বহিরাগত হিসাবেই থাকেন, মানুষ একে অন্যকে দিনের পর দিন বাসস্টপে বা রেলস্টেশনে, কর্মস্থলে যাওয়ার পথে দেখে থাকে। কিন্তু তারা কখনোই একে অন্যের বন্ধু হয়ে ওঠে না। একে অন্যের কাছে অপরিচিতই থেকে যায়।

হুরথ-এর ধারণাগুলির কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা আছে। তবে সবক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে বলা যায় এটি অতিকথন দোষে দুষ্ট। আধুনিক নগরগুলি নৈর্ব্যক্তিক, নামবিহীন সামাজিক সম্পর্কযুক্ত হলেও এর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, আর আছে ঘনিষ্ঠতা।

৫৯.৬.২ নগরজীবনের আলোচনায় পরিবেশগত তত্ত্ব

নগরে গড়ে ওঠা সম্পর্কগুলো নাগরিক পরিবেশ গঠনে গুরুত্ব পাবে। আবার নগরের পরিবেশগত অবস্থান সামাজিক পরিবর্তনকে সহায়তা করবে। এই মতবাদ কাঠামো ক্রিয়াবাদী। এই মতবাদ অনুযায়ী নাগরিক জীবনের বিভিন্ন এককগুলো স্থায়িত্ব রক্ষা করার জন্যে চেষ্টা করে। তত্ত্বটি রবার্ট পার্কের সৃষ্টি। তাঁর মতে পরিবেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মতো শহরও নিয়মনিষ্ঠ ধরনে অভ্যস্ত। পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা ভৌতবিজ্ঞানের কাছেও ঋণী। প্রাকৃতিক পরিবেশে, জীবদেহ ভূখণ্ডের ওপর নির্দিষ্ট উপায়ে বিন্যস্ত থাকে। এই বিন্যাস এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। শিকাগো স্কুলের মত অনুযায়ী নাগরিক বসতি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেশিত্ব একই নিয়মে বিন্যস্ত থাকে। শহর কখনও হঠাৎ করে গড়ে ওঠে না। বিভিন্ন সুবিধার পরিবেশ সৃষ্টি করা হলে তখনই শহর সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৃহৎ শহরাঞ্চল আধুনিক সমাজে নদীর তীরে, উর্বর সমভূমি ও বিভিন্ন বাণিজ্যপথ, সড়কপথ ও রেলপথের সংযোগস্থলে গড়ে ওঠে। পার্কের মতে তৈরি হওয়ার পর শহর নিজেই নির্বাচন করার একটি পদ্ধতি সৃষ্টি করে। কোন্ কোন্ ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে ও নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করার উপযোগী তা এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। শহর স্বাভাবিক অঞ্চল দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি হল দ্বন্দ্ব, আক্রমণ ও উত্তরাধিকার। প্রতিটি পদ্ধতিই জৈবিক পরিবেশকে অনুসরণ করে। যদি প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে একটি হ্রদের পরিবেশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়, দেখা যাবে সেখানে নিজেদের মধ্যে স্থায়ী ভারসাম্য লাভের জন্য মাছ, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। কোনো বহিরাগত প্রাণী যদি সেই অঞ্চলে প্রবেশ করে তবে হ্রদের ভারসাম্য নষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে হ্রদের মূল কেন্দ্রে বসবাসকারী প্রাণী বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়।

পরিবেশগত কারণ অনুসারে বিভিন্ন শহরে লোকবসতির প্রকৃতিতে সাধারণত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অধিবাসীদের মানিয়ে নেওয়ার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রতিবেশিত্ব তৈরি হয়। এই মানিয়ে নেওয়া তাদের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত। একটি শহর প্রকৃতপক্ষে বিবিধ বৈচিত্র্য এবং বৈপরীত্যের একটি মানচিত্র। আধুনিক শহর গড়ে ওঠার একটি প্রাথমিক পর্যায় ছিল। তখন প্রয়োজনীয় কাঁচামালপূর্ণ অঞ্চলে কারখানা গড়ে উঠেছিল। এই কর্মস্থলকে ঘিরে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। জনসংখ্যা যত বাড়বে, ততই বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে থাকে শহরের লোকবসতি, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ক্রমশ বেশি আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছিল। সেই জিনিসগুলি পাবার জন্য প্রতিযোগিতাও তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

জমির মূল্য এবং সম্পত্তি কর বৃদ্ধি পেল। অনেক পরিবারের পক্ষেই শহরের মূলকেন্দ্রে থাক অসম্ভব হয়ে পড়ল। কেবলমাত্র তারাই শহরে বাস করতে থাকল যারা কোনো বিশেষ কারণে ছাড় পায় বা কোনো ভগ্নপ্রায় বাড়ির ভাড়া কম বলে সেখানে থাকার সুযোগ পাচ্ছে। শহরের মুলকেন্দ্রে প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনোদনমূলক কার্য হতে থাকল। সমৃদ্ধশালী পরিবারগুলি ক্রমশ নতুন গজিয়ে ওঠা মফঃস্বল অঞ্চলে সরে যেতে থাকল। ফলে পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠল। ফলে কর্মস্থলে যাতায়াত করতে সময় কম লাগে এবং মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলি ক্রমশ উন্নতি করতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাগরিক পরিবেশবাদীরা কেন্দ্রীভবনের

তত্ত্বের (concentric zone theory) উল্লেখ করেন। এই তত্ত্ব বার্জেস তৈরি করেছেন।

শহরগুলো অনেকসময় কেন্দ্রীভূত হয়ে রিং-এর মতো আকার নেয়। এগুলি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কেন্দ্রে থাকে শহরের অভ্যন্তরীণ অঞ্চল। এই অঞ্চলে বাণিজ্যিক উন্নয়ন এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় বাড়ি দেখা যায়। পুরোনো প্রতিবেশীর বাইরেও নিম্নশ্রেণির মানুষের বাড়ি থাকতে পারে। আবার উপনগরীতেও উচ্চবিত্ত মানুষ বাস করেন। আক্রমণ ও উত্তরাধিকার প্রক্রিয়া শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ঘটতে থাকে। শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সম্পত্তি ধ্বংস হলে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সেই দিকে গমন করা শুরু করে। তাদের এই প্রয়াস শুরু হলে পূর্বস্থিত জনবসতি সেই স্থান পরিত্যাগ করে শহরের অন্য স্থানে বা মফঃস্বলে যাত্রা করে।

নাগরিক পরিবেশবাদ ক্রমশ নিন্দিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে এটি পুনরুজ্জীবিত হয় এবং বৃহৎ আকার নেয় বিভিন্ন লেখকদের রচনার মাধ্যমে। এদের মধ্যে এ. হ্যাডলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রধান দৃষ্টি ছিল শহরের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার দিকে। তাঁর পূর্বসূরীদের মতো দুষ্প্রাপ্য সম্পদের সমন্বয়ের দিকে তাঁর ততটা মনোযোগ ছিল না। গোষ্ঠী ও জীবিকাভিত্তিক পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণের মাধ্যমেই মানুষ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয়। গোষ্ঠীর ওপর অনেকে নির্ভরশীল থাকলে তাদের একটি বিশেষ ভূমিকা দেখা দেয়। সেই ভূমিকার প্রতিফলন তাদের কেন্দ্রীয় ভৌগোলিক অবস্থানে দেখা যায়।

নগর সংক্রান্ত বহু গবেষণা সম্যকভাবে এবং নির্দিষ্ট প্রতিবেশ পরিবেশবাদ দ্বারা বিশিষ্টতা পায়। এই মতাবাদের বিভিন্ন সমালোচনাও করা হয়। পরিবেশগত ধারণা শহরের সাংগঠনিক ও পরিকল্পনামূলক পদ্ধতির দিক যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না। নগর উন্নয়ন বিষয়টিকে এই মতবাদে স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসাবে ধরা হয়। পার্ক, বার্জেস ও তাদের সহকর্মীরা স্থান সম্পর্কিত সংগঠনকে মডেল হিসাবে ধরে নিয়েছেন। তাঁদের এই তত্ত্ব মূলত আমেরিকার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। এই মডেলটি সেখানকার কয়েকটি শহরের সঙ্গে মানানসই কিন্তু ইউরোপের অনেক জায়গা, জাপান, পূর্ব ইউরোপ বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে কোনো মিল থাকে না।

স্থান কেন্দ্রীভবনের তত্ত্বে ক্রিয়াকাজমূলক মানসিকতা, এর স্থায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব বিশেষ নজর পায়। তবে মহানগরের বিশেষ কিছু চিন্তাভাবনা এখানে গুরুত্ব পায়নি, যেমন অভিজাত ব্যক্তিদের দ্বারা শহরের প্রান্তসীমার জমির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারকে এখানে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। তবে শ্বেতকায়দের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আফ্রিকার অধিবাসী আমেরিকার লোকেদের আগমনকে সমাজতাত্ত্বিকদের ভাষায় আক্রমণ এবং উত্তরাধিকার বলা হচ্ছে। নাগরিক পরিবেশবাদ লিঙ্গভেদের অসমতা বিষয়ে খুব বেশি গুরুত্ব দেয় না। যেমন শহরের পার্কগুলোকে পুরুষদের গল্‌ফ খেলার কথা উল্লেখ করা হলেও মহিলাদের ক্রীড়া অনুশীলনের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নাগরিক সনাতন পরিমাপ অতিক্রম করে গেল। নাগরিক পরিবেশবাদীরা আর শহরের মূলকেন্দ্রের বৃদ্ধির তথ্যে গুরুত্ব আরোপ করলেন না। কারণ অনেক নাগরিকই শহর ছেড়ে মফঃস্বলে বসবাস করতে শুরু করলেন। মহানগর অঞ্চলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় পাওয়া গেল। তাই সি. ডি. হ্যারিস, এডওয়ার্ড কুম্যান বহুকেন্দ্র তত্ত্ব গড়ে তোলেন। তাঁদের মতে, নাগরিক উন্নয়ন সবসময় বাণিজ্যকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে ঘটে না। মহানগরের বিভিন্ন উন্নয়ন কেন্দ্র থাকে। প্রতিটি কেন্দ্র নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। তাই একটি শহরে অর্থনৈতিক কেন্দ্র, উৎপাদন অঞ্চল, সমুদ্র নিকটবর্তী অঞ্চল বিনোদনমূলক স্থান প্রভৃতির সহাবস্থান হয়ে থাকে। প্রতিটি কেন্দ্রে নির্দিষ্ট ধরনের বাণিজ্যকেন্দ্র ও বসতবাড়ি দেখা যায়।

মফঃস্বল অঞ্চলে গড়ে ওঠা বাজারকে বহুকেন্দ্র সমন্বিত মহানগরের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। প্রথমদিকে শহরের সব পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্রগুলি বাণিজ্যকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। প্রতিটি অঞ্চলে একটি মুদির দোকান, ব্যাঙ্ক থাকত। বিশেষ কিছু কেনাকাটা করতে হলে মানুষ শহরের অন্যান্য অঞ্চলের দোকানে যেত। ক্রমশ মহানগরের আয়তন বৃদ্ধি পেল। তখন মানুষ নিজের বাড়ির কাছেই কেনাকাটা করতে শুরু করল। বর্তমানে মফঃস্বলের বাজারও শহরের মতো অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন আধুনিক নাগরিক পরিবেশবাদীরা নতুন ধরনের গবেষণা করেছেন। ইয়োল ইথানক্যাল (১৯৯১) ''শহরের প্রান্ত'' বলে একটি নতুন ধারণা প্রকাশ করেন। এই ধরনের অঞ্চলে মহানগরের প্রান্তসীমায় গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কেন্দ্র হিসাবে এই অঞ্চলের একটা মূল্য আছে। অট্টালিকার উচ্চতা, অবসর বিনোদনের উপায়, কর্মস্থলের আয়তন এবং সর্বোপরি জনসংখ্যা যাকেই—মাপকাঠি ধরা হোক, দেখা যাবে মফঃস্বলের তুলনায় শহরের প্রান্তে অনেক বেশি স্বাধীন নগর এলাকা হয়ে উঠেছে।

৫৯.৬.৩ গ্রামাঞ্চলের নগরায়ণ (Rurbanization) : রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্ব

সম্প্রদায়কে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—একটি গ্রাম, অন্যটি নগর। একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক গ্রামেই বাস করত। এখনও প্রত্যেক দেশেই মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ গ্রামে বাস করে। গ্রাম এবং নগর বলতে ঠিক কী বোঝায়, সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা আমাদের আছে। তবে দুটি জনপদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা সহজ নয়। কারণ সব নগর বা সব গ্রামের আকৃতি-প্রকৃতি সমান হয় না। বরং লোকসংখ্যা, আয়তন এবং জীবন প্রণালীর দিক থেকে এক নগরের সঙ্গে অন্য নগরের অনেক তফাত। এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের পার্থক্যও বেশ লক্ষ্য করার মতো।

গ্রামসমাজ আর নাগরিক সমাজকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে পৃথক করা হয়। (১) নাগরিক সমাজ গ্রামের তুলনায় আকারে ও লোকসংখ্যায় বেশি বড়। প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটার সুযোগ শহরে কম। সীমিত জনবসতির জন্য গ্রামে অধিকাংশ সম্পর্কই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। (২) নাগরিক জীবন শিল্পনির্ভর। গ্রামীণ সমাজ এখনও কৃষিকেই প্রধান জীবিকা বলে মনে করে। (৩) গ্রামবাসীরা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবাসম্পন্ন হয় না। নগরে প্রতিযোগী মনোভাব নিয়েই সকলে চলতে থাকে। কিন্তু এই পার্থক্যগুলি আধুনিক সমাজে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। শিল্পোন্নত আধুনিক দেশগুলির গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা এখন আর আগের মতো নেই। বস্তুত এই সমস্ত দেশের গ্রামগুলি বর্তমানে বহুলাংশে পৌরবিশিষ্টতাসম্পন্ন হয়ে উঠছে।

গ্রামাঞ্চলের নগরায়ণ অর্থাৎ Rurbanization-এর ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করেন ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। তাঁর মতে, আধুনিক ভারতের সামাজিক অর্থনীতির অনেকগুলি ক্ষেত্রেই এই ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অতীতকালে মানুষের ধারণা ছিল, সম্প্রদায় দু'ধরনের হতে পারে, একটি শহর আর অন্যটি গ্রাম। তবে স্থানীয় পরিকল্পনা ব্যবস্থার কল্যাণে শীঘ্রই তৃতীয় এই ধাঁচের প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। এটি শহর এবং গ্রাম সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী একটি ধারণা, একে গ্রাম-শহরাঞ্চল (Rurban Community) বলা যায়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রাম এবং শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি মিশ্রিত হয়ে গেছে। শহরজীবনের প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক দক্ষতা এখানে বর্তমান। আবার গ্রামীণ সমাজের কৃষিনির্ভরতার একটি নতুন রূপ এখানে দৃষ্ট হয়। এই ধরনের সম্প্রদায় ছোট কৃষিনির্ভর শহর আর আধা গ্রামাঞ্চলকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এই ধরনের অঞ্চল পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। বর্তমানে সমাজে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে এবং শিল্পক্ষেত্রে এক

ধরনের ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। এর ফলে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আন্তর্মানবিক সম্পর্ক ভীষণ প্রভাবিত হয়। এর ফলশ্রুতি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক জীবনযাত্রায় লক্ষিত হয়। এ ধরনের অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্যে প্রয়োজন উপগ্রহ শহর (satellite towns) এবং গ্রামাঞ্চলের নগরীভবন। এর সঙ্গে গ্রাম আর শহর সংযোগের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিল্প আর কৃষির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে ওঠে। শহর আর গ্রামের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান আর আত্তীকরণই সঠিকভাবে গ্রামাঞ্চলে নগরায়ণ করে তুলতে পারে।

ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই ধারণাটি গ্রহণ করেছিলেন সামাজিক পরিবেশবিদ্যার থেকে। সামাজিক পরিবেশবিদ্যা দাঁড়িয়ে আছে সমাজতত্ত্ব আর জীবনবিজ্ঞানের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। ভারতবর্ষে শিল্পায়নের সময় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি ছোট ছোট শহরকে উন্নত করতে সাহায্য করে। শিল্পগুলির আঞ্চলিক বণ্টন এবং যোগাযোগ, পরিবহন ব্যবস্থার অতুলনীয় উন্নতি এই উন্নয়নকে আরও অগ্রসর করে। কৃষি শিল্পায়ন সামাজিক পদ্ধতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

যানবাহন এবং প্রচারমাধ্যমগুলির দ্রুত প্রসারলাভের ফলে গ্রামসমাজ এবং নগরসমাজের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে কোথায় গ্রামসমাজের শেষসীমা এবং কোথায় নগরসমাজের শুরু এই বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু বলা শক্ত। অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে দুটি জনপদের সীমা নির্ণয় করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। যদিও গ্রামাঞ্চলে কৃষি হল মুখ্য জীবিকা কিন্তু কৃষিভিত্তিক নানারকম শিল্প গড়ে উঠছে। বৈজ্ঞানিক চাষ-পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে কৃষিও অন্যতম শিল্প হিসাবে রূপ নিচ্ছে। তাছাড়া, প্রচারমাধ্যমগুলির সম্প্রসারণের ফলে শহরের পোশা-পরিচ্ছদ, আদবকায়দা এবং উৎসব-অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটছে গ্রামাঞ্চলে। কয়েক বছর আগেও গ্রাম্য এবং শহুরে এই দুটি শব্দ পৃথক জীবনচর্যা নির্দেশ করত। যত দিন যাচ্ছে এই পার্থক্য দূর হয়ে যাচ্ছে। শহরের আকারপ্রকার এবং প্রকৃতিতে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। কোনো কোনো শহরকে over grown village আখ্যা দেওয়া হয়। আবার বড় বড় শহরগুলিকে metropolis, megapolis ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। শহরগুলির মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে অনেক সময় সন্দেহ হয় সব ক'টি শহর নামক জনপদকে শহর বা নগর পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা। বিভিন্ন গ্রামের আকৃতি-প্রকৃতিতেও অনুরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য বর্তমান যুগে সমাজতত্ত্ববিদগণ গ্রাম সমাজ এবং নগরসমাজকে একটি অনবচ্ছেদ বিষয় হিসেবে দেখার পক্ষপাতী। কোনো কোনো জনপদ হয়তো খুব অগ্রসর। আবার কোনো কোনো জনপদ খুবই পশ্চাৎপদ। এই দুটি প্রান্তসীমার মধ্যে নানা আয়তনের এবং নানা প্রকৃতির জনপদ রয়েছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল আবিষ্কারের ফলে ছোট, মাঝারি, বড়—সব জনপদই আকারে বাড়ছে। এদের মধ্যে প্রকৃতিগত মিলও ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। গ্রামসমাজে ক্রমশ গ্রাম্যভাব বিলীন হয়ে শহুরে ভাব প্রাধান্য পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এই দুই জনপদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশি হবে, এই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নতুন ধরনের এই সম্প্রদায়গুলিতে পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে পড়ছে। সেই জায়গায় ছোট ছোট একক পরিবার গড়ে উঠেছে। বর্তমানে ব্যক্তির পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহ ও অন্যান্য বহু বিষয় আর পারিবারিক পছন্দ-অপছন্দের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয় না। কৃষিক্ষেত্রগুলিতে যান্ত্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হচ্ছে। এখন উচ্চফলনশীল বীজ, উন্নত সেচব্যবস্থা, রাসায়নিক সার, কীটনাশক

ওষুধ প্রভৃতির ব্যবহার হচ্ছে। তাই সারাবছরই চাষ-আবাদ করা যাচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে বিপণন ব্যবস্থাতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ছোট ছোট শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য আর চাকরি করে উপার্জন করার প্রবণতা অধিবাসীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জীবনযাত্রার মানের গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নাগরিক সমাজের প্রভাবে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। জাতিভেদ প্রথার প্রকোপ বহুলাংশে হীনবল হয়ে পড়েছে। পূর্বের প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থার মধ্যেও পরিবতর্ন এসেছে। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গুণাবলীকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থা সবিশেষ গুরুত্ব পায় এখনকার যুগে। পাত্র-পাত্রীর মতামতের প্রসঙ্গটি এর সঙ্গে জড়িত।

এধরনের সমাজব্যবস্থায় গ্রাম ও শহরের মিশ্রসংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশ দেখা যায়। আগেকার দিনের আন্তরিক সম্পর্ক গ্রামবাসীদের মধ্যে এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সমষ্টিগত চেতনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত, এখন তা ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক দিক দিয়ে বিচার করলে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে আগেকার সামাজিক সম্পর্ক বা সামাজিক বন্ধন এখন বহুলাংশে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে।

এই অঞ্চলে প্রাথমিক সম্পর্কের চেয়ে গৌণ সম্পর্কই বেশি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। আসলে পরিচিত অপরিচিত বহু ধরনের মানুষের সমন্বয়ে এই অঞ্চলগুলি গড়ে ওঠে। অধিবাসীদের বহুবিধ প্রয়োজনীয় কাজকর্মের তাগিদে বহু ও বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা করতে হয়। এই সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আন্তরিকতা থাকে না। এই সম্প্রদায়ে নারীর ভূমিকার ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলের নারীর স্থান মূলত অন্দরমহলেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীও আজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলে নগরায়ণের ফলে নারীর ভূমিকায় পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। বাইরের জগতের মতো অন্দরমহলেও নারীর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

৫৯.৬.৪ শহরের প্রাধান্য

ক্রমশ সাংস্কৃতিক বিস্তার থেকে আমরা রাজনৈতিক শাসনের দিকে আলোচনা নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য, প্রভাবের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রটি নিয়ে কথা বলা। ছোট সম্প্রদায় সাধারণত বড় সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণত শহর ক্ষমতার একটি কেন্দ্রর হয়ে দাঁড়ায়। দু'হাজার বছর আগে রোম শহর ছিল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি। শহর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে কোনো রাজনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ চালাতে পারে না। নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন হয় একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে। ওয়াশিংটন এমন একটি উদাহরণ যেটি মূলত সরকারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ওয়াশিংটনে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত তা পশ্চিম ভার্জিনিয়া, মেক্সিকোর উচ্চ সমভূমি, জাম্বিয়ানার সাভানা এবং সাইবেরিয়ার স্টেপস্ অঞ্চলে কার্যকর হত। লণ্ডন, মস্কো, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, বেজিং, রোম, টোকিও শহরেও এরূপ প্রভাব দেখা যাবে। শহরেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় এবং শহর থেকেই তা অন্য অঞ্চলে প্রযুক্ত হয়। অনেক সময় কিছু শহর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে। সেই প্রভাব ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বিজ্ঞানসংক্রান্ত বা অর্থনৈতিক হতে পারে, তবে অধিকাংশ শহরের একটি সাধারণ ক্ষমতা থাকে।

প্রতিটি শহর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করে। ছোট শহরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিকটবর্তী কৃষিপ্রধান অঞ্চলের ওপর সেই শহরের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। এটিই তখন প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। শহরই

কেনাকাটার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। শহর বিনোদনমূলক ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত পরিষেবা দিয়ে থাকে। সংবাদপত্র শহরে প্রকাশিত হয়। শহরের স্কুলে শিশুরা লেখাপড়া করে। কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা শহরের ব্যাঙ্ক থেকেই করা হয়। সেই অর্থ দিয়ে শহরের দোকান থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা হয়। কৃষি সংক্রান্ত উপদেষ্টার কাছ থেকে তাঁরা নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার শেখেন। এই উপদেষ্টার কর্মস্থল সাধারণত শহরেই হয়।

কোনো একটি স্থানের সঙ্গে শহরের দূরত্বের ওপর শহরের প্রভাব নির্ভর করে। একটি শহরের পরিবর্তে অন্য শহরের প্রভাব পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেশি পড়তে পারে। একটি শহরাঞ্চলের প্রভাব অন্য শহরাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে।

বিভিন্ন পরিষেবা এবং দ্রব্যের সীমারেখা ও শহরের আয়তনের ওপরেও পরিবর্তনশীলতা নির্ভর করে। ছোট শহর পাইকারি ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও গণমাধ্যম বা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা ছোট শহরের পক্ষে অসম্ভব। নগর মূলত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে 'অতিনগর' জাতীয় কোনো স্থান পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আধুনিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণ সমভাবে জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

৫৯.৬.৫ উপনগরীর গুরুত্ব

যাঁরা নিয়মিত শহরের কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করেন, শিল্পনগরীর প্রান্তসীমায় তাঁদের বাসস্থান বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠে। বলা যায়, এই অঞ্চলগুলিতে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনযাত্রা গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিবেশী ও বন্ধুদের মধ্যে পরিবারের মতো সম্পর্ক থাকে।

সাবার্ব বা Suburb (বাংলা উপনগরী) কথাটি "সাব" বলে একটি ল্যাটিন শব্দ (যার বাংলা অর্থ উপ) এবং "আব" (বাংলায় নগরী) থেকে এসেছে। এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় শহরের নীচে বা উপকণ্ঠে। এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ উপনগরীই গঠিত হয় ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে। জীবিকা, বিনোদন এবং জল সরবরাহের ক্ষেত্রে উপনগরী সম্পূর্ণভাবে নগরীর উপর নির্ভরশীল।

সাধারণত নগরের নিকটবর্তী স্থানকে নিয়ে উপনগরী গঠিত হয়। সেন্সাস অনুযায়ী বলা যায়, মহানগরীর অন্তর্গত যেসব অঞ্চল মূল শহরের মধ্যে পড়ে না, সেইসব অঞ্চলকে উপনগরী বলা হয়। মূলত তিনটি সামাজিক কারণ নগর আর উপনগরীর মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছে। প্রথমত, শহরের তুলনায় উপনগরীর জনঘনত্ব কম হয়। দ্বিতীয়ত, উপনগরীতে ব্যক্তিগত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে। তৃতীয়ত, উপনগরীর লোকবসতি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও তার মধ্যে ঐক্যের অস্তিত্ব থাকে যা উপনগরীকে বিশিষ্টতা দেয়। এই ঐক্যের অনুভব কিন্তু শহরে অনুপস্থিত। গ্রামের সঙ্গে উপনগরীর দুটি পার্থক্য আছে—(ক) উপনগরীর অধিকাংশ বাসিন্দাই নাগরিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। (খ) আঞ্চলিক সরকার জরুরি পরিষেবা যেমন, জলসরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী ও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা প্রদান করে। গ্রামে অধিকাংশ অধিবাসীরা কৃষি ও কৃষিসংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত।

অর্থনৈতিক মূল্যবোধের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ি ও জমির মালিকানা বহুদিন ধরেই মানুষের কাছে গুরুত্ব পেয়ে আসছে। উপনগরী মানুষের এই স্বপ্ন পূর্ণ করে। কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিরা উন্নত উপনগরীর

অবাস্তব সুবিধার মূল্য দিতে পারে। শহর, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্রিয়াস্থল। গ্রাম থেকে শহরের দিকে যাঁরা যান, তাঁদের অধিকাংশই খুব দরিদ্র। ধনী ব্যক্তিরা আবার নগর থেকে উপনগরীতে গমন করেন। বর্তমান জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতার প্রকৃতি এরকম।

উপনগরী নিয়ে বহু গবেষণা করা হয়েছে। অনেকে এই অঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন, একঘেয়ে এবং নগরে বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলিকে অতিকথন করে থাকেন। কিন্তু এর মধ্যে একটি সত্যতা আছে। সাধারণত কৃষিপ্রধান অঞ্চলে উপনগরী গড়ে ওঠে। এখানকার বাসস্থানগুলো একই ধরনের কাঠামো, দাম এবং আয়তন বিশিষ্ট হয়। স্কুল, কর্মস্থলে, দোকানে এবং এধরনের ক্ষেত্রে সমান প্রবেশাধিকার থাকে। অনেক সময় তাদের একটি নির্দিষ্ট সংগঠন থাকে। এটি কিছুসংখ্যক মানুষকেই আবেদন করে থাকে। উপনগরীর অধিবাসীরা অধিকাংশই একধরনের জীবিকা, রুচি, সামাজিক আচরণ ও পরিবার গঠনে অভ্যস্ত।

এই একধরনের বৈশিষ্ট্য থেকে এখানে স্থায়িত্বের বোধ গড়ে ওঠে। এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যরা বাস করতে এলে তারা সমাদর পায় না। তারা নিজেরাও স্বাভাবিক থাকতে পারে না। বৃদ্ধ দম্পতিরা ছোট বাচ্চাদের মধ্যে থাকতে চান না। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রমিকেরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। যেসব মানুষ কোনো দিক থেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা, তারা সেই প্রতিবেশিত্বে থাকা পছন্দ করে না।

উপনগরীর মধ্যে নগরীর সব বৈশিষ্ট্য থাকে। কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র এবং বস্তি অঞ্চল নগরীতে থাকলেও উপনগরীতে থাকে না। প্রতিটি উপনগরীতেই বিশেষীকরণ করা হয়, এগুলি অন্য অঞ্চলের তুলনায় কিছুটা বিচ্ছিন্ন থাকে। উপনগরীর সরল সামাজিক পরিকাঠামো নাগরিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে বৈচিত্র্য কম।

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস সবসময় উপনগরীতে পাওয়া যায় না। তার জন্য একাধিক উপনগরী বা একটি নগরের ওপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমানে উপনগরী শব্দটি বড় শহরের সংযোগকারী এলাকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৫৯.৭ সারাংশ

এই এককে আমরা নগরের সামাজিক কাঠামো আলোচনা করেছি। এই আলোচনা থেকে আমরা নগর জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পেরেছি। ভারতীয় সমাজজীবনে যৌথ পরিবারের উপস্থিতি দেখা যায়। কিন্তু নগরায়ণের ফলে ভারতীয় সমাজে পরিবারের আকারে পরিবর্তন আসে। যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার দেখতে পাওয়া যায়। নগরায়ণের মাধ্যমে শহুরে জীবনে নানা পরিবর্তন এলেও পরিবার, বিবাহ, জ্ঞাতিত্ব, বর্ণ ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব লক্ষণীয়। তারপর আমরা আলোচনা করেছি, নগর রাজনীতি এবং নগরের সামাজিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত নানা সামাজিক বিষয়সমূহ।

এরপরে আমরা আলোচনা করেছি নগরায়ণ। নগরায়ণ বলতে গ্রামাঞ্চল থেকে শহর এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে মানুষের প্রসারণকে বলা হয়। জন্মহার, মৃত্যুহার এবং প্রসারণের হারে পরিবর্তনই নগরায়ণের প্রধান কারণ। নগরায়ণের হার পৃথিবীর সর্বত্র সমান হয় না। শহর সংক্রান্ত আলোচনায় গুরুত্ব পান আরনেস্ট বার্জেস এই লুইস হুরথ। শিকাগো স্কুলকে অনুসরণ করে বলা যায় এই সংক্রান্ত দুটি ধারণা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল

নগরসংক্রান্ত আলোচনায় পরিবেশগত মত, অন্যটি হল নাগরিক জীবনের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ নাগরিকত্বের ধারণা। ম্যাক্স ওয়েবারের নৈর্ব্যক্তিক নাগরিক জীবনের ধারণার সঙ্গে হুরথ-এর ধারণার বেশ মিল আছে।

আধুনিক ভারতের সামাজিক অর্থনীতি বেশকিছুটা প্রভাবিত হয় গ্রামাঞ্চলে নগরায়ণের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অঞ্চলগুলিতে গ্রাম ও শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি মিলেমিশে গেছে। তাই শহরজীবনের প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক দক্ষতা এখানে বর্তমান। এই ধরনের সম্প্রদায় ছোট কৃষিনির্ভর শহর আর আধা গ্রামাঞ্চলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায় গ্রামাঞ্চলের নগরায়ণের ধারণাটি পরিবেশবিদ্যা থেকে গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে উপনগরীর গুরুত্বও কম নয়। উপনগরীর মধ্যে নগরের সব বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান।

৫৯.৯ অনুশীলনী

(১) নগরীয় সামাজিক কাঠামো কী ধরনের হয়ে থাকে?

(২) নাগরিক জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

(৩) নগরজীবনে বিবাহ, পরিবার ও জ্ঞাতিত্বের প্রভাব আছে কী? আপনার উত্তরে স্বপক্ষে যুক্তি দেখান।

(৪) নগর রাজনীতির রূপ কী?

(৫) আধুনিক নাগরিক জীবন নিয়ে হুরথ-এর তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

(৬) নগরজীবনের আলোচনায় পরিবেশবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

(৭) টীকা লিখুন : (১) গ্রামাঞ্চলের নগরায়ণ; (২) শহরের প্রাধান্য এবং (৩) উপনগরীর গুরুত্ব।

(৮) গ্রামাঞ্চল নগরায়ণ (Rurbanization)-এর আলোচনায় ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়-এর তত্ত্বটি ব্যাখা করুন।

৫৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Beleille, A., *Caste, Class and Power*, University of California Press : Berkeley, 1971.

Desia, A. R., *Rural Sociology in India*, Popular Prakashan : Bombay, 1987.

Ghyrye, G. S., *Cities and Civilization*, Popular Prakashan, Bombay, 1962.

Breese, G. I., *Urbanization in newly developing countries*, Prentice-Hall.

Wirth, L., *Urbanism as a way of life*, American Journal of Sociology, vol. 44.

Ghurye, G. S., *Anatomy of Rurban Community*, Popular Prakashan, Bombay, 1963.

Etzioni, A. (ed); *Complex Urbanisation*, Halt, 1967.

একক ৬০ ❑ নগরের শ্রেণিকাঠামো : শ্রমিকশ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ব্যবসায়ী শ্রেণি এবং এলিট বা অভিজাত শ্রেণি

গঠন

৬০.১ উদ্দেশ্য

৬০.২ প্রস্তাবনা

৬০.৩ স্বাধীন ভারতের শহরে শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাব

৬০.৩.১ নগরের পেশাগত কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন

৬০.৩.২ শহরে শ্রমিকশ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

৬০.৪ মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও প্রকারভেদ

৬০.৪.১ ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্বন্ধ বি. বি. মিশ্রর মতবাদ বা ধারণা

৬০.৪.২ গোষ্ঠীসমূহ যাদের নিয়ে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত হয়

৬০.৪.৩ মধ্যবিত্ত শ্রেরি প্রকারভেদ

৬০.৪.৪ পুরাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি

৬০.৪.৫ নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি

৬০.৪.৬ অন্য শ্রেণির সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্পর্ক

৬০.৪.৭ সামাজিক পরিবর্তনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা

৬০.৫ ব্যবসায়ী শ্রেণির ধারণা ও কার্যাবলী

৬০.৫.১ ভারতে ব্যবসায়ী শ্রেণির উদ্ভবের ইতিহাস

৬০.৫.২ ভারতের ব্যবসায়ীদের শ্রেণিচরিত্র

৬০.৬ এলিট বা অভিজাত শ্রেণি : ধারণা ও প্রকারভেদ

৬০.৬.১ ভারতের অভিজাত শ্রেণি

৬০.৬.২ রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণি

৬০.৬.৩ প্রশাসনিক অভিজাত শ্রেণি

৬০.৬.৪ বুদ্ধিজীবী অভিজাত শ্রেণি

৬০.৬.৫ ব্যবসায়ী অভিজাত শ্রেণি

৬০.৬.৬ অভিজাত শ্রেণি, অসমতা এবং গণতন্ত্র

৬০.৭ সারাংশ

৬০.৮ অনুশীলনী

৬০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬০.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- স্বাধীন ভারতে শ্রমিকশ্রেণির কীভাবে উদ্ভব হয়,
- শহরের শ্রমিকশ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য,
- মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে ধারণা,
- পুরাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য,
- অন্য শ্রেণির সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্পর্ক,
- সামাজিক পরিবর্তনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা,
- নগরের শ্রেণিকাঠামোতে অবস্থানকারী ব্যবসায়ী শ্রেণির ধারণা ও কার্যাবলী,
- ভারতের সামাজিক চিত্রে অভিজাত শ্রেণির উপস্থিতি,
- অভিজাত শ্রেণির প্রকারভেদ,
- সমাজে অভিজাত শ্রেণির উপস্থিতি অসমতার কারণ কিনা।

৬০.২ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে আমরা নগরায়ণ এবং নগরায়ণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। এই এককে আমরা নগরের সামাজিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করব। নগরায়ণের ফলে শহরের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নানা পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। নানা শ্রেণির উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে শ্রমিকশ্রেণি অন্যতম। আধুনিক অর্থে ভারতের শহরে শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভব হয় ব্রিটিশ শাসনের ফলে। ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক নীতি ভারতের কুটিরশিল্পকে নষ্ট করে দেয়। শিল্পী ও কারিগর কর্মহীন হয়ে পড়ায় তারা নতুন কাজের সন্ধানে শহরের দিকে আসতে শুরু করে। শহরে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন-এর ফলে শ্রমিকগোষ্ঠী একটি শ্রেণীতে পরিণত হয়।

অন্যদিকে নগরায়ণের ফলে শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থান হতে থাকে। তৈরি হতে থাকে কর্মজীবী-পেশাজীবী গোষ্ঠী। শহরে অধিকাংশ জনসাধারণ, শিক্ষাগত, প্রযুক্তিগত, আমলাতন্ত্রে, বিজ্ঞান গবেষণায়, আইন ব্যবসায়, ব্যবসা-বাণিজ্য নিযুক্ত হয়। এইসকল কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যে-কোনো উন্নত শিল্পায়ন সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতের মতো দ্রুত শিল্পায়ন দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও দ্রুত বিস্তার একটি সামাজিক ঘটনা। সমাজের সর্বক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভাব লক্ষণীয়। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি নগরজীবনে সামাজিক পরিবর্তন-এর ধারক ও বাহক। তবে নগরায়ণ হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিণতি। ব্যবসায়ী শ্রেণি শহরে বা নগরের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর পরিচায়ক। অভিজাত শ্রেণী সমাজ পরিচালক গোষ্ঠী। এই এককে এইসকল শ্রেণির সমাজে উপস্থিতির ফলাফল আলোচনা করব।

৬০.৩ স্বাধীন ভারতের শহরে শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাব

একক ৫৮-তে আমরা জানতে নগরায়ণের বিভিন্ন রূপ আলোচনা করেছি। নগরায়ণ বলতে আমরা জেনেছি যে গ্রাম থেকে কৃষিনির্ভর লোকেরা শহরের দিকে অকৃষি পেশায় নিযুক্ত হওয়ার জন্য আগমন করে। যে শহরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বয়ংপূর্ণ, সেই শহরগুলিতে আগমনের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় শহর বা নগরগুলি বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর কেন্দ্রে পরিণত হয়। গ্রামের লোকেদের নানাভাবে আকর্ষণ করে থাকে। গ্রামের দারিদ্র্য, অনুন্নয়নমূলক অর্থনীতি এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটিরশিল্প নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় Push factor হিসেবে কাজ করে থাকে। অন্যদিকে শহরের নানা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, চমক লাগানো আমোদ-প্রমোদে ভরা শহরের জীবন গ্রামের লোকেদের শহরমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে Pull factor-এর কাজ করে থাকে। সুতরাং এই Push and Pull factor ভারতের নগরায়ণে যেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে, তেমনি স্বাধীন ভারতের শহরে শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাবে উল্লেখযোগ্য অবদানও আছে। শহরে শ্রমিকশ্রেণি তৈরি করার ক্ষেত্রে এই দুই উপাদান একককভাবে কাজ করে না। দুটি যৌথভাবে এই শ্রেণি তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ভারতের শহরে শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাব হল তিনটি কারণে—(১) ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা; (২) শিল্পায়ন এবং (৩) নগরায়ণ।

(১) ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা : শহরে শ্রমিকশ্রেণি উদ্ভূত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের দরুন। ভারতে সেই সময় ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ফলে ভারতের উপর তার প্রভাব পড়ে। ঔপনিবেশিক শাসকরা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা ভারতকে নানাভাবে শোষণ করতে থাকে। জাহাজ বোঝাই করে এই সম্পদ ব্রিটেনে চালান দেওয়া হত। সেখানকার কলকারখানায় উৎপাদিত হওয়া উপাদানগুলি ভারতের বাজারে অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি হত। প্রাকৃতিক সম্পদের চালান এবং উৎপাদিত দ্রব্য ভারতের বাজারে বিক্রি—এদুটোর কোনোক্ষেত্রেই ভারতকে কোন আর্থিকমূল্য দেওয়া হত না। ফলে দু'রকমভাবে শোষিত হওয়ায় ভারতের কুটিরশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। স্বনির্ভর গ্রামগুলি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। কারিগর এবং শিল্পীরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। গ্রামের অনিশ্চিত অর্থনীতি ও দারিদ্র্যের কবল থেকে রক্ষা পেতে কুটিরশিল্পের কারিগররা শহরমুখো হতে থাকে। ব্রিটিশ শাসকরা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। সস্তা শ্রমকে তারা শিল্প ও বাণিজ্যিক ফসল চাষের কাজে ব্যবহার করে। ফলে ভারতীয় সমাজে উদ্ভূত হয় এক নতুন শ্রেণি—শ্রমিকশ্রেণি।

(২) শিল্পায়ন : ভারতের শিল্পায়ন বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটে থাকে। শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে অংশগ্রহণের জনসংখ্যাও ক্রমবর্ধমান হতে থাকে।

ভারতে কলকারখানা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫০-১৮৭০-এর মধ্যবর্তী সময়ে। ১৮৯০ সালের মধ্যে ভারতে বহুসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায়, ৩,০০,০০০ শ্রমিক কলকারাখানা এবং কয়লা শিল্পে নিযুক্ত হয়। ১৯১৩-১৪ সালে মুম্বাই শহরে সুতিবস্ত্র শিল্পের প্রসার লাভ করায় ১,১৫,০০০ শ্রমিক এই পেশায় নিযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে ১৯১৫ সালে কয়লাশিল্পে ১,২৪,৮৮৪ শ্রমিক নিযুক্ত হয়।

শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ঠিকই তবে শ্রমিকের কাজের সময়, শর্ত ও বেতন ছিল অত্যন্ত শোষণমূলক। বয়স, জাতি (নারী-পুরুষ) ভেদাভেদ না করে শ্রমিকদের কোনো কোনো শিল্পে প্রায় ১৬

ঘণ্টা কাজ করতে হত। সারা সপ্তাহ কাজ করে বেতন পেত অত্যন্ত সামান্য। শ্রমিকদের অসুস্থতায় কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হত না। বরং অসুস্থ শ্রমিককে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করে নতুন শ্রমিক নেওয়া হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে নতুন নতুন শিল্প (লৌহ, পাট, চামড়া, সুতিবস্ত্র, স্টিল) গড়ে উঠতে থাকে। ফলে শ্রমিকের চাহিদাও বাড়তে থাকে। নানা শিল্পে প্রচুর সংখ্যায় শ্রমিক নিযুক্ত হলেও শ্রমিকের কাজের শর্তের কোনো উন্নতি হয়নি।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শিল্পায়নের প্রচেষ্টা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দ্বিতীয় পঞ্চাবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেকারত্ব দূর করার উদ্দেশ্যে শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তবে শিল্পায়নের মাধ্যমে বেকারত্বের আশানুরূপ সমাধান না হলেও শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬০-১৯৬৫ সালে ভারতের কলকারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬.৬% বৃদ্ধি পায়।

(৩) নগরায়ণ : শহরে শ্রমিকশ্রেণির উত্থান নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইউরোপীয় বণিকরা ভারতে অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সনাতনী প্রক্রিয়ায় নগরায়ণ শুরু হয়। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ণ প্রক্রিয়া এক নতুন অধ্যায়ে অনুপ্রবেশ করে। ব্রিটিশদের ভারতে আগমন-এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে নতুন নতুন শহর বা নগরের পত্তন শুরু হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জনগণকে শহরমুখী করতে থাকে। গ্রামে উচ্চবর্ণের লোকেদের অত্যাচার, জমি দখল, তীব্র বর্ণপ্রথা, সামাজিক ব্যাধির প্রকোপ, দুর্ভিক্ষ এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা অভাবের তাড়নোয় দলে দলে লোক শহরের দিকে আসতে শুরু করে। শহরে শিল্পায়নের দরুন শ্রমিকের চাহিদা প্রকট। ফলে গ্রামছাড়া লোকেদের শহরে এসে কলকারখানায় কাজ পেতে অসুবিধা হয় না। পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নও গ্রামের কৃষিনির্ভর লোকেদের শহরে শ্রমিকশ্রেণিতে পরিণত করে। পঞ্চাশ দশকে শহরের বা নগরের পেশাগত কাঠামোতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়।

৬০.৩.১ নগরের পেশাগত কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন

এই এককে আমরা নগরের পেশাগত কাঠামো আলোচনা করব। পূর্বে আমরা দেখেছি যে শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ-এর ফলে শহরের বা নগরের পেশাগত কাঠামোর মধ্যে নানা পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু এই পরিবর্তনের গতি সর্বত্র সমান ছিল না। ১৯০১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে কৃষিশ্রমিক ছিল ৭২%। কৃষিক্ষেত্র হল ভারতের মুখ্য শাখা (primary sector)। কিন্তু সেই সময়ে ১৯০১-১৯৮১ সালে নগর জনসংখ্যা প্রায় ২৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফলে গৌণ শাখায় (secondary sector) শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৯৫১ সালে ১০.৬ শতাংশ এবং ১৯৭১ সালে ১১.২ শতাংশ। ১৯৮১ সালের গণনায় দেখা যায় যে কৃষিক্ষেত্র থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়। শিল্পে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগই এর প্রধান রণ ধরা হয়। তবে শহরের শ্রমিক অধিকাংশই নিযুক্ত হয় উৎপাদনকারী শিল্পসংস্থায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর প্রাধান্য দেওয়াই এই বৃদ্ধির কারণ। ১৯৮৮ সালে সবশুদ্ধ ৪৪০.২৯ লক্ষ শ্রমিক শহরের শিল্পসংস্থায় কাজ করে বলে ধরা হয়। তন্মধ্যে ১৮৩.১৯ লক্ষ সরকারি সংস্থায় এবং ২৫৭.১০ লক্ষ বেসরকারি সংস্থায় নিযুক্ত আছে।

সম্প্রতিকালে ভারতে অন্যক্ষেত্রেও শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অসংগঠিত ক্ষেত্রে (unorganised sector) শ্রমিকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতের শ্রমিক সংখ্যার প্রায় ৪৫% শ্রমিক এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে। অসংগঠিত শিল্পশ্রমিক ছাড়া গৃহনির্মাণ শ্রমিক, ফেরিওয়ালা, সবজি, ফল বিক্রেতা, বাড়ির কাজে নিযুক্ত লোকজন প্রায় সকলেই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

৬০.৩.২ শহরের শ্রমিকশ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ভারতের শহরে শ্রমিকশ্রেণির কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(১) শহরের শ্রমিকশ্রেণির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাদের মধ্যে অধিকাংশ গ্রাম থেকে শহরে অভিপ্রয়াণ (immigration) করেছে। শহরের জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হলেও তারা গ্রামের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে থাকে। সময়-সুযোগ পেলে গ্রামে গিয়ে নিজের ভিটে দেখাসাক্ষাৎ করে থাকে।

(২) যদিও অধিকাংশ শ্রমিক শহরে আসার পর তাদের বংশানুক্রমিক পেশা পরিত্যাগ করে কলকারখানায় নিযুক্ত হয়েছে, কিছুসংখ্যাক শ্রমিক শহরে থেকে তাদের পারিবারিক পেশায় নিযুক্ত আছে। তবে এরা বেশিরভাগই নিম্নবর্ণের লোক, যদিও শহরে বর্ণপ্রথা (caste system) খুব কঠোরভাবে মানা হয় না। শহরে শ্রমিকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ধর্মনিরপেক্ষ।

(৩) শহরে শ্রমিকের এক বিরাট অংশ অশিক্ষিত। আইনগত নিরাপত্তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। ফলে কর্মক্ষেত্রে নানা অবিচারের শিকার হয়ে থাকে।

(৪) শহরে শ্রমিকরা বর্ণ, ধর্ম, প্রদেশ এবং ভাষার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হয়। এই বর্ণ, ধর্ম, প্রদেশ এবং ভাষার ভিন্নতা বড় শহরগুলিতে যত বেশি দেখা যায় ছোট শহরগুলিতে দেখা যায় না।

(৫) শহরগুলিতে শ্রমিকশ্রেণি দু'ভাগে বিভক্ত—সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকের অর্থনৈতিক সমস্যা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকের সমস্যা থেকে অনেক ভিন্ন। সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা বেতন বা মজুরি পেয়ে থাকে সরকারি আইন ১৯৩৬ এবং ১৯৪৮-এর মাধ্যমে। নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে কোনো বিভেদ করা হয় না। সমান কাজের জন্য সমান বেতনের ব্যবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বোনাস-সহ অন্যান্য নানা সুযোগ সংগঠিত ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। অন্যদিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা এইসকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। চাকরির নিরাপত্তা না থাকার দরুন এইসকল শ্রমিক কোনো আইনের আশ্রয় নিতে পারে না।

(৬) শহরে শ্রমিকশ্রেণি উন্নত ধরনের সবরকম যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত থাকে। তুলনামূলকভাবে গ্রাম্য শ্রমিকশ্রেণি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে অপরিচিত থাকায় বিকল্প সুযোগসুবিধা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে। অনাবৃতকরণ (exposure) ঠিকমতো না হওয়ায় নিজেদের দাবি আদায়ে পিছিয়ে থাকে। শহরের শ্রমিকশ্রেণি উন্নত ব্যবস্থার সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করার দাবি আদায় করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করে। প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা আদায় করে।

(৭) অধিকাংশ শহুরে শ্রমিক নিরাপত্তাহীন অবস্থায় কাজ করে থাকে। কলকারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, বাসস্থানের সমস্যা, বস্তি-জীবনযাপন, অসামাজিক কাজকর্ম ইত্যাদি শহরের শ্রমিকশ্রেণির দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। প্রাত্যহিত জীবনের এই সমস্যাজর্জরিত শ্রমিক মনেপ্রাণে অত্যন্ত হীনমন্যতায় ভোগে। জীবনের আনন্দ হারিয়ে যান্ত্রিক মানুষে পরিণত হয়। শহরের শ্রমিকশ্রেণির একটা বড় অংশ হল শিল্প-শ্রমিক। শহরের শ্রমিকদের মধ্যে ভাষা, প্রদেশ বর্ণ, গোত্রের ভিন্নতা থাকলেও একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে একতা দেখতে পাওয়া যায়। সব ভিন্নতা দূর করে শহরের শ্রমিক তাদের মালিকের বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য সংগঠিতভাবে তারা মালিকশ্রেণির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় নানাভাবে। যেমন-বিক্ষোভ, হরতাল, কর্মবিরতি, ধীরগতি, ঘেরাও ইত্যাদি।

একতাবদ্ধভাবে লড়াই করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সফল হয়ে থাকে। গ্রাম্য শ্রমিকশ্রেণি এইসকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে।

৬০.৪ মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও প্রকারভেদ

এই একক নগরের বা শহরে শ্রেণিকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করবে—শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। প্রকৃতপক্ষে, শহরে বা নগরে তিনটি শ্রেণি দেখতে পাওয়া যায়;

(১) উচ্চবিত্ত শ্রেণি—যাঁদের হাতে থাকে উৎপাদনের স্বত্ব।

(২) নিম্নবিত্ত শ্রেণি—যারা দিনমজুরিতে জীবনযাপন করে থাকে; এবং

(৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণি—এই শ্রেণির অবস্থান হল উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যিখানে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি হয়, ভোগ, ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকে বিচার করলে ঐ দুই শ্রেণির মধ্যিখানে বিরাজ করে। এরা হলেন—আমলা, পেশাদার, প্রযুক্তিবিদ এবং পরিচালক গোষ্ঠী। সুতরাং শহরের বা নগরের শ্রেণিকাঠামোর মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক সমাজে সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যবসা-বাণিজ্য, উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার ব্যবহারের মাধ্যমে। এই ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা পরিচালিত হয় জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে। শহরে বা নগরে এই জনগোষ্ঠী তৈরি হয় আমলা, শিক্ষাবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ইত্যাদিদের নিয়ে। এইসকল পেশাদার ব্যক্তিসমষ্টিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উন্নতশীল দেশগুলিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য অনস্বীকার্য। উন্নয়নশীল আধুনিক সমাজেও মধ্যবিত্ত শ্রেণি (বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির দরুন) বিরাট অংশ অধিকার করে আছে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। কার্ল মার্ক্স সমাজে দুটি শ্রেণির কথা বলেছেন : (১) ধনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া শ্রেণি; (২) সর্বহারা বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাঁর মতে শ্রেণিসংগ্রাম ঘটে থাকে এই দুই শ্রেণির মধ্যে। টি বি. বটোমোর সমাজে চারটি শ্রেণির উল্লেখ করেন : (১) উচ্চশ্রেণি (যাঁদের হাতে উপাদানের স্বত্ব থাকে); (২) মধ্যবিত্ত শ্রেণি (পেশাদারি এবং পরিচালক গোষ্ঠী); (৩) শ্রমিকশ্রেণি (এখানে শিল্পশ্রমিককেই বোঝানো হয়েছে) এবং (৪) কৃষকশ্রেণি।

জি. ডি. এইচ. কোল (G.D.H. Cole) মার্ক্স-এর শ্রেণিবিভাগকে তীব্র সমালোচনা করেন। কোল মনে করেন মার্ক্স সর্বহারা শ্রেণির সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে একত্র করে ফেলেছেন। এটা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁর মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয় শিক্ষা, কারিগরি বিদ্যা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে এরা হলেন প্রশাসক, ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ইত্যাদি। প্রায় সকল সমাজবিজ্ঞানীরা একমত যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির উৎপত্তি হয় শিল্পায়নের ফলে। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ওয়ারনার (Warner) ছয় রকমের মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথা বলেন :

(১) উচ্চবিত্ত শ্রেণি (The upper class); এঁরা ধনী এবং পারিবারিক আভিজাত্যের প্রেক্ষাপট আছে; (২) নিম্ন উচ্চবিত্ত শ্রেণি (The lower upper class); এঁরা ধনী কিন্তু কোনো আভিজাত্যের প্রেক্ষাপট নেই; (৩) উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি (The upper middle class); এঁরা প্রধানত পেশাদারি ব্যক্তি; যেমন, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী; (৪) নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি (The lower middle class); এঁরা হলেন ব্যাঙ্ক কর্মচারী, করণিক ইত্যাদি; (৫) উচ্চ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি (The upper lower middle class); এরা হল

কলকারখানার কর্মচারী (বেতন ও বোনাস ভোগ); এবং (৬) নিম্ননিম্ন শ্রেণি (The lower class); এরা হল সমাজে দরিদ্র, হরিজন অচ্ছুতশ্রেণি।

তবে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে সকল সমাজে উপরি উল্লেখিত সকল রকম মধ্যবিত্ত শ্রেণি দেখতে পাওয়া যায় না। সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন রকমের মধ্যবিত্ত শ্রেণি দেখতে পাওয়া যায়।

৬০.৪.১ ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্বন্ধে বি. বি. মিশ্রর মতবাদ বা ধারণা

এই পর্বে আমরা ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও প্রকারভেদ আলোচনা করব। বি. বি. মিশ্রর মতে ব্রিটিশরা ভারতে আসার বহু পূর্বে ভারতের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। তবে ভারতের বর্ণপ্রথা (caste system) এবং আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারিতার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থায় খুব সক্রিয় হতে পারেনি। বর্ণভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব দেখা যায়। অর্থাৎ যে যে বর্ণে বা জাতিতে অন্তর্ভুক্ত সে সেই বর্ণের মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ব্রিটিশরা ভারতে এসে নতুন সরকার গঠন করল। ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা তৈরি করল। প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করল। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত ভারতীয়রা ব্রিটিশদের প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করতে পারবে। মেক্‌লেকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, ব্রিটিশ-শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা রঙে ও রক্তে ভারতীয়, সংস্কৃতি, রুচি, বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ। এইভাবে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক এবং শিক্ষানীতি ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করে। তারা ব্রিটিশদের অনুকরণকারী, কিন্তু নতুন মূল্যবোধের স্রষ্টা নয়।

৬০.৪.২ গোষ্ঠীসমূহ যাদের নিয়ে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়

বি. বি. মিশ্রর মতে, শিক্ষা এবং কারিগরি বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলির মতো ভারতের শহরগুলিতে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মতে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত হয় নিম্নলিখিত গোষ্ঠীসমূহ নিয়ে;

(১) ব্যবসায়ী, দালাল এবং যাহা বণিজ্যিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত;

(২) বেতনভোগী নির্বাহক (executives), পরিচালক, পরিদর্শক ইত্যাদি;

(৩) আমরা এবং অন্যান্য সরকারি কর্মচারী;

(৪) পেশাদারি ব্যক্তি যেমন উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, সাংবাদিক, শিল্পী এবং পূজারি;

(৫) সম্পত্তি কেনাবেচাকারী, যৌথ সম্পত্তিস্বত্বাধিকারী, কৃষক ইত্যাদি;

(৬) অবস্থাপন্ন দোকানদার, হোটেল ব্যবসায়ী, ম্যানেজার এবং হিসাব পরীক্ষক;

(৭) বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে ছাত্রবৃন্দ;

(৮) করণিক, সহকারী করণিক এবং অন্যান্য কায়িক পরিশ্রম করে না এই ধরনের শ্রমিক;

(৯) স্কুল শিক্ষক, স্থানীয় স্বায়ত্তসংস্থার কর্মচারীবৃন্দ এবং রাজনৈতিক কর্মী।

ব্রিটিশ শাসনকালে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। স্বাধীনোত্তর সময়ে শিক্ষা, নগরায়ণ এবং শিল্পায়ন ভারতীয় শহরগুলিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটিয়ে থাকে।

৬০.৪.৩ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রকারভেদ

মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিভিন্ন পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৃত্তি থেকে গঠিত হয়। সেই শ্রেণিকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা হয়। এই প্রকারভেদে আয়, মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধার তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়। সামাজিক-অর্থনৈতিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে নিম্নমধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্তে ভাগ করা হয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কাজের ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ভাগ করা হয়। যেমন, ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি, শিল্পভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি, অর্থসংক্রান্ত (financial) মধ্যবিত্ত শ্রেণি, পেশাদারি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইত্যাদি।

৬০.৪.৪ পুরাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি

নগরের শ্রেণিকাঠামোর প্রকৃত পরিচয় জানতে হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর একটি প্রকারভেদ জানা দরকার। এই প্রকারভেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকারভেদ যা নগরের শ্রেণিকাঠামোকে ব্যাখ্যা করে থাকে। এই প্রকারভেদ মার্ক্সীয় তত্ত্বের শ্রেণিসংগ্রাম এবং শ্রেণি-সংঘর্ষের মধ্যে নিহিত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে দুইভাগে ভাগ করা হয় : (১) পুরাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং (২) নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। পুরাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে আছে কুটিরশিল্পে নিযুক্ত ব্যবসায়ী, দোকানদার, কন্ট্রাক্টর, শিল্পী, পেশাদারি ব্যক্তি (ডাক্তার, উকিল, কৃষক) এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি শুধুমাত্র উৎপাদনের উপাদানের মালিক নয়, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। সুতরাং এই শ্রেণি একই সঙ্গে উৎপাদন ও মালিক দুইই হয়ে থাকে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে পুরাতন বলার উদ্দেশ্য হল এই শ্রেণির উৎপত্তি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই পুরাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বর্তমান উন্নয়নের সাথে সাথে নতুন রূপ ধারণ করছে। নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শহরগুলিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নানাভাবে উদ্ভব ও সম্প্রসারণ হতে দেখা যাচ্ছে।

৬০.৪.৫ নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি

আধুনিক সমাজে কারিগরিবিদ্যা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির ফলে ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এক নতুন সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব দেখতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক, পরিচালক, আমলা এবং বিভিন্ন পেশাদারি ব্যক্তিরা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এদের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলা হয়। এদের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলার কারণ হল, এই শ্রেণির সম্প্রতি উদ্ভব হয়েছে এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত ও পারদর্শী।

পুরাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে-এর পার্থক্য অনেক। পুরাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে। কিন্তু নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয় শহরে শিল্পভিত্তিক সমাজে। পূর্বে ধনতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক শ্রেণিকাঠামোটি ছিল পিরামিডের মতো—একটা ছোট ধনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া শ্রেণি, একটা বড় শ্রমিকশ্রেণি এবং একটা মাঝারি আকারের মধ্যবিত্ত শ্রেণি। কিন্তু নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। অত্যন্ত অগ্রসর শিল্পসমাজে এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি শ্রমিকশ্রেণির সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশেও বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। এই শ্রেণি সমাজের প্রায় সর্বস্তরের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞানী যোশীর মতে, স্বাধীনতার পর এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে।

৬০.৪.৬ অন্য শ্রেণির সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্পর্ক

সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয় ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। তাই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজে অর্থনীতি, শিক্ষা, রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। ভারতের নগরীয় সামাজিক কাঠামোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান অত্যন্ত দ্ব্যর্থক। কারণ শহরে শিল্প-সামাজিক জীবনে প্রধানত দুটি শ্রেণি দেখতে পাওয়া যায়—ধনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া শ্রেণি এবং শ্রমিকশ্রেণি। এই দুটি শ্রেণি পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন। বুর্জোয়া শ্রেণি হল শাসকশ্রেণি এবং শ্রমিক হল শাসিত শ্রেণি। এই দুই শ্রেণির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

ধারণাগত দিক থেকে বিচার করলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি আংশিকভাবে শাসকশ্রেণি এবং আংশিকভাবে শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে যুক্ত। উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি (ডাক্তার, আমলা, প্রযুক্তিবিদ্) শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করে থাকে। অন্যদিকে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই দ্বিমুখী ভূমিকা ইতিহাসে বিভিন্ন বিপ্লব, সংঘর্ষে নানা রকমের ভূমিকা নিয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাসকদের সঙ্গে সমঝোতা আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য রক্তারক্তি সংগ্রামে শামিল হয়ে থাকে।

৬০.৪.৭ সামাজিক পরিবর্তনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা

মধ্যবিত্ত শ্রেণি হল শিল্পায়ন-এর সৃষ্টি। এই শ্রেণির উদ্ভব দেশের অর্থনীতি এবং শহুরে সামাজিক কাঠামোতে বিরাট পরিবর্তন এনে থাকে। সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণি শুধুমাত্র সামাজিক পরিবর্তনের দিক নির্ণয় করে না, সামাজিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই শ্রেণি আধুনিকতার ধারক ও বাহক। নতুন নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা এই শ্রেণিরই চিন্তাপ্রসূত। সমাজে দুটি প্রধান শ্রেণির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানের জন্য এই শ্রেণি শ্রেণিসংগ্রাম নিরস্ত করে থাকে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবদান অনস্বীকার্য। প্রচারমাধ্যমগুলি কাজে লাগিয়ে এই শ্রেণি সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

সম্প্রতিকালে দেখা যায় যে ভারতের অধিকাংশ নগরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে অভিজাত শ্রেণি হিসাবেও গণ্য করা হয়।

৬০.৫ ব্যবসায়ী শ্রেণির ধারণা ও কার্যাবলী

আমরা বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে থাকি। এই জিনিসপত্রের অধিকাংশই হল শিল্প উৎপাদন। যে-কোনো জিনিস উৎপাদন করতে হলে প্রয়োজন মূলধন, শ্রম ও যন্ত্রপাতি। কিন্তু উৎপাদনের উপাদান থাকলেই যে উৎপাদন হয় এই ধারণা ভুল। কারণ উপাদানগুলোকে যথাযথ প্রয়োগ করা দরকার। ব্যবসায়ী শ্রেণি যার অন্য নাম শিল্প উদ্যোক্তা (entrepreneur) কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করে এই উপাদানগুলি

যথাযথ প্রয়োগ এবং ব্যবহার করে উৎপাদন করে থাকেন। উৎপাদিত দ্রব্যগুলিকে ব্যবহারকারীদের কাছে ঠিক সময়ে যথাযথ মূল্যে পৌঁছে দেওয়াও এঁদের কাজ। ব্যবসায়ী বা শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল অত্যধিক লাভ আদায় করা। তাই তাঁরা ব্যবসায়ে ঝুঁকি নেয় এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে থাকেন। অন্যার্থে ব্যবসায়ী শ্রেণি হল শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। ফলে উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায়ী শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষণীয়। এদের উদ্ভব, কার্যকলাপ এবং অবস্থান নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে থাকে।

শিল্প উদ্যোগ বা ব্যবসা অতি জটিল কাজ। উদ্যোক্তাকে ব্যবসা শুরু, সংগঠন পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এই সকল কাজের মধ্যে সকল সময় অনিশ্চয়তা থাকে। লাভ বা মুনাফা প্রধান উদ্দেশ্য থাকায় ব্যবসায়ী বা শিল্প উদ্যেক্তাকে নতুন নতুন উৎপাদন, পুরোনো উৎপাদককে নতুন পদ্ধতিতে উৎপাদন অথবা নতুন পণ্য বা পদ্ধতির কথা ভাবতে হয়। এক অর্থে ব্যবসায়ী শ্রেণি হল সৃষ্টিকর্তা।

ব্যবসায়ী শ্রেণি প্রধানত চার ধরনের কাজ করে থাকে; (১) মূলধন জোগাড় করা; (২) বাজার পর্যালোচনা করা (survey); (৩) উৎপাদন কার্যাবলীকে তদারকি ও সংযোজন করা এবং (৪) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া। উন্নতশীল দেশগুলিতে উপরোক্ত কাজগুলি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে ব্যবসায়ী এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। ফলে শিল্প উদ্যোগ একটি জটিল কাজ।

৬০.৫.১ ভারতে ব্যবসায়ী শ্রেণির উদ্ভবের ইতিহাস

ভারতে আধুনিক শিল্প উৎপাদনের ইতিহাস হল সাম্প্রতিককালের। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ছোট আকারে শিল্প উৎপাদন শুরু হয় এবং স্বাধীনতার পর এর গতি অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরম্পরাগত শিল্প উৎপাদন প্রায় সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়। বেনারসি সিল্ক, কাশ্মীরে উলের শাল, জৌনপুরে কার্টের শিল্প হল ভারতের পরম্পরাগত শিল্প উৎপাদনের নমুনা। তবে পরম্পরাগত শিল্প উৎপাদন সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও আধুনিক শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তার প্রধান কারণ ছিল ব্রিটিশদের অপশাসন। ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ভারতের কুটিরশিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়। ভারত থেকে কাঁচামাল নিজের দেশে পাচার করে শিল্প উৎপাদন বাড়াতে থাকে এবং উৎপাদিত দ্রব্য ভারতের বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দেয়। ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতার পর দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করার জন্য ভারতীয় শাসকবৃন্দ শিল্পায়নের কথা ভাবতে থাকে। সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতের অর্থনীতি গড়ে তোলার কথা চিন্তা করা হয়। নতুন অর্থনৈতিক ঔরসে জন্ম নেয় নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণি বা শিল্প উদ্যোক্তাগণ। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে ব্যবসায়ী শ্রেণিকাঠামো ছিল এইরূপ :

(১) সামন্তপ্রভু বা জমিদার শ্রেণি যারা ব্রিটিশদের নানারকম কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবসা করতে; (২) বর্ণভিত্তিক ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, যেমন, তাঁতি, কুমোর, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, কামার এবং (৩) নিম্নবর্ণভিত্তিক ব্যবসায়ী শ্রেণি যারা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে ভারতে ব্যবসায়ী শ্রেণিতে পার্সী, গুজরাটী এবং মারোয়াড়ীর প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই তিনটি বর্ণের লোকেরা ছিল প্রধানত দালাল বা দোকানদার ব্যবসায়ী (traders)। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে এদের কোন যোগাযোগ ছিল না।

উৎপাদক ছিল নিম্নবর্গের লোকেরা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদিত দ্রব্যের মালিকানা থাকত সামন্ত প্রভু বা ধনী জমিদারদের হাতে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তাঁরা অভিজাত ব্যবসায়ী বা শিল্প উদ্যোক্তা (entreprenure) হিসাবে চিহ্নিত হয়।

৬০.৫.২ ভারতের ব্যবসায়ীদের শ্রেণিচরিত্র

ব্যবসায়ী শ্রেণি বা শিল্প উদ্যোক্তারা সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে থাকেন। এক কথায় এঁরা হলেন বুর্জোয়া শ্রেণি যাদের হাতে উৎপাদনের উপকরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে। এরা শিল্পশ্রমিক নিয়োগ কর্তা।

ভারতের ব্যবসায়ীদের শ্রেণিচরিত্র অনুধাবন করতে হলে ভারতীয় অর্থনীতির পরিকাঠামো সম্বন্ধে জানা দরকার। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতীয় অর্থনীতি ছিল উপনিবেশীয়। ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা ভারতবর্ষ থেকে কাঁচামাল ইংল্যান্ডে সরবরাহ করা এবং ভারতের কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা ভারতবর্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি করেছিল। ভারতের দেশীয় আমদানি ও রপ্তানিকারক গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী, দালাল, জমি-প্রভুদের সঙ্গে নিয়েছিল। এই সকল শ্রেণি ছিল সেই সময়ের ভারতের ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠী। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়ী শ্রেণির চরিত্রবদল হতে থাকে। সুদখোর দালালরা তৈরি জিনিস বিক্রেতা থেকে শিল্পবণিকে পরিণত হতে থাকে। তবে লেনদেন (trading) ব্যবসায়ে মুনাফা বেশি হওয়ায় অধিকাংশ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। উদ্‌বৃত্ত মুনাফা শিল্পায়নের মূলধন হিসাবে কাজে লাগাত। ১৯৪৯ সালে ভেঙ্কটসুব্বাইয়া বলেন যে স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে ভারতের অধিকাংশ ব্যবসায়ী লেনদেন (trading) ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকত।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারত সরকার জাতীয় অর্থনীতি উন্নতিকল্পে সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করায় ভারতের নগরায়ণ দ্রুত হতে থাকে এবং ব্যবসায়ী শ্রেণির চরিত্রবদল হতে থাকে। সুপরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্যে ছিল শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং কুটিরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা। ফলে নতুন নতুন উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রচলন শুধু হয়। নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণি তৈরি হয়। পেশাগত দক্ষতা ও বিদ্যা ব্যবহারকারীরা নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণি তৈরি করে। নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা (ব্যাঙ্ক, বাজার, ক্রেতা ইত্যাদি) সহজলভ্য হওয়ার দরুন এই ব্যবসায়ী শ্রেণি নগর বা শহরগুলিতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। নিজেদের সংস্থা (association) তৈরি করে সরকারকে নতুন সুবিধা আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ভারতের উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলন থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী শ্রেণির স্বার্থ প্রায় খোলাখুলিভাবে সরকার দ্বারা-লালন-পালন করা হয়। এই নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণির মধ্যে পেশাদারি, শিক্ষিত যুবক এবং যুবতীরাও আছেন।

৬০.৬ এলিট বা অভিজাত শ্রেণি : ধারণা ও প্রকারভেদ

নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় মহানগরে আরও একটি শ্রেণি বিশেষভাবে লক্ষণীয়—এলিট বা অভিজাত শ্রেণি। প্রত্যেক সমাজে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে এই শ্রেণি তৈরি হয়। এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল : সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থেকে বুদ্ধির জোরে শিক্ষা, পেশাগত দক্ষতা কিংবা উৎপাদনের উপকরণ

নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার দ্বারা রাজনীতি, প্রশাসন এবং অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দখল করে থাকে। এরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা—দুইই ভোগ করে থাকেন, সমাজের প্রতি নির্ণয় করেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণ করেন, সুবিধাভোগী মূল্যবোধের ধারক ও বাহক।

ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'এলিট' বা 'অভিজাত' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'eligere' থেকে, যার অর্থ হল choose বা select। সত্যি করে বলতে গেলে 'এলিট' শব্দটি ফরাসি শব্দ বা ইংরেজি এবং পরবর্তীকালে জার্মান ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। খ্রিস্টের পরবর্তী পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রইসর্ট (Froissart) প্রথম এলিট শব্দটির সংজ্ঞা দেন 'The best of the best'। ইংরেজ কবি বাইরন প্রথম 'ডন জুয়ান' কাব্যগ্রন্থে এলিট শব্দটি ব্যবহার করেন।

নগরায়ণের ফলে মহানগরগুলিতে যে সকল শ্রেণি প্রাধান্য লাভ করে তার মধ্যে অভিজাত বা এলিটশ্রেণি অন্যতম। উন্নতশীল ও উন্নয়নশীল সমাজে এই অভিজাত শ্রেণির উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা এবং ক্ষমতা এই তিনটি গুণই অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে জড়িত। মানব সভ্যতার অগ্রগতি, নগরায়ণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ক্রমবর্ধমান ধারার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত শ্রেণির চরিত্র বদল হতে থাকে। প্যারেটো (Pareto) মোস্‌কা (Mosca) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে অভিজাত বা এলিট শ্রেণি সমাজের অসংগঠিত জনসাধারণকে শাসন করে থাকে। অর্থাৎ এলিট বা অভিজাত শ্রেণি হল সমাজের সংগঠিত স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা শাসকের রূপে আবির্ভূত হয়—The ruling class। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করাই এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য।

এলিট বা অভিজাত শ্রেণির নানা প্রকারভেদ দেখা যায়। কিন্তু এদের জীবনযাত্রার আদবকায়দায় কোনো পার্থক্য নেই। এরা সমাজের উচ্চশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নতশীল দেশে দু'ধরনের এলিট বা অভিজাত শ্রেণি দেখতে পাওয়া যায় : (১) প্রশাসনিক বা Governing elites; উদাহরণ—কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী এবং রাজনৈতিক দলের প্রথম সারির সদস্য, (২) অ-প্রশাসনিক বা non-governing elites; উদাহরণ—বিরোধীদলের সদস্য, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী এবং বেসরকারি সংস্থার পরিচালকবৃন্দ।

বটোমোর তাঁর বই 'Elites and Society' -তে পাঁচ ধরনের অভিজাত বা এলিট শ্রেণির কথা বলেন, (১) রাজবংশীয় এলিট বা অভিজাত শ্রেণি বা dynastic elite—ব্রিটিশ শাসনকালে 'রাজা' বা 'মহারাজা'রা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত; (২) মধ্যবিত্ত শ্রেণি—উকিল, ডাক্তার, পেশাদারি শ্রেণি; (৩) বিদ্রোহী বুদ্ধিজীবী, যেমন—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বকারী ব্যক্তিগণ; (৪) উপনিবেশীয় প্রশাসক বা The colonial administrators—ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এবং (৫) উন্নয়নশীল সমাজে জাতীয়তাবাদী নেতাগণ, ট্রেড ইউনিয়ন বা সমাজসংস্কারকগণ অথবা রাজনৈতিক দলের নেতারা।

৬০.৬.১ ভারতের অভিজাত শ্রেণি

নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের পূর্বে ভারতে দু'ধরনের অভিজাত শ্রেণি দেখতে পাওয়া যায়। সামন্তপ্রভুরা এবং রাজবংশীয় অভিজাত ব্যক্তিরা। নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং উপনিবেশীয় শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ—এই তিন অধ্যায়ে ভারতে নতুন নতুন অভিজাত শ্রেণির আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের অভিজাত শ্রেণির আলোচনা প্রসঙ্গে বটোমোর বলেন যে, ভারতের সমাজে রাজনৈতিক নেতারা এবং উচ্চপদস্থ সরকারি

কর্মচারীরা নিঃসন্দেহে অভিজাত শ্রেণির অন্তর্গত। তার মতে, ভারতীয় সমাজে আরও একটি অভিজাত শ্রেণি আছে—বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী।

৬০.৬.২ রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণি

ভারতীয় সমাজে রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণি বা এলিট সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শ্রেণি। এই শ্রেণি ক্ষমতা দখল ও ব্যবহারে পটু। বিশেষ করে জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে গোষ্ঠীশাসনের দিকে অগ্রসর হয়। জনগণের কিছু কিছু দাবি মিটিয়ে জনগণের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি করে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এরা সিদ্ধান্তগ্রহণে প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকে।

৬০.৬.৩ প্রশাসনিক অভিজাত শ্রেণি

প্রশাসনিক অভিজাত শ্রেণি বলতে, ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, আমলাতন্ত্রকে বোঝায়। আধুনিক সমাজে আমলাতন্ত্র উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী অভিজাত শ্রেণি। শাসনক্ষমতা একটানা তাঁদের হাতে থাকায় তাঁরা ক্রমশ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে শক্তিশালী হয় এবং সমস্ত রাজনৈতিক সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার অর্জন করে। দীর্ঘদিন প্রশাসনে থাকার ফলে পরিচালন ব্যবস্থায় দক্ষ হয়ে ওঠে। ফলে, 'রাজনৈতিক প্রভুরা' এইসকল দক্ষ আমলাদের উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক ক্ষমতায় নিশ্চিন্ত থাকে। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণি এবং প্রশাসনিক অভিজাত শ্রেণি দুইই মিলেমিশে শাসক অভিজাত শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৬০.৬.৪ বুদ্ধিজীবী অভিজাত শ্রেণি

সমাজবিজ্ঞানী বটোমোর মনে করেন যে সমস্ত সমাজের একাংশ শিক্ষিত, পেশাদারি, বুদ্ধিজীবী শ্রেণি অধিকার করে থাকে এবং সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। সহজ অর্থে আধুনিক সমাজগুলিতে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা নিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল সমাজগুলিতে এরা বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ধারক ও বাহক।

বুদ্ধিজীবী সংখ্যায় সীমিত, সমাজের নতুন নতুন ধ্যানধারণা তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণি কোনো কোনো দেশে শাসনগোষ্ঠীর রূপ নিয়ে থাকে। ফ্রান্স-এর মতো উন্নতশীল দেশে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সমাজের দুর্নীতির বিরোধিতা করে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছিল। সমাজবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড শীলস্ তাঁর বই Elites in South Asia মন্তব্য করেন যে ভারতের মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি জনগণের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। এই দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শ্রেণির নেতারা প্রায় সকলই বুদ্ধিজীবী শ্রেণি থেকে আগত। তবে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবী শ্রেণির চরিত্রবদল দেখা যায়। নতুন উদ্ভাবিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি হল পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে শিক্ষিত ও প্রভাবিত। আই. পি. দেশাই মনে করেন যে এই নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণি প্রচলিত দেশীয় বিশ্বাস ও ভাবনা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছেন।

৬০.৬.৫ ব্যবসায়ী অভিজাত শ্রেণি

বটোমোর তাঁর বই Elites and Society-তে মন্তব্য করেন যে ব্যবসায়ী অভিজাত শ্রেণি আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। যেহেতু আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য উন্নয়ন জড়িত সেহেতু তাঁদের ভূমিকা লক্ষণীয়। বিশেষ করে, পাশ্চাত্য দেশে এই ব্যবসায়ী শ্রেণি

শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণি হিসাবে পরিণত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতিবিদ্‌দের উল্লেখনীয় ভূমিকা থাকায় এরা কিছু নিষ্প্রভ এবং নির্লিপ্ত। তবে নির্বাচনের পালাবদলের অন্তরালে থেকে বড় বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

৬০.৬.৬ অভিজাত শ্রেণি, অসমতা এবং গণতন্ত্র

কার্ল মার্ক্স দাবি করেন যে, অসমতার নীতির সূত্রপাত হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মালিকানা থেকে— উৎপাদক এবং উৎপাদনের উপায়ের মালিকানায় প্রভেদে। তাই তিনি মনে করেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ হলেই শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে উঠবে। মার্ক্সের এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীরা। রেমণ্ড এ্যারোন স্বীকার করেন যে তাত্ত্বিক দিক থেকে শ্রেণিহীন সমাজ তৈরি করা যায়, তবে কিছু লোকের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হলে ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। তিনি বিকেন্দ্রীকরণের সমর্থনে বলেন।

অনেকে ধারণা করে থাকেন যে, নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভব হয় এবং সমাজে শ্রেণিকরণ বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণির উদ্ভব গণতন্ত্র বিরোধী বা জনগণবিরোধী। এটি সত্য নয়। গণতন্ত্রে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে নগরায়ণের ফলে বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভব সমাজের মূল কাঠামোকে পরিবর্তন করতে পারে না। বরং নগরায়ণের গতি দ্রুত হয় এই বিভিন্ন শ্রেণির মিথস্ক্রিয়ার ফলে।

৬০.৭ সারাংশ

এই এককে আমরা শহরের শ্রমিকশ্রেণির ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব আলোচনা করেছি। শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভবের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি, অবশিল্পায়ন ইত্যাদির ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়। তবে স্বাধীনোত্তর যুগে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ—এই দুইই শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভবেব কারণ বলা হয়। অন্যদিকে বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য ও ব্যবহার মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের কারণ মনে করা হয়। সমাজের দুটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানের দরুন সামাজিক পরিবর্তনে এদের প্রভাব অপরিসীম। প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত হওয়ার দরুন প্রশাসনের এই শ্রেণির প্রভাব লক্ষণীয়।

নগরায়ণের ফলে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নানা পরিবর্তন হয়। প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ভিত্তিতে নগরে বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভব হয়। এই শ্রেণির উদ্ভব নগরায়ণের গতিতে দ্রুত করে থাকে। ব্যবসায়ী শ্রেণি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণি নতুন নতুন চিন্তাভাবনার জন্ম দেয়। এই বিভিন্ন শ্রেণির মিথস্ক্রিয়ায় নগরায়ণ প্রক্রিয়া সজীব ও গতিশীল হয়। পরিশেষে আমরা আলোচনা করেছি, অভিজাত শ্রেণির উদ্ভব সমাজে অসমতা আনে কিনা।

৬০.৮ অনুশীলনী

(১) ভারতের নগরে শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভবের কারণগুলি কী কী?

(২) শহরে শ্রমিকশ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

(৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা কী?

(৪) পুরাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

(৫) সামাজিক পরিবর্তনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা কী?

(৬) সমাজে ব্যবসায়ী শ্রেণির গুরুত্ব কী?

(৭) ভারতে ব্যবসায়ীদের শ্রেণিচরিত্র কী?

(৮) এলিট বা অভিজাত শ্রেণি বলতে কী বোঝায়? এলিট শ্রেণির প্রকারভেদ কী কী?

(৯) টীকা লিখুন : বুদ্ধিজীবী অভিজাত শ্রেণি।

৬০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Sen S., *Working class of India : History of Emergence and Movement 1830-1970*. Calcutta : K. P. Bagchi and Co., 1979
2. Gouldner, A. W., *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class*, London : Mcmillan, 1979.
3. King R. and Raynor, J., *The Middle Class*, London : Longman, 1981.
4. Misra B. B., *The Indian Middle Classes : Their Gorwth in Modern Times*, Delhi : Oxford University Press, 1978.
5. Sailly, P., *Entrepreneurship and Economic Development*, New York : Free Press, 1971.
6. Singer, M., *Entrepreneurship 1 Modernization of Occupational Culture in South Asia*, Durham : Xoo Duke University Press, 1973.
7. Bottomore, T. B., *Sociology as a Social Criticism*, George Allen and Urwin Ltd., London, 1975.
8. Sachchidanandan, S., *The Horizon Elites*, Thomson Press (India) Ltd., Faridabad 1977.

একক ৬১ ❑ নগরায়ণের সমস্যা

গঠন

৬১.১ উদ্দেশ্য

৬১.২ প্রস্তাবনা

৬১.৩ নগরায়ণের সমস্যাসমূহ

 ৬১.৩.১ নগরায়ণের সমস্যাগুলির কারণ

 ৬১.৩.২ সমস্যা সমাধানের উপায়

৬১.৪ সারাংশ

৬১.৫ অনুশীলনী

৬১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৬১.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- নগরায়ণের গতি কোন্‌দিকে,
- নগরায়ণের সমস্যাগুলি কী কী,
- সমস্যাগুলির কারণ কী,
- সমস্যা সমাধানের উপায়গুলি কী কী।

৬১.২ প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ে আমরা নগরায়রের সংজ্ঞা, অর্থ ও বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছি। ভারতে নগরায়ণ শুধু হয় ব্রিটিশ শাসনকালে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও পাশ্চাত্যের প্রভাব নগরায়ণের গতি দ্রুত করতে থাকে। স্বাধীনতার পরে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ প্রায় একই সঙ্গে শুরু হয়। ফলে যে ভারতবর্ষ ছিল গ্রাম প্রধান সেই ভারতবর্ষে ক্রমাগত নতুন নতুন শহরের পত্তন হতে থাকে, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারলাভ করে, নতুন নতুন বাণিজ্য শহর তৈরি হয়, নগরগুলিতে নতুন নতুন সমাজব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় এবং সর্বশেষে নতুন শ্রেণির উৎপত্তি হয়। নগরায়ণ সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি করেছে ঠিকই, কিন্তু নতুন নতুন সমস্যাও তৈরি হয়েছে। এই এককে আমরা সেই সকল সমস্যাগুলি আলোচনা করব।

৬১.৩ নগরায়ণের সমস্যাসমূহ

নগরায়ণ বলতে বোঝানো হয় গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা গমন। এর ফলে শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, এই অবস্থান্তর হল কৃষি নির্ভরশীলতার পরিবর্তে শিল্পনির্ভর জীবনযাত্রাকে

মেনে নেওয়ায়। অ্যান্ডারসনের মতে, এর ফলে গমনোদ্যত মানুষের জীবনযাত্রার বোধের আর বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়। এর ফলে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

বাসস্থানজনিত সমস্যা : বাসস্থানের সমস্যা নাগরিক জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। এই সমস্যা নিয়ে শহরবাসীরা যথেষ্টই বিব্রত হয়ে পড়েন। সম্প্রতি ইউ. এন. আই. রিপোর্টে দেখা গেছে শহরবাসীর মধ্যে অর্ধেক থেকে এক-চতুর্থাংশ মানুষ বস্তি আর অস্থায়ী জায়গায় বাস করেন। অনেক মানুষ তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া দিয়ে বাস করেন। অর্থনীতিমূলক লাভক্ষতির হিসাবের নিরিখে এগিয়ে চলেন। তাই উন্নয়নকামী এবং ঔপনিবেশিকরা দরিদ্র এবং নিম্নবিত্ত মানুষদের পরিবেষ্টন করে থাকে। তার ফলে দরিদ্র মানুষের দুর্গতির শেষ থাকে না। উদ্যোগ নিয়ে যেসব বাড়ি তৈরি হয় সেখানেও কয়েকদিন পর থেকেই সমস্যা শুরু হয়। খারাপ জাতের মালমশলায় বাড়ি তৈরি হয় বলে দেয়ালে ফাটল ধরে যায়, পাইপ ভাঙতে থাকে। তাই খাদ্য আর বস্ত্র সমস্যার পরই এখন বাসস্থানের সমস্যা মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে বলা যায়।

অতি ভিড় আর নৈর্ব্যক্তিকতার সমস্যা : শহরগুলিতে লোকসংখ্যার আধিক্যের জন্য জনঘনত্ব খুব বেশি হয়। এই জনঘনত্বের আধিক্যের জন্যে অধিকাংশ মানুষ একে অপরের অপরিচিত। নাগরিক জীবনের সঙ্গে যত মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ততই কমছে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ঠতা। প্রতিবেশীর সুখদুঃখ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না আজকের নাগরিক মানুষেরা। কিছু কিছু জায়গায় এত বেশি জনসংখ্যা যে একটি ঘরে পাঁচ থেকে ছয় জন পর্যন্ত মানুষ একসঙ্গে বাস করছে। এই জনবিস্ফোরণের ফলাফল মোটেই ভালো হচ্ছে না। অনেক সময় আচরণগত বিচ্যুতি, মানুসিক অসুস্থতা, মাদকাসক্তি এবং রোগের প্রাদুর্ভাব—সবকিছুই এর থেকে হতে দেখা যাচ্ছে। এর আর একটি ফল হল মানুষের অন্যের প্রতি নিয়মাসক্ত ব্যবহার। শহরবাসীরা সাধারণত একে অন্যের কোনও বিষয়ে জড়িত হতে চায় না। দেখা গেছে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে এমনকি হত্যা বা খুন হলেও অন্য লোকেরা সেদিকে দৃকপাত পর্যন্ত করে না।

জল সরবরহা আর পয়ঃপ্রণালীর সমস্যা : অধিকাংশ শহরেই জলের সমস্যা খুব প্রবল। সংযুক্ত করা নালিকার মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়। নলের মধ্যে ফুটো হলে সরবরাহ ব্যাহত হয়। এখনও এমন অনেক শহর আছে যেখানে ভালো জল সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে নলকূপের ওপর নির্ভর করে আছে। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও তথৈবচ। সঠিক জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাযুক্ত শহরের সংখ্যা বেশ কম। জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে গ্রীষ্মকালে জলাশয়গুলি বন্ধ হয়ে পড়ে।

পরিবহন ব্যবস্থাজনিত সমস্যা : সাধারণ মানুষ পরিবহনব্যবস্থার সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। এই পরিবহনব্যবস্থা বিভিন্ন শহরে বেশ হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় আছে। অনেক সময় যানবাহন থেকে পরিবেশ দূষণের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই পরিবেশ দূষণকে রোধ করার ব্যবস্থাও সঠিকভাবে করা যাচ্ছে না। এর থেকে বহুরকম জটিল রোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক শক্তির স্বল্পতা : নাগরিক জীবনে শিল্পনির্ভরতা খুব বেশি। তার জন্য সেখানে কলকারখানা আর যন্ত্রপাতির আধিক্য বেশি। তার থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রচলন বেড়ে চলেছে। একদিকে একের পর এক নতুন কারখানা স্থাপিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমন পুরনো কারখানাগুলিকে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা : গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে পরিবেশ দূষণ বেশ অনেকটাই বেশি। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ এবং অনুন্নত নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য দ্রুত হারে দূষণ সমস্যা শহরগুলোকে ভীষণ সমস্যায় ফেলেছে। শহরের কলকারখানাগুলো থেকে ধোঁয়া আর নির্গত গ্যাস পরিবেশ দূষণকে বাড়িয়ে তুলছে। যানবাহন থেকে পরিবেশ দূষিত হয়ে থাকে।

৬১.৩.১ নগরায়ণের সমস্যাগুলির কারণ

নাগরিক জীবনের এই সমস্যাগুলি ঘটার পেছনে বহুবিধ কারণ আছে। মূল কয়েকটি কারণ নীচে আলোচনা করা হল :

অভিপ্রয়াণ (Migration) : সাধারণ মানুষের ধারণা গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরে কাজকর্মের সুযোগ অনেকটা বেশি। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষ দলে দলে কাজের আশায় শহরে পাড়ি জমায়। কর্মলাভের আশায় দরিদ্র আর নিম্নবিত্ত মানুষ ভিড় জমায় শহরে। অভিজাত আর উচ্চশ্রেণির মানুষেরা আবার শহরের অতি জনসমাগম আর ভিড়ভাট্টা এড়াবার জন্য মফঃস্বল অঞ্চলে বাস করতে বেশি ইচ্ছুক থাকেন। এর ফলে শহরের অর্থনীতিতে একটা প্রভাব পড়ে। ধনী মানুষেরা আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে শহরের চৌহদ্দির বাইরে চলে গেছে। আর দরিদ্র মানুষই তাদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে শহরে বাস করে। তাতে শহরের আর্থিক অবস্থা খারাপই হয় বেশি।

শিল্পের উন্নয়ন : শিল্পের উন্নয়নের হার শহরাঞ্চলের খুব বেশি। এর জন্য অতিরিক্ত জীবিকার উপায় সন্ধান করা শহরের জীবনে সহজ হয়। কিন্তু জনসংখ্যার যে বিপুল অংশ জীবিকার সন্ধানে শহরে আসছে তার মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই খুঁজে পাচ্ছে তাদের কাজ। তাই বেকার সমস্যার যথাযথ সমাধান করার মতো শিল্পের উন্নয়ন এখনও হয়নি।

সরকারের অবহেলা : শাসনতন্ত্রের অব্যবস্থার জন্য শহরবাসীদের বহুরকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি শহরের উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে না। ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি এক্ষেত্রে খুব বেশি হয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কিছু করার মতো ইচ্ছে বা ক্ষমতা কোনোটিই এখানে দেখা যায় না।

ত্রুটিপূর্ণ নাগরিক পরিকল্পনা : শহরাঞ্চলে নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি ক্রমশ মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। এজন্য শাসকগোষ্ঠী, আমলা এবং পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা খুব অসহায় অবস্থার মুখোমুখি হয়ে পড়েছেন। মহানগরগুলিতে পরিকল্পনাহীনতার শহর ও নাগরিক জীবনকে অনেক সমস্যায় ফেলছে।

সুপ্ত আগ্রহসম্পন্ন কিছু শক্তির ক্রিয়াশীলতা : এই ধরনের কিছু শক্তি শহরে ক্রিয়াশীল থাকে। এই শক্তিগুলি সাধারণ মানুষের আগ্রহের বিরুদ্ধে কার্যকরী হয়। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং লাভক্ষতি সংক্রান্ত বিষয়টি সেক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। সাধারণ শহরবাসীরা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে ক্ষমতাবান থাকে না। অভিজাত সম্প্রদায়ই যে-কোনও বিষয়ে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এই ক্ষমতাশালী অভিজাত সম্প্রদায় যেক্ষেত্রে আর্থিক লাভ দেখতে পাবেন সেখানেই তাঁরা অগ্রসর হতে পারেন। আর্থিক লক্ষ্যই তাদের কাছে মূল, অন্যান্য কোনও গুরুত্ব তাদের কাছে থাকে না।

৬১.৩.২ সমস্যা সমাধানের উপায়

নাগরিক সমস্যার সমাধান করার পথও বহুরকম হতে পারে।

(ক) নাগরিক অঞ্চলগুলির সুষ্ঠু উন্নয়ন এবং চাকরি করার সুযোগ তৈরি করার প্রয়োজন আছে। আগামী কুড়ি বছরে শহরাঞ্চলে এধরনের বহু সুযোগ তৈরি করতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে কর্মলাভের সুযোগ সীমিত। তাই গ্রামে অনেক উদ্বৃত্ত শ্রমিক থেকে যায়। এরা শহরে কর্মের আশায় ছুটে আসে। এদের কাজের জন্য সুযোগ শহরে করে দিতে হবে।

(খ) শহর পরিকল্পনায় আঞ্চলিক পরিকল্পনা চিত্র : নগর সংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ শহরকেন্দ্রিক। আমরা সর্বদাই শহর পরিকল্পনার কথা বলি কিন্তু আঞ্চলিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিষয়ে আমরা বেশ উদাসীন বলা যায়। এই কারণে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এজন্য কার্যাবলীর সঠিক বণ্টন হয় না। শহর পরিকল্পনা হল তাৎক্ষণিক; আঞ্চলিক পরিকল্পনা হল স্থায়ী সমাধান।

(গ) অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে শিল্পোদ্যোগ নিতে হবে। শহরাঞ্চলে মূল শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। এর ফলে জনসংখ্যার চাপটা শহরেই বেশি থাকছে। শিল্পগুলি যদি গ্রাম-শহর নির্বিশেষে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তবে অনায়াসে নাগরিক সমস্যার সঠিক সমাধান পাওয়া যাবে।

(ঘ) সাধারণ মানুষ পৌর প্রতিষ্ঠানকে অর্থ দিতে কখনোই অস্বীকার করবে না যদি তারা দেখে সেই অর্থের যথার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। সকলেই জানে শহরগুলির উন্নয়ন খাতে অর্থের অভাব যথেষ্ট। যদি অসৎ কর্মচারীদের শাস্তিবিধান করা যায়, তবে কখনোই সাধারণ মানুষের টাকা দিতে কোনো আপত্তি থাকবে না। শহর তার নিজের উন্নয়ন নিজের অর্থ দিয়ে করতে পারলে কোনো সমস্যা থাকবে না। যদি শহরে কোন নতুন শিল্পস্থাপন করা হয়, তবে তার ওপর উচ্চ হারে কর বসাতে হবে যাতে উদ্বৃত্ত অর্থ স্থানীয় প্রশাসন উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে পারে।

(ঙ) ব্যক্তিগত মালিকানায় উন্নত পরিবহন পরিষেবা গড়ে তুলতে হবে। এতে অবশ্য সরাসরি ব্যবস্থার তুলনায় খরচ সামান্য কিছু বেশি হবে, তবে সার্বিক দিক থেকে এতে শহরের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

(চ) বাড়ি-ঘর সংক্রান্ত পরিকল্পনা সুষ্ঠু হওয়া দরকার। গৃহহীন মানুষের সমস্যা মেটানো সহজ নয়। খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করাও যাবে না। পরিকল্পনা করে বিলাসবহুল বাড়ি অনুমোদন করা বন্ধ করতে হবে। জমি মালিকানা স্বত্ত্বের আইনানুগ পরিদর্শন, জমি ও বাড়ির অধিগ্রহণে ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটিয়া আইন সংশোধন করতে হবে। এর সঙ্গে দরিদ্র আর নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

(ছ) পরিকাঠামোগত বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্থায়ীন স্বায়ত্তশান সরকার এই পরিকাঠামোগত বিকেন্দ্রীয়করণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এর জন্য প্রতিবেশিত ক্রিয়াগোষ্ঠী (neighbourhood) তৈরি করা যেতে পারে। অঞ্চলের অধিবাসী এবং পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিয়ে এই গোষ্ঠী গঠন করা যেতে পারে। এই কেন্দ্রটি প্রতিবেশীদের এবং অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রয়োজনকে ঘিরেই তাদের কাজ চালাবে। অনেক সময় ছোট ছোট উপনিবেশিগুলি শহরে গড়ে তোলে। বাড়ির শুল্ক, সড়ক শুল্ক ইত্যাদি সোজাসুজি সম্প্রদায়কেন্দ্রের (Community Centre) হাতে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শহরের

কার্যাবলীর ওপর এই কেন্দ্রটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে। এই নিয়ন্ত্রণ পৌর প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। তাই প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ সম্প্রদায় নিজেই খরচ করতে পারবে।

তবে বর্তমান প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি মূলত চিন্তিত বাসস্থানজনিত সমস্যা নিয়ে। নাগরিক জীবনের প্রধান সমস্যা যখন এইটিই। আমেরিকার মতো উন্নত দেশে গৃহহীন মানুষের ক্রমবর্ধমান হার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীতপ্রধান অঞ্চলগুলিতে অত্যধিক শৈত্যপ্রবাহে খোলা জায়গায় মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে। গৃহহীনতার সমস্যা কয়েকটি কারণে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। শিল্পপ্রধান দেশে গৃহহীন এবং টেলিফোনবিহীন মানুষ জীবিকার বিষয়ে যোগাযোগ সহজে করতে পারে না। এমনকি এদের মধ্যে অন্যের সহযোগিতা পাওয়াও সহজ হয় না। গৃহহীন মানুষকে সমাজ চিন্তিত করে দেয়। এর ফলে বহুরকম বৈষম্যের মধ্যে থাকে তারা। মানুষ গৃহহীন হলে হোটেল এমনকি দোকানে যথেষ্ট সম্মান তাকে দেওয়া হয় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যেই দেখা গেছে যাহা গৃহহীন, প্রায়ই তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার হয়।

গৃহহীন মহিলাদের সমস্যা কিছুটা আলাদা গৃহহীন পুরুষদের তুলনায়। দেখা গেছে গৃহহীন মহিলারা গৃহহীন পুরুষদের তুলনায় বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়, অসুস্থতাও হয় তাদের বেশি। গৃহহীন মহিলারা পারিবারিক জীবনে গৃহহীন পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

সম্প্রতি, নাগরিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে gentrification কথাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এটিতে বোঝানো হয়, অল্পবিত্তের প্রতিবেশগুলিতে পুনর্বসতি স্থাপন করা হয়। এটির স্থাপন অভিজাত ব্যক্তিরাই করে থাকেন। পরিকল্পনা যাঁরা করতেন তাঁদের কাছেও এই সমস্যার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। অনেক সময় গৃহহীন মানুষরা নিজেরাই এগিয়ে এসেছে।

৬১.৪ সারাংশ

নগরায়ণ ঘটার ফলে শহরাঞ্চলে জনবসতি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। তার থেকে নগরায়ণের সমস্যা জন্ম নেয়। বাসস্থানজনিত সমস্যা, নৈর্ব্যক্তিকতার সমস্যা, জলসরবরাহ সমস্যা, পয়ঃপ্রণালীঘটিত সমস্যা, পরিবহন ও বৈদুতিক শক্তির সমস্যা আর পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যাই নাগরিক জীবনের ভিত্তিকে নড়িয়ে দিতে পারে। আধুনিক সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক, তাই এই সমস্যাগুলি সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করা উচিত। এজন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রগুলিকেও উদ্যোগ নিতে হবে।

৬১.৫ অনুশীলনী

(১) নগরায়ণের সমস্যাগুলি কী কী?

(২) নগরায়ণের সমস্যাগুলি কেন ঘটে?

(৩) নগরায়ণের সমস্যাগুলির সমাধান কীভাবে করা যায়?

(৪) নগরায়ণ মানুষের জীবনে কী কী সমস্যা আনতে পারে? কীভাবে এই সমস্যাগুলিকে সমাধান করা যাবে?

৬১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

Erickson, G., *Urban behaviour*, Mcmıllan.

Rao, M. S. A., *Urban Sociology in India, Census of India, A select bibliography on urban studies*, New Delhi, 1961.

Etzioni, A. (ed.) *Complex Organization*, Helt, 1967.

Breese, G., *Urbanisation in newly developing countries*, Pentice-Hall.

Morris, R. N., *Urban Sociology*, George Allen and Urwin Ltd., London.

ই. এস. ও.—৫

পর্যায় ১৮

একক ৬২ ☐ কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব

গঠন

৬২.১ উদ্দেশ্য

৬২.২ প্রস্তাবনা

৬২.৩ কেন্দ্রীয় স্থান বসতিব্যবস্থা

  ৬২.৩.১ কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের মূল ধারণা

  ৬২.৩.২ কেন্দ্রীয়করণের নীতি

  ৬২.৩.৩ পদানুক্রমের নীতি

৬২.৪ সিদ্ধান্তমূলক ধারণা

  ৬২.৪.১ কেন্দ্রীয় স্থানের ধারণা

  ৬২.৪.২ পরিপূরক অঞ্চলের ধারণা

  ৬২.৪.৩ কেন্দ্রীয় পরিষেবা ও দ্রব্যাদি

  ৬২.৪.৪ দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত স্থানিক দূরত্ব

  ৬২.৪.৫ সূচনা-সীমা

  ৬২.৪.৬ কেন্দ্রিকতার ধারণা

৬২.৫ কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের প্রয়োজনীয় শর্ত

  ৬২.৫.১ বসতির প্রাকৃতিক একরূপত্ব

  ৬২.৫.২ পরিপূরক অঞ্চলের আকৃতি

  ৬২.৫.৩ কেন্দ্রীয় স্থানের সংখ্যা

  ৬২.৫.৪ অনুক্রমিক স্তর

  ৬২.৫.৫ পরিপূরক এলাকার বিন্যাসের ধাঁচ

৬২.৬ ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় স্থানব্যবস্থা

৬২.৭ সারাংশ

৬২.৮ শব্দপঞ্জী ও পরিভাষা

৬২.৯ অনুশীলনী

৫৮.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৬২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল নগরায়ণের বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে একটি বিশেষ তত্ত্বকে উপস্থাপিত করা এবং নগরের বিকাশের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের উপযোগিতা কী—তা জানা। এই এককটির পাঠ শেষ হলে আপনি নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন :

- কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের মৌলিক ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করা।
- এই তত্ত্বের সিদ্ধান্তমূলক ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করা
- এই তত্ত্বের যে প্রয়োজনীয় শর্তগুলি আছে যেমন কেন্দ্রীয় এলাকা, পরিপূরক এলাকা, পদানুক্রমিক স্তর এবং বসতিবিন্যাসের ধাঁচ এগুলির বর্ণনা।
- ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় স্থানব্যবস্থা ব্যাখ্যা করা।

৬২.২ প্রস্তাবনা

নগরের বসতিবিন্যাসের নিরিখে শহরের গঠন ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে দুটি তত্ত্বের কথা বলা হয়। প্রথমটি কার্যকারণ-নীতিনির্ভর তত্ত্ব (Casual theory) আর দ্বিতীয়টি হল আদর্শস্থাপনকারী তত্ত্ব (Normative theory)। প্রথম তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের বসতি-ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণভিত্তিক সাদৃশ্য। এই তত্ত্বের একটি ভাষ্যের প্রবক্তা হচ্ছেন সমাজতত্ত্ববিদথ জে.কে. জিফ্ (G.K. Zipf) এবং তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্ব ক্রম ও আয়তনের নীতি (Rank-size rule) নামে পরিচিত। কার্যকারণ-নীতিনির্ভির তত্ত্বের আরেকটি ভাষ্য হল মার্ক জেফারসন (Mark Jefferson : 1939) ব্যাখ্যা প্রাইমেট সিটি কনসেপ্ট বা আধিপত্যস্থাপনকারী নগরসম্পর্কিত ধারণা। দুটি ভাষ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নগরের বর্তমান বসতিবিন্যাসকে বর্ণনা করা হয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। অপরদিকে, নগরের বসতিবিন্যাসের আদর্শস্থাপনকারী তত্ত্ব বসতির বর্তমান ধাঁচকে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে আগ্রহী নয়, বরং এই তত্ত্ব চায়, বসতির আদর্শ রূপ কী হতে পারে তা সংজ্ঞায়িত করতে। পৃথিবীতে বর্তমানে বিভিন্ন নগরের বসতিবিন্যাসের ধাঁচ কেমন তা বলার থেকে এই তত্ত্ব উপস্থাপন করতে চায় বসতির বিন্যাসের আদর্শ ধাঁচ কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়টি। বসতিবিন্যাসের এই দ্বিতীয় তত্ত্বকে বলা হয় কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব এবং এর প্রবক্তা হচ্ছেন ক্রিস্টেলার (Christaller) আলোচ্য এককে আমরা ক্রিস্টেলার প্রবর্তিত কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের আলোচনা করব।

৬২.৩ কেন্দ্রীয় স্থান বসতিব্যবস্থা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব হচ্ছে নগরের বসতিবিন্যাসের একটি আদর্শস্থাপনকারী তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বকে বলা হয় অবরোহী। এই কারণেই এই তত্ত্ব দুটি কার্যকারণ-নীতিনির্ভর তত্ত্ব, যেমন, (জিফে'র) ক্রম ও আয়তনের নীতি এবং আধিপত্যস্থাপনকারী নগরসম্পর্কিত ধারণা থেকে আলাদা—যেহেতু এই দুটি তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে পর্যবেক্ষণ এবং এগুলি আরোহমূলক। কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব নগরের বসতি'র তৃতীয় পর্যায়ের কাজকর্মের ওপর সম্পূর্ণভাবে আলোকপাত করতে চায় এবং প্রাথমিক (primary) ও দ্বিতীয় (secondary) পর্যায়ের কর্মকাণ্ডকে এই তত্ত্ব আলোচনার বাইরে রাখে। এখানে আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব বসতিবিন্যাসের একটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব নয়। নির্দিষ্ট করে বলা যায়, এই তত্ত্ব উঁচু থেকে নীচু বিভিন্ন রকম অনুক্রমিক স্তরে বসতির ধাঁচকে যেমন উপস্থাপন করে, তেমনি ভূমিকাকেও নির্দেশ করে। তাছাড়া বিভিন্ন অনুক্রমিক স্তরে বড় বসতিগুলো কীভাবে ছোট বসতিগুলোর পরিষেবা করছে—এই বিষয়টিও ক্রিস্টেলার তত্ত্বের আলোচনার মধ্যে পড়ে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে,

ক্রিস্টেলার ১৯৩৩ সালে দক্ষিণ জার্মানীর 'বাভারিয়া' অঞ্চলের পৌরবসতি ওপর ভিত্তি করে এই তত্ত্বটি প্রয়োগ করেন। ক্রিস্টেলারের মতে, বসতিবিন্যাসের ছোট-বড় মিলিয়ে বিভিন্ন মানের বসতি বা পরিষেবা কেন্দ্রগুলো ষড়ভুজ (hexagonal) আকৃতিতে স্থান পাবে। যে-কোনো দেশের মতো, ভারতবর্ষেও, নগরের বসতিবিন্যাস এবং তার কর্মকাণ্ডের আলোচনা দেখা যায় যে বসতির অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ের কাজকর্ম। এই কাজকর্ম ব্যাপ্ত ছোট গ্রাম থেকে মহানগরী পর্যন্ত। সত্যি কথা বলতে গেলে, তৃতীয় পর্যায়ে কাজকর্মকে বাদ দিয়ে কোনো নগরের কোনো বসতির অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে না। তাই কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বে এই তৃতীয় পর্যায়ের কাজকর্মকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া, এই তত্ত্বে পরিষেবা পাবার জন্য মানুষের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মাঝে মাঝে যাওয়ার বিষয়টির ওপরও জোর দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভারতবর্ষে বিভিন্ন গ্রামে দেখা যায় যে শিক্ষা কিংবা চিকিৎসার প্রয়োজনে কিংবা আরও নানা জিনিসপত্র কেনার প্রয়োজনে গ্রামের মানুষ প্রায়ই শহরে আসে। তাই গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে নগর কিংবা নগর থেকে মহানগরে মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত একটি সাধারণ ঘটনা। এর মধ্য দিয়ে নগর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ব্যাপ্ত একটি মৌলিক কাজকর্মনির্ভর আন্তঃসম্পর্ক গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব অবরোহমূলক পদ্ধতিতে এই আন্তঃসম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে চায় এবং এইভাবে একটি আদর্শ বসতি, যা নির্ভরশীল তৃতীয় পর্যায়ের কাজকর্মের ওপর—তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৬২.৩.১ কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের মূল ধারণা

আমরা আগেই বলেছি, যে কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হল বসতিবিন্যাস। এই সীমিত প্রয়োগক্ষেত্র ছাড়াও এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত মৌলিক ধারণাটির প্রাসঙ্গিকতা আছে এই তত্ত্বের পরিধির বাইরেও অর্থাৎ আপনারা যদি জীবদেহের গঠন কিংবা সৌরজগতের গঠন বিশ্লেষর করতে চান তাহলেও এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত মৌলিক ধারণাগুলিকে প্রয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ধারণাগুলির সীমা ব্যাপ্ত বহুদূর পর্যন্ত। দু'ধরনের মৌলিক ধারণা তত্ত্বের ভিত্তি—এক, কেন্দ্রিকতার নীতি এবং দুই, পদানুক্রমের নীতি। এই দুটি নীতি অর্থাৎ কেন্দ্রিকতা এবং পদানুক্রম পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের গঠনকেই ব্যাখ্যা করে। আমাদের আলোচনা যেহেতু নগরের বসতিবিন্যাস নিয়ে, তাই আমরা দেখব এই দুই নীতি নগরের বসতিবিন্যাস বিশ্লেষণ করতে কতটা সফল। তবে তার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন 'কেন্দ্রিকতার নীতি' এবং 'পদানুক্রমের নীতি' বলতে কী বুঝি।

৬২.৩.২ কেন্দ্রীকরণের নীতি

পৃথিবীতে সমস্ত জিনিসই, তা সে জৈব হোক কিংবা অজৈব, তার একটি কেন্দ্রবিন্দু (core point) এবং একটি পরিধি (periphery) থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় এবং এই বিষয়গুলি আপনারাও জানেন যে সৌরজগতের কেন্দ্রে থাকে সূর্য, পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থান করে নিউট্রন, তেমনি মানবদেহের কোষ থাকে প্রোটোপ্লাজম (protoplasm) সমেত একটি মূল বা কেন্দ্রীয় অংশ। অনুরূপভাবে, কোনো গ্রামের কেন্দ্রীয় অংশ (focal point) গড়ে উঠতে পারে মন্দির, মসজিদ, চার্চ কিংবা অন্য কোনো সাধারণ স্থানকে ঘিরে। নগরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নগরের কেন্দ্রস্থলে গড়ে ওঠে, বাজার এবং এই বাজার নগর ও নগরকেন্দ্রিক অন্যান্য অঞ্চলগুলির দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করে। তাছাড়া আরও দেখা যায় যে ছোট বসতিগুলি গড়ে ওঠে বড় বড় বসতিগুলিকে বেষ্টন করে এবং এই ছোট বসতিগুলো, চারপাশে অন্য যেসব বসতিআছে সেগুলোর

কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে কাজ করে। সুতরাং ছোট শহরগুলিও, আমরা বলতে পারি যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী (hamlet) এবং একাধিক গ্রামের মূল অংশ হিসেবে কাজ করে। এখানে আপনাদের একটা কথা বলা দরকার মনে করি যে, বসতিবিন্যাসের ধাঁচে কেন্দ্রীয় অংশটি জ্যামিতিক আকার অনুযায়ী—সেই অর্থে মূল অংশ বলে বিবেচিত হয় না। কারণ নগরের বসতিবিন্যাসের আলোচনায় কেন্দ্রায়ন কোন জ্যামিতিক ধারণা (geometrical concept) নয়, বরং আমরা বলতে পারি যে কেন্দ্রায়ন এমন একটি ধারণা যা কেন্দ্রীয় বসতি ও পরিধির বসতিবিন্যাসের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

৬২.৩.৩ পদানুক্রমের নীতি

কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের মূল ধারণার দ্বিতীয় নীতিটি হল পদানুক্রমের নীতি। আপনারা দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় জানেন যে পৃথিবীতে অধিকাংশ ঘটনারই এই অনুক্রমিক বিন্যাস থাকে। যেমন, সৌরজগতে, আপনারা দেখেছেন, সূর্য, চাঁদ এবং গ্রহ একটি ত্রি-স্তরের অনুক্রম রচনা করে। অনুরূপভাবে, মানুষ লাঙ্গুলহীন বানর ও বানর—স্তন্যপায়ী প্রাণীবর্গের মধ্যে এইরকম ত্রি-স্তর অনুক্রম গঠন করে। পদানুক্রমের দুটি ধরন আছে—একটি স্বতঃস্ফূর্ত আর অন্যটি তৈরি করা। যেমন, একটি পরিবারের মধ্যে বংশপরম্পরায় যে পদানুক্রম তৈরি হয় তা স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। অপরদিকে, মনে করুন, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণি, সাধারণ মানুষ ও ক্রীতদাসদের নিয়ে যে পদানুক্রমিক স্তর তৈরি হয়, তা স্বাভাবিক নয়, মানুষের দ্বারা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা ব্যবস্থা। মানুষের তৈরি করা এই পদানুক্রমিক ব্যবস্থা জীবনের পদ্ধতির (way of life) পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত হয়। এইরকমভাবে দেখা যায় যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেও এই ধরনের অনুক্রমিক স্তর রয়েছে। যেমন, নগরের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রশাসনিক পদানুক্রম, সামরিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় সামরিক পদানুক্রম এবং যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তার পক্ষে প্রয়োজনীয় পদানুক্রমিক ব্যবস্থা থাকে। এলাকাভিত্তিক বিভাজন এবং স্থানিক বিভাজনের নিরিখে পদানুক্রমিক ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়। এইভাবে রাজ্য, জেলা ও তহসিল একটি এলাকাভিত্তিক প্রশাসনিক অনুক্রম তৈরি করে, যে অনুক্রম সম্পূর্ণ হয় রাজধানী শহর, জেলার সদরদপ্তর এবং তহসিল সদরদপ্তরের অবস্থানগত পদানুক্রমের দ্বারা। এখানে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এলাকা বিভাজন কেবলমাত্র প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এই বিভাজন যে-কোনো বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যার জাতীয়, আঞ্চলিক এবং উপ-আঞ্চলিক স্তরের কার্যকারী এলাকা আছে—সেই প্রতিষ্ঠানে থাকে। তাই আমরা বলতে পারি, এলাকাভিত্তিক পদানুক্রম এবং অবস্থানগত পদানুক্রম একে অন্যের পরিপূরক।

৬২.৪ সিদ্ধান্তমূলক ধারণা

এতক্ষণ আমরা কেন্দ্রায়ন ও পদানুক্রমিক নীতি নিয়ে আলোচনা করলাম এবং জানলাম কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের মূল ধারণার ভিত্তি হচ্ছে এই দুটি নীতি। নগরের বসতিবিন্যাসের আলোচনায় কিছু নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আছে যার সঙ্গে উপরিউক্ত দুই নীতি সম্পর্কযুক্ত। এরকম কিছু ব্যাখ্যার সঙ্গে জড়িত থাকে কতকগুলি গঠন যার মাধ্যমে কেন্দ্রায়ন এবং পদানুক্রমের নীতি নগরের বসতির মধ্যে কার্যকরী হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে কতকগুলি সিদ্ধান্তমূলক ধারণা—পরবর্তী অনুচ্ছেদে এই ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনা করব। এখানে ছ'টি প্রধান সিদ্ধান্তমূলক ধারণার নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন, কেন্দ্রীয় স্থানের

ধারণা, পরিপূরক এলাকার ধারণা, কেন্দ্রীয় পরিষেবা ও দ্রব্যাদির ধারণা, দ্রব্যাদি প্রাপ্তির ব্যাপ্তি, স্থানিক দূরত্ব ও জনসংখ্যার এবং কেন্দ্রিকতার ধারণা।

৬২.৪.১ কেন্দ্রীয় স্থানের ধারণা

কেন্দ্রিকতার নীতির একটি সাধারণ এবং প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্থানের ধারণা। কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বকে বিশদভাবে জানতে গেলে আগে দরকার কেন্দ্রীয় স্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা। কেন্দ্রীয় স্থান হচ্ছে এমন একটি বসতি যা এর ওপরে নির্ভরশীল অন্য একাধিক বসতির মূল বা কেন্দ্রীয় অংশ হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় স্থান অন্যান্য অঞ্চলের ওপর নিয়মিত এবং স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে, তাই এটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থা নয়। উদাহরণ হিসাবে মনে করুন কোনো একটি স্থান যেখানে বছরে একবারমাত্র কোনো উৎসব অনুষ্ঠিত হয়—তাকে আমরা কেন্দ্রীয় স্থান বলব না, যদিও এই স্থানটির অন্যান্য বসতির ওপর প্রভাব আছে। কিংবা মনে করুন, খুবই পরিচিত একটি ঘটনা—গ্রামে সপ্তাহে একবার কি দুবার যে হাট বসে, তার ফলে আশপাশের বসতি থেকে প্রচুর মানুষ গ্রামে আসে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে। এটিকেও আমরা কেন্দ্রীয় স্থান বলব না, কারণ স্থায়ী দোকানের মতো এই হাট কোনো স্থায়ী বসতিকে আকর্ষণ করে না। একটি কেন্দ্রীয় স্থান কোনো একটি গ্রাম বা একটি ক্ষুদ্র পল্লী হতে পারে, কিংবা এর অবস্থান হতে পারে কোনো একটি গ্রামীণ এলাকায় কিংবা নগরে। সুতরাং এমন ধারণা রাখা বোধ হয় ঠিক নয় যে কেন্দ্রীয় স্থান গড়ে উঠবে নগর এলাকায়। একটি শিল্পশহর কিংবা খনিশহর কেন্দ্রীয় স্থান বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত এইসব শহর চারপাশের গ্রামীণ বসতির প্রয়োজন মেটাবার মতো কিছু কিছু তৃতীয় পর্যায়ের কাজকর্ম করতে পারে। তাহলে আপনারা এখন সংগতভাবেই প্রশ্ন তুলতে পারেন—একটি স্থান কেন্দ্রীয় স্থান বলে গণ্য হবার জন্য তার কী কী প্রয়োজনীয় শর্ত থাকবে? এই উত্তরে বলব, কেন্দ্রীয় স্থান হয়ে উঠবার জন্য একটি বসতি প্রাত্যকিভাবে তার চারপাশের বসতিকে পরিষেবা দেবে। তাই এই অনুচ্ছেদের শেষে আমরা বলতে পারি যে চারপাশের বসতি থেকে যখন মানুষ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য কিংবা পরিষেবা পাবার জন্য অন্য একটি বসতিতে যাতায়াত করে তখন ঐ নির্দিষ্ট বসতিটি 'কেন্দ্রীয় স্থান' হয়ে ওঠে।

৬২.৪.২ পরিপূরক অঞ্চলের ধারণা

যে নির্দিষ্ট এলাকা, যার জন্য একটি কেন্দ্রীয় স্থান মূল বা কেন্দ্রীয় অংশ হয়ে ওঠে—তা ঐ স্থানের 'পরিপূরক এলাকা'। 'পরিপূরক' এই পদটির শব্দগত অর্থে হয়তো বুঝতে পারছেন কেন একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে 'পরিপূরক' বলা হচ্ছে। পরিপূরক এলাকা হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্থানের ধারণা সম্প্রসারক। পরিপূরক এলাকার আকৃতি এবং কেন্দ্রীয় স্থানের প্রাধান্য একে অন্যের সঙ্গে সোজাসুজি যুক্ত। আয়তনে বড় এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় স্থানের জন্য পরিপূরক এলাকাটি হবে বড়, অনুরূপভাবে আয়তনে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় স্থানের জন্য পরিপূরক এলাকাটি হবে ছোট। তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে, পরিপূরক এলাকা হচ্ছে অনেকগুলি বসতির সমষ্টি। এদের মধ্যে কতকগুলি বসতি হচ্ছে কম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় স্থান এবং অন্যান্য বসতিগুলি (যেমন গ্রাম এবং ক্ষুদ্রপল্লী) হচ্ছে অ-কেন্দ্রীয় স্থান। তত্ত্বগতভাবে তা আমরা বলতে পারি, পরিপূরক এলাকা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বসতির সমষ্টি। তবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, পরিপূরক এলাকার সীমা ঠিক করার সময় একটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সমান গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক, এলাকার সংবদ্ধ কেন্দ্রীয় স্থানগুলির হিসাবে পরিপূরক এলাকার সীমা ঠিক করতে হবে।

তবে বাস্তব পৃথিবীতে, এই এলাকার সীমার তেমন স্বীকৃত কিংবা নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ব্যাপ্তি নেই, বরং বলা যায় পরিপূরক অঞ্চলের সীমার পরিধি অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট।

৬২.৪.৩ কেন্দ্রীয় পরিষেবা ও দ্রব্যাদি

কেন্দ্রীয় স্থানের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে কোনো অঞ্চলে দ্রব্যসামগ্রী ও পরিষেবার জোগান দেওয়া। এইক্ষেত্রে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় স্থানের কার্যকলাপকে কেন্দ্রীয় স্থানের পরিষেবার দানের সমার্থক বলে বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় স্থানের কার্যকলাপ বা পরিষেবা বলতে আবশ্যিকভাবেই কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে দেওয়া তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে (teritary economic activities) বোঝায়। তবে এখানে আপনাদের একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। কেন্দ্রীয় স্থানের কাজকর্মের পরিধির মধ্যে সমস্ত ধরনের তৃতীয় পর্যায়ের কাজকর্মকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। যেমন, শহরের বাস পরিবহন ব্যবস্থা হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ের কাজ, কিন্তু কেন্দ্রীয় স্থানের কাজ নয়। এর একটি প্রধান কারণ হল এই যে কেন্দ্রীয় স্থানের কাজ বলে স্বীকৃতি পাবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্য বা পরিষেবাকে পরিপূরক এলাকা থেকে মানুষজনকে বিশেষ করে, ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করে নিয়ে আসতে হয়। তবে সবসময় ক্রেতাকে কোনো বিশেষ জিনিস সংগ্রহ করার জন্য কেন্দ্রীয় স্থানে ছুটে আসার দরকার নেই। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রকাশিত খবরের কাগজ-গ্রাহক, এজেন্ট ইত্যাদির ব্যবসাচক্রের মাধ্যমে পরিপূরক এলাকার পাঠকদের কাছে ঠিক পৌঁছে যায়। খবরের কাগজ এইভাবে মানুষকে পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে পরিপূরক এলাকার মানুষজনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং এই কাজকে নিশ্চিতভাবেই কেন্দ্রীয় স্থানের কর্মকাণ্ড (central place function) বলা যায়। একই যুক্তিতে আমরা বলতে পারি, বেতার ও দূরদর্শনের সম্প্রচারও এইভাবে কেন্দ্রীয় স্থানের কাজ সম্পাদন করে। কেন্দ্রীয় স্থানের নিজস্ব কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামো থাকে, যেমন—খবরের কাগজের দপ্তর ও প্রেস, দূরদর্শন ও বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র ইত্যাদি—যার মাধ্যমে পরিপূরক এলাকার মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় স্থানের পরিষেবার অংশ হিসাবে যেসব দ্রব্যাদি এখানে সুলভ তার মধ্যে যেমন মূল্যবান জিনিস আছে, তেমন আছে দৈনন্দিন ব্যবহারের নানা জিনিস। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কেন্দ্রীয় স্থানের নানা খুচরো বিক্রিয় দোকানে (retail shops) জামাকাপড়, চটি, মুদিখানার জিনিস ও ইলেকট্রিকের জিনিস পাওয়া যায়। ছোট কেন্দ্রীয় স্থানে যেসব পরিষেবা সুলব তা হল—সাইকেল মেরামত, ট্র্যাক্টর মেরামতের মতো কৃষি পরিষেবা। এছাড়া পোষ্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, স্কুল, ডাক্তারখানা, ব্যাঙ্কি পরিষেবাও এই স্থানে পাওয়া যায়। এর তুলনায় বড় কেন্দ্রীয় স্থানে যে পরিষেবা পাওয়া যায় এবং তার প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে যেসব দ্রব্য পাওয়া যায়—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হয়তো সেই জিনিসগুলি ছাড়াও আমরা জীবনধারণ করতে পারব, যেমন, বহুমূল্য অলঙ্কার, দামি-পোশাক-আশাক, রেডিও এবং টেলিভিশান সেট এবং উচ্চশিক্ষা। তাই এখানে আমরা বলতে পারি, কেন্দ্রীয় স্থানে সুলভ পরিষেবা ও দ্রব্যাদির মধ্যে আমাদের ব্যবহারের মাত্রা, এর দাম এবং গুরুত্ব অনুযায়ী পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে এখানে আমরা বলতে পারি, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, অসংগঠিত ক্ষেত্রের একটি বড় ভুমিকা আছে—এই ক্ষেত্রে নিয়োজিত অসংখ্য শ্রমিকেরা নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় কিংবা বাজারে বিক্রি করে। এই ধরনের

পরিষেবাকে বসতিবিন্যাসের কেন্দ্রীয় স্থান ব্যবস্থার অংশ হিসাবে গণ্য করা হবে না। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে এই ধরনের পরিষেবা নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে।

৬২.৪.৪ দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত স্থানিক দূরত্ব

কেন্দ্রিয় স্থানে কী ধরনের পরিষেবা জোগানো হয় আমরা ওপরের আলোচনার দেখলাম। এই পরিষেবা পেতে ইচ্ছুক যারা, তাদের পরিপূরক এলাকা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে, এই কেন্দ্রীয় স্থানে আসতে হয়। পরিষেবা ভোগ করছে যারা, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পরিষেবা পেয়ে যা উপকার বা সুবিধা হচ্ছে তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্থানে আসার জন্যে যে অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন হয়—তার একটি তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যেতে পারে। দুটি দিক বিচার করে পরিষেবা ভোগকারী কোনো নির্দিষ্ট জিনিস কেনার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বের স্থানে যেতে রাজি হবে। এর উদাহরণ হল কোনো ব্যক্তি এক প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্য অনেক দূরে যেতে রাজি হবে না, কিন্তু একটি বাইসাইকেল কেনার জন্য কোনো ব্যক্তি অনেক দূরের স্থানে যেতে রাজি হতে পারে। ওপরের আলোচনা থেকে এখন এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে একটি দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার মাত্রা ও গুণমানের ওপর নির্ভর করে পরিষেবাভোগকারী ব্যক্তির যাতায়াতের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা। তাছাড়া, এমন হতে পারে যে রোজকার ব্যবহারের প্রয়োজনীয় কোনো জিনিসেণ জন্য কেউ সাধারণভাবে এক কিলোমিটার পথ যেতে রাজি না হতে পারে, কিন্তু দামি কোনো বিলাসদ্রব্যের জন্য একশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে কেউ বড় শহরে যেতে দ্বিধা করবে না। তাই কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের চাহিদার প্রকৃতির ওপরেও নির্ভর করে পরিষেবাভোগকারী ব্যক্তির নির্দিষ্ট স্থানে যাবার মানসিকতা। এছাড়া, এখানে আরও একটি বিষয় আপনাদের মনে রাখা দরকার। কেন্দ্রীয় স্থানে যে বিপণন কেন্দ্রে চাহিদামাফিক দ্রব্যকে বিক্রির জন্য রাখা হয় তার দূরত্ব ও গুণমানের ওপরেও নির্দিষ্ট জিনিসের চাহিদার মাত্রা বাড়তে ও কমতে পারে। যদি ক্রেতার সংখ্যার ওপর নজর রাখি তাহলে আমরা দেখব কাছাকাছি এলাকা থেকে বেশিসংখ্যক ক্রেতা এবং দূরবর্তী অঞ্চল থেকে খুব কম সংখ্যায় ক্রেতা বিপণন কেন্দ্রে আসছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্থান থেকে দূরত্বের ভিত্তিতে ক্রেতার সংখ্যা কমে বা বাড়ে। এই কমা বা বাড়ার হার আবার পরিবর্তিত হয় দ্রব্যের চাহিদা অনুসারে। তাই একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে ক্রেতারা সাধারণত যেতে ইচ্ছুক হয় না। তাই অনায়াসেই বলা যায়, যে-কোনো দ্রব্য বা জিনিসের চাহিদা পরিমাপের ক্ষেত্রে দূরত্ব হচ্ছে মাপকাঠি। অন্য অর্থে এই চাহিদার সীমা নির্ধারণ করে দেয় সর্বাধিক দূরত্ব এবং সর্বাধিক এলাকা, যেখান থেকে বিক্রেতারা পরিষেবা পাবার জন্য কেন্দ্রীয় স্থানে আসবে। এইসব অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা পরিসেবিত অঞ্চলের দ্রব্যাদির সর্বাধিক চাহিদা নির্ধারণ করে দেয়।

৬২.৪.৫ সূচনা-সীমা

কেন্দ্রীয় স্থানে যে বিপণন কেন্দ্রে দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য রাখা হয় সেই কেন্দ্রকে ব্যবসার জন্য লাভজনক করার প্রয়োজনে যথেষ্ট সংখ্যায় ক্রেতা থাকা উচিত। অর্থাৎ এখানে আপনাদের যে বিষয়টি এই অনুচ্ছেদে বলতে চাইছি তা হল যে নির্দিষ্টসংখ্যক ক্রেতার ওপরেই নির্ভর করে দ্রব্যাদির চাহিদা বা পরিষেবা প্রদানের সূচনা-সীমা (thresh-old)। এখানে যে নির্দিষ্টসংখ্যক ক্রেতার কথা বলা হল, তাদের সংখ্যার কথা ভাবা হয় দূরত্ব এবং মোট জনসংখ্যার নিরিখে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রেতার চাহিদা পূরণ করতে গেলে পরিপূরক এলাকা এবং কেন্দ্রীয় স্থানে যে জনসংখ্যার দরকার তাই হল দ্রব্যসামগ্রী বা পরিষেবা প্রাপ্তির জনসংখ্যাগত

সূচনা-সীমা (population thresh-old for a goods or service)। পরিপূরক এলাকায় এই প্রয়োজনীয় জনসংখ্যা না থাকলে সেখানে পরিষেবা প্রদান করা যায় না। পরিপূরক এলাকার জনসংখ্যা বেশি হলে যে কেন্দ্র পরিষেবা দিচ্ছে তার লাভও অতিরিক্ত হবে এবং তা ঘটনাক্রমে একই পরিষেবা প্রদানকারী আরও কেন্দ্রগুলিকেও আকৃষ্ট করবে।

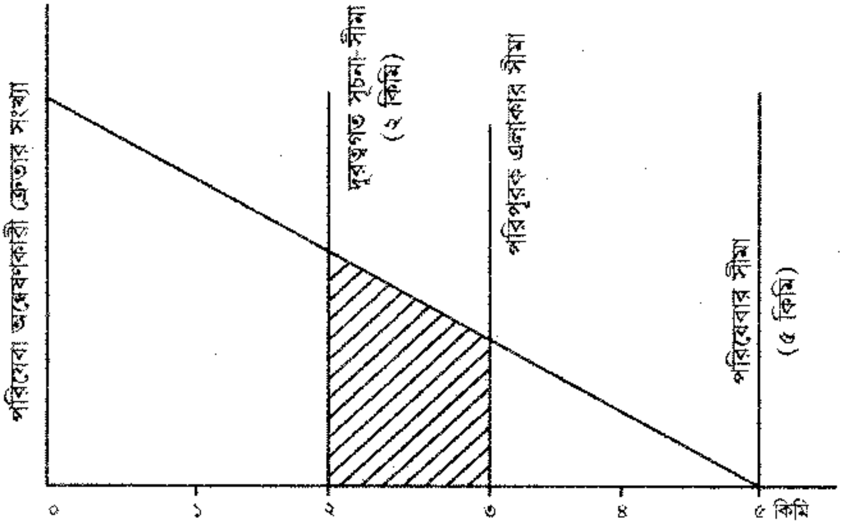

কেন্দ্রীয় স্থান থেকে দূরত্ব

পরিপূরক এলাকার মধ্যে সূচনা-সীমা এবং পরিষেবার সীমার মধ্যে সম্পর্ক

চিত্র : ৬২.১

সর্বনিম্ন জনসংখ্যা-সেবিত কেন্দ্রগুলি যে এলাকায় বিদ্যমান তার সঙ্গে দূরত্বগত সূচনা-সীমার সম্পর্ক থাকে। পরিপূরক এলাকার পরিসীমা, দূরত্বগত সূচনা-সীমা এবং পরিষেবা প্রদানের সীমা একটি অনুক্রমে অবস্থান করে, যেখানে সূচনা-সীমা থাকে সবচেয়ে কাছে এবং পরিষেবা বা দ্রব্যের সীমা থাকে সবচাইতে বেশি দূরে (দ্রষ্টব্য চিত্র ৬২.১)।

এই অংশে আপনাদের যে বিষয়টি বলতে চাই তা হল—কোনো বিষয়ে দ্রব্যের প্রাপ্তি সীমা দ্রব্যানুযায়ী কম-বেশি পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু পরিপূরক এলাকার সীমা একরকমই থাকে। পরিপূরক এলাকার থেকে যেসব জিনিস ও পরিষেবা পাওয়ার সূচনা-সীমা কম থাকে তেমন দ্রব্য বা জিনিস কিংবা পরিষেবাই কেন্দ্রীয় স্থানে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এই বিষয়টিও মনে রাখা দরকার যে পরিপূরক এলাকার সীমার তুলনায় কোনো স্থানে দ্রব্য বা পরিষেবা প্রাপ্তির সীমা বেশি হওয়া উচিত। এই শর্তাদি যদি পূরণ না করা হয়, তাহলে পরিপূরক এলাকার কিছু অংশ কেন্দ্রীয় স্থান দ্বারা পরিষেবিত হয় না। বাস্তবে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় স্থানে যে পরিষেবাগুলি দেওয়া হয় সাধারণত তার সূচনা-সীমা (threshold) এবং পরিসীমাগত বৈশিষ্ট্য (range characteristics) একইরকম। বেশি পরিমাণ সূচনা-সীমা এবং পরিসীমা আছে এমন পরিষেবা দেওয়া হয় উচ্চ পর্যায়ভুক্ত কেন্দ্রীয় স্থানে। স্বভাবতই, এই ধরনের কেন্দ্রীয় স্থানগুলিকে আলাদাভাবে জায়গা দেওয়া হয় এবং এগুলির বড় ও প্রশস্ত পরিপূরক এলাকা থাকে।

৬২.৪.৬ কেন্দ্রিকতার ধারণা

কেন্দ্রীয় স্থানের ধারণার মধ্যেই নিহিত থাকে নগরের মূল বা কেন্দ্রীয় অংশ হিসাবে 'কেন্দ্র' (centre)—এই শব্দটির গুরুত্ব। কেন্দ্রীয় স্থানে আসতে ইচ্ছুক মানুষের সংখ্যা দিয়ে, পরিপূরক এলাকার আয়তন দিয়ে এবং দ্রব্যাদি ও পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় স্থানের এই গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই তিনটি বিষয়টি হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং প্রত্যেকটির অবস্থানগত অস্তিত্ব অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। দ্রব্য ও পরিষেবার সংখ্যা এবং অনুগ্রমিক চাহিদা অনুসারে কোনেও স্থানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। পরিপূরক এলাকার আয়তন অনুযায়ী এই গুরুত্ব আবার পরিবর্তিত হতে পারে। পরিপূরক এলাকার মধ্যে, কিন্তু কেন্দ্রীয় স্থানের ভিতরে ও বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের কেন্দ্রীয় স্থান পরিষেবা দেয়। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় স্থানে বাসকারী মানুষকে যে পরিষেবা দেওয়া হয়—তা তত্ত্বগতভাবে কোনো স্থানে কেন্দ্রিকতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে না। সংজ্ঞাগতভাবে, প্রতিটি কেন্দ্রীয় স্থানের প্রয়োজন মিটিয়েও কেন্দ্রীয় স্থানের অতিরিক্ত পরিষেবা ও দ্রব্যাদি থাকবে এবং এই পরিষেবা প্রদান করা হবে পরিপূরক এলাকায় বাসকারী ব্যক্তিদের। এই অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার ধারণাই কোনো স্থানের কেন্দ্রিকতার ধারণাকে গড়ে তোলে।

৬২.৫ কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের প্রয়োজনীয় শর্ত

কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের বিশেষ অংশটির মধ্যে রয়েছে কতকগুলি মৌলিক নীতি যা অনুক্রমিক বসতি ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় স্থান এবং তার পরিপূরক এলাকার মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে। এই নীতিগুলি হচ্ছে আদর্শস্থাপনকারী এবং এগুলি আবার একাধিক সর্বাপেক্ষা অনুকূল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। পরবর্তী অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের নীতিগুলিকে পাঁচটি শিরোনামে ভাগ করে আলোচনা করব। এগুলি হল—বসতির প্রাকৃতিক বিন্যাস, পরিপূরক এলাকার আকৃতি, কেন্দ্রীয় স্থানের সংখ্যা, পদানুক্রমিক স্তর এবং বসতিবিন্যাসের ধাঁচ।

৬২.৫.১ বসতির প্রাকৃতিক একরূপত্ব

কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব যে বিষয়টির ওপর জোর দেয় তা হল বসতির প্রাকৃতিক অবস্থান জনসংখ্যার বিন্যাস, ভূখণ্ড, সংস্থান এবং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। অন্যভাবে বলা যায়, প্রাকৃতিক অবস্থানকে ভাবা হয় একটি আদশল সমতলভূমি। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই তত্ত্ব একটি আদর্শ পরিস্থিতিকে তুলে ধরতে চায়। যাইহোক, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমাদের বোধহয় বোঝার সুবিদা হবে যে বাস্তব 'আদর্শ' রূপ থেকে কতটা সরে যায়। উদাহরণ হিসাবে আমরা যদি ভারতবর্ষের কথা ধরি তাহলে দেখব গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে এবং মালভূমি অঞ্চলে প্রাকৃতিক একরূপতার অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক। এই দিক দিয়ে দেখলে, প্রাকৃতিক একরূপতার ধারণাটিকে কোনোমতেই অবাস্তব বলা যায় না।

৬২.৫.২ পরিপূরক অঞ্চলের আকৃতি

এবার আমরা পরিপূরক এলাকার আকৃতি কেমন হবে তা জানব। কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব অনুসারে, বসতির সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বিন্যাস সম্পূর্ণভাবে একই ধরনের কেন্দ্রীয় স্থান দ্বারা পরিষেবিত হবে, এখানে এই অঞ্চলের কোন অংশেই কেন্দ্রের দ্বারা অ-পরিষেবিত থাকবে না এবং কোনো অঞ্চল আবার একটির অধিক কেন্দ্র দ্বারা পরিষেবিত হবে না। এর জন্য দরকার নির্দিষ্ট পরিসীমা সমেত একাধিক পরিপূরক এলাকায় কোনো একটি অঞ্চলকে ভাগ করা। ষড়ভুজাকার (hexagonal) পরিপূরক এলাকাগুলি উপরিউক্ত আবশ্যিক শর্তগুলি

পূরণ করে। এছাড়া, কেন্দ্রের চারপাশে যে বৃত্তাকার এলাকা থেকে ষড়ভুজাকার আকৃতিগুলি তার সঙ্গে মানানসই। বৃত্তাকার পরিপূরক এলাকাগুলি আদর্শ বলে ভাবা হলেও তারা কিন্তু আগে বলা মূল আবশ্যিক শর্তগুলি পূরণ করে না। আবার, বৃত্তকার পরিপূরক এলাকাগুলি কোনো কেন্দ্র দ্বারা অপরিষেবিত অনেক এলাকা ত্যাগ করে কিংবা অন্য এলাকা অধিক্রম (overlap) করে। এইভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রর মধ্যে অপচয়ী প্রতিযোগিতা (wasteful competition) ছড়িয়ে দেয়। অপরদিকে, ষড়ভুজাকার পরিপূরক এলাকাগুলি কোনোরকম ফাঁক না রেখে কিংবা অতিক্রম না করে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এলাকাকে অতিক্রম করবে।

৬২.৫.৩ কেন্দ্রীয় স্থানের সংখ্যা

আমরা এই পর্যন্ত আলোচনায় দেখলাম যে কেন্দ্রীয় স্থানগুলি সর্বাধিক লোককে পরিষেবা দেবে—এটাই প্রয়োজনীয়। কিন্তু কতসংখ্যক লোককে পরিষেবা দেবে, তা নির্ভর করে দ্রব্যসামগ্রীর ব্যাপ্তির ওপর। অন্যভাবে বলা যায়, পরিপূরক এলাকার সীমা যতটা সম্ভব দ্রব্যাদির ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। ধরা যাক, কোনো স্থানে বিভিন্ন ধরনের জিনিস সুলভ, সেখানে পরিপূরক এলাকার সীমা মোটামুটিভাবে জিনিসের ব্যাপ্তির সঙ্গে মানানসই হবে। এছাড়া আর একটি উপায়ে কেন্দ্রীয় স্থানের সংখ্যা কমানো যেতে পারে; তা হল—একই স্থানে সর্বাধিক সংখ্যক জিনিসপত্র ও পরিষেবা পাওয়ার ব্যবস্থা করা। এই বিষয়টি ক্রেতাকে একবার এসেই বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র কিনতে সাহায্য করবে এবং এর ফলে সময় ও খরচ দুই-ই বাঁচবে। নির্দিষ্ট কোনো একটি স্থানে যত সুবিধা দেওয়া যাবে, এটি তত আকর্ষনীয় হয়ে উঠবে। কিন্তু যেরকম এখানে বলা হল, সেরকমভাবে একই স্থানে সমস্ত পরিষেবা প্রদান সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ আগে বলা অন্য দুটি বিষয় যেমন—(১) সূচনা-সীমা (threshold) এবং ব্যাপ্তি (range) এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেসব ছোট ছোট জায়গায় পরিষেবা দেওয়া যায় না, কিংবা জিনিসপত্র পাওয়া যায় না—সেগুলি অন্যসব জায়গায় অনুক্রমিক স্তরে (hierarchical levels) দেওয়া হবে।

৬২.৫.৪ অনুক্রমিক স্তর

আগের আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে আমরা বলতে পারি, মানুষের প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও দ্রব্যাদির জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় স্থানের অনেক সংখ্যক অনুক্রমিক স্তর। আবার কেন্দ্রীয় স্থানগুলির সংখ্যা কমানোর জন্য অনুক্রমিক স্তরগুলিকেও কমানো দরকার, এর ফলে সমস্ত ব্যবস্থাটাই সম্পূর্ণভাবে উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থাটাকে ভালো করার জন্য দরকার প্রতিটি অনুক্রমিক স্তরে সর্বাধিক সংখ্যায় কর্মধারার (functions) অন্তর্ভুক্তি, এর ফলে অনুক্রমিক স্তরগুলি হ্রাস করার কাজের সুবিধা হয়। অনুক্রমিক স্তরগুলির সঠিক (actual) সংখ্যা নির্ভর করে দুটি বিষয়ের ওপর—(ক) অঞ্চলের আয়তন এবং (খ) এর উন্নয়নের মাত্রা। ধারণার ভিত্তিতে কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে—অঞ্চলের আয়তন যত বাড়বে, অনুক্রমিক স্তরগুলির সংখ্যা তত বাড়বে। আবার উচ্চ পর্যায়ের বা ক্রমের কেন্দ্রের অস্তিত্ব থাকবে কি না থাকবে তা স্থির হবে অঞ্চলের আয়তনের মাধ্যমে। উচ্চক্রমের কেন্দ্রগুলিকে স্থায়ী করার জন্য একটি ছোট অঞ্চলের জনসংখ্যার কোনো সূচনা-সীমা থাকবে না। যেমন, উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে জাতীয় স্তরে কেউ ছয় বা সাতটি অনুক্রমিক স্তরের কথা ভাবতে পারেন, আবার জেলাস্তরে কেবলমাত্র তিন বা চারটি অনুক্রমিক স্তরবিশিষ্ট কেন্দ্রের আশা করতে পারেন। উন্নত এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের যেহেতু আর্থিক অবস্থা ভালো এবং তাদের মধ্যে অনেক ধরনের জিনিস ও পরিষেবার চাহিদা বেশি, তাই এই এলাকায় অনুক্রমিক স্তরের সংখ্যাও বেশি হতে পারে। অনগ্রসর এলাকায়, কেন্দ্রীয় অনুক্রমিক স্তরের সংখ্যাও কম হবে। নিম্নক্রমের কেন্দ্রগুলির জায়গা (space) বাস্তবক্ষেত্রে, অনুক্রমিক স্তরের সংখ্যাকে প্রভাবিত করে। আর দ্বিতীয় প্রভাব বলয় হল যেভাবে উচ্চ ও নিম্ন

ক্রমবিশিষ্ট কেন্দ্রগুলির পরিপূরক এলাকা একে অন্যের সঙ্গে জালের মতো বিন্যাসে সমন্বিত। নিম্ন পর্যায়ের কেন্দ্রগুলি যেসব পরিবহনব্যবহারে রীতি এবং অন্যান্য বিষয় এর সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত। আসলে এই বিন্যাসের বিষয়টি বেশ সমস্যাময় এবং জটিল, তবু কেন্দ্রীয় স্থানের অনুক্রমের অবস্থানের প্যাটার্ন বা ধাঁচের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই জটিল সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে।

৬২.৫.৫ পরিপূরক এলাকার বিন্যাসের ধাঁচ

আমরা ক্রিস্টেলার প্রবর্তিত কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের আলোচনায় আগেই বলেছি যে প্রতিটি কেন্দ্রীয় স্থানের অনুক্রমিক স্তরের জন্য ষড়ভুজাকার পরিপূরক এলাকার মানানসই একটি জানের মতো বিন্যাস থাকবে। উচ্চতর ক্রমের জাল-বিন্যাসের (network) এর মধ্যে নিম্নতর ক্রমের ষড়ভুজাকার জাল-বিন্যাস প্রকোষ্ঠ থাকবে—এইভাবে এগুলি একই অঞ্চলের পুরোটা জুড়ে বিরাজ করবে। এই জাল-বিন্যাস প্রকোষ্ঠের জ্যামিতিক ধাঁচ আবার কতকগুলি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হবে। এরকম তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন ক্রিস্টেলার। এগুলি হল—(ক) বাণিজ্যিক সূত্র, (খ) পরিবহন-সংক্রান্ত সূত্র এবং (গ) প্রশাসনিক সূত্র।

বাণিজ্যিক সূত্র অনুযায়ী, নিম্নক্রমের কেন্দ্রীয় স্থানের সংখ্যা এমন হবে যা কাছাকাছি উচ্চক্রমের স্থানের জন্য প্রয়োজনীয়। এখানে আমাদের মনে রাখার দরকার যে উচ্চক্রমের স্থানগুলিতে যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আয় এবং পরিষেবা প্রদানের বিষয়গুলি রাখা হয়েছিল পরবর্তী নিম্নক্রমের স্থানগুলিতেও একইরকম রাখা হবে। এই পরিস্থিতিতে, যদি প্রতিটি উচ্চক্রমের কেন্দ্রের অধীন নিম্নক্রমের কেন্দ্রের সংখ্যা সবচেয়ে কম থাকে, তাহলে তা পুরো ব্যবস্থার আনুকূল্য কিংবা উৎকর্ষ বৃদ্ধি করবে। যে বাণিজ্যিক সূত্রের ভিত্তিতে জাল-বিন্যাসের রচনা হয়েছে তার যথাযথ জ্যামিতিক মান '৩'-এর নীতি (rule of three) অনুসরণ করবে। বাণিজ্যিক সূত্রে (marketing principle) 'K' বা ধ্রুবক (constant) '৩'-এর সমান—এটি উচ্চ ও নিম্নক্রমের কেন্দ্রগুলির আপেক্ষিক জায়গায় ব্যাপারটি স্থির করে। শুধু তাই নয়, এটি উচ্চ ও নিম্নক্রমের কেন্দ্রের আপেক্ষিক সংখ্যাও স্থির করে এবং নির্ধারণ করে সেই জ্যামিতিক ধাঁচকে যার মধ্যে বিভিন্ন অনুক্রমিক স্তরের ষড়ভুজাকৃতি একে অন্যের সঙ্গে মানানসই হয়ে থাকে।

পরিবহন সংক্রান্ত সূত্রের মধ্যে রয়েছে সমস্ত অনুক্রমিক স্তরে কেন্দ্রীয় স্থানের সঙ্গে যুক্ত রাস্তার দৈর্ঘ্যের হ্রাস করার বিষয়। এই সূত্রের অধীনে নিম্নক্রমের কেন্দ্রগুলির অবস্থান এমন হবে যা সড়কপথে যুক্ত উচ্চক্রমের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে। সড়কপথে যুক্ত এই স্থানগুলির অবস্থানের জন্য প্রয়োজন সড়কের দৈর্ঘ্য হ্রাস। যাই হোক, প্রতিটি উচ্চ পর্যায়ের কেন্দ্রের জন্য দরকার নিকটবর্তী নিম্নক্রমের চারটি কেন্দ্র। পরিবহনসংক্রান্ত নীতি অনুসারে নিম্নক্রমের চারটি কেন্দ্রের অবস্থিতি হচ্ছে বাণিজ্যিক সূত্রের অধীন তিনটি নিম্নক্রমের কেন্দ্রের অবস্থানের নিয়মের বিপরীত।

তৃতীয় সূত্র অর্থাৎ প্রশাসনিক সূত্রের মধ্যে নিহিত আছে এই ধারণা যে পরবর্তী উচ্চক্রমের কেন্দ্রের পরিপূরক এলাকার পরিসীমার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিম্নক্রমের কেন্দ্রগুলির পরিপূরক এলাকা থাকা উচিত। যে-কোনো প্রশাসনিক আঞ্চলিক ব্যবস্থায় এই নীতি আবশ্যিক। আমরা এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে ভারতবর্ষে কথা বলতে পারি। ভারতবর্ষের প্রশাসনিক কাঠামোর দেখা যায় সমস্ত জেলাগুলির পরিসীমাকে ঘিরে রয়েছে রাজ্যের পরিধি। এটি একটি প্রশাসনিক আবশ্যিকতা। জ্যামিতিক ধাঁচের নিয়মে বলা যায়—'৭' এই সংখ্যায় ধ্রুবক বা 'K' factor নিয়ে পরিপূরক এলাকার যে ষড়ভুজাকৃতি ব্যবস্থা এমন এক জাল-বিন্যাস (network)-এর সৃষ্টি করে যা প্রশাসনিক সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ক্রিস্টেলার প্রবর্তিত কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের অধী যে তিনটি সূত্র নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম তা হল আদর্শ ব্যবস্থা। বর্তমানে এই তিনটি সূত্রের যে-কোনো একটিকে নিয়ে বাস্তব পৃথিবীতে যে-কেউ মূল্যায়ন করতে পারে এবং এই সূত্রগুলির প্রাসঙ্গিকতা বা উৎকর্ষ যাচাই করতে পারে। তবে নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, পরিশেষে, আমরা বলতে পারি, যে-কোনো বিশেষ অঞ্চলে তিনটি সূত্রের মধ্যে যে-কোনো একটির বিশেষ প্রভাব থাকতেই পারে।

৬২.৬ ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় স্থানব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখলাম নগরে বসতির কেন্দ্রীয় স্থানব্যবস্থার মূল বিষয় দুটি—(ক) বসতির অনুক্রমিক অবস্থান এবং (খ) একরূপ আদর্শ ব্যবস্থার অধীনে বিভিন্ন স্তরের বসতির জন্য সমান স্থান নির্দেশ। আগেই আপনারা জেনেছেন যে, এই তত্ত্ব হচ্ছে আদর্শস্থাপনকারী। তাই ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে যদি এই তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে চাই, তাহলে এটা বিচার করা সংগত হবে না যে ভারতবর্ষে জাতীয় বা আঞ্চলিক স্তরে এই তত্ত্বের সত্যতা কতটা। বরং, এমন প্রশ্ন তোলাই যুক্তিসংগত যে ভারতবর্ষে জাতীয় বা আঞ্চলিক স্তরে বসতি ব্যবস্থায় আদর্শ কেন্দ্রীয় স্থানব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য বা নীতি প্রতিফলিত হয়েছে কি না! শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো বসতি ব্যবস্থাতে বাস্তবক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের নীতি ও শর্তগুলি স্থান পাবে এমন আশা পোষণ করা উচিত নয়। কারণ আদর্শতত্ত্বের ব্যত্যয় বাস্তবক্ষেত্রে ঘটতে বাধ্য। বরং তুলনা না করে ভারতবর্ষের বসতি ব্যবস্থাকে নিয়ে আলোচনা করে আমরা দেখতে পারি এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের কোনো কোনো উপাদান সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রশাসনিক দিক থেকে ভারতবর্ষের একটি ছয়-স্তর (six level) বিশিষ্ট বসতি আছে। এই দেশে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের মধ্যেই স্থান ও এলাকার অনুক্রমিক বিন্যাসের অর্থ এবং প্রাসঙ্গিকতা (relevabee) খুঁজে পাওয়া যায়। সেই অর্থে ভারতবর্ষের রাজধানী শহর আছে, আছে ২৯টি রাজ্যের রাজধানী-শহর, প্রায় ৪০০টি জেলা সদরদপ্তরসহ বড় শহর, ২,৫০০-র ওপর তহশীল (tehsil) শহর এবং পরিশেষে,—৫,০০০-এর সামান্য বেশি ব্লক (block) উন্নয়ন কেন্দ্র। এরপর আবার আছে প্রায় ২ লক্ষ (আনুমানিক) গ্রাম পঞ্চায়েত কেন্দ্র—যেগুলি ছোট ছোট গ্রাম ও পল্লীগুচ্ছকে (cluster of hamlets) পরিষেবা দেয়। বাস্তবক্ষেত্রে জাতীয় এবং রাজ্যের রাজধানীগুলি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ মহানগরী এবং অধিকাংশ জেলার সদরদপ্তরগুলি এবং এমনকি তহশীলগুলি নগরায়িত এলাকা (urbanareas) বলে স্বীকৃত। ব্লক স্তরে, দেখা যায়, অধিকাংশ ব্লক সদরদপ্তরগুলি বড় গ্রাম বলে চিহ্নিত, কখনো কখনো ৫,০০ বা তার বেশি জনসংখ্যা থাকলেও এগুলিকে নগরায়িত এলাকা বলে গণ্য করা হয় না। আমরা জানি, শব্দগত অর্থে, গ্রাম পঞ্চায়েত হচ্ছে সংশয়াতীতভাবে গ্রাম, কিন্তু যেহেতু এগুলি প্রতিবেশী পল্লীগুলিকে (negighbouring hamlets) নানা ধরনের পরিষেবা দেয় সেহেতু এগুলিকে নগরের নিম্নক্রমের কেন্দ্রীয় স্থান বলা হয়। এই পর্যন্ত আলোচনায় যা প্রকাশ পেল তা ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি—ক্রিস্টেলার প্রবর্তিত কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের অধীনে প্রশাসনিক সূত্র সম্পর্কে যা জেনেছি সেই আদর্শ বিন্যাসব্যবস্থা থেকে ভারতবর্ষের বসতির প্রশাসনিক অনুক্রমের অনেকখানি তফাত রয়েছে। তবে তত্ত্বগত দিক বাদ দিয়ে, যদি আমরা ভারতের বসতি-ব্যবস্থাকে পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনার নিরিখে দেখি, তাহলে হয়তো দেখব কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব এই ব্যবস্থায় নয়, বরং অনেকাংশই উপযোগী।

৬২.৭ সারাংশ

নগরায়ণের তত্ত্বের আলোচনায় আমরা এই এককে কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব সম্পর্কে জানলাম। এই তত্ত্ব নগরের বসতিবিন্যাস সংক্রান্ত দ্বিতীয় তত্ত্ব অর্থাৎ আদর্শস্থাপনকারী তত্ত্বের অন্তর্গত এবং এই তত্ত্বের প্রবক্তা হচ্ছেন ক্রিস্টেলার (Christaller)। ১৯৩৩ সালে দক্ষিণ জার্মানির বাভারিয়া অঞ্চলে পৌর বসতিগুলোর (urban settlements) ওপর ভিত্তি করে ক্রিস্টেলার এই তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। এই তত্ত্ব বসতিবিন্যাসের অন্য দুটি তত্ত্ব যেমন জি.কে. জিফ (G.K. Zipf)-এর "ক্রম ও আয়তনের নীতি" এবং মার্ক জেফারসন ব্যাখ্যাত (Jefferson) "আধিপত্যস্থাপনকারী নগরসম্পর্কিত ধারণা" থেকে আলাদা, কারণ এ দুটি তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে পর্যবেক্ষণ এবং এগুলি আরোহমূলক। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব হচ্ছে অবরোহী এবং আদর্শস্থাপনাকারী (deductive and normative)। এই তত্ত্ব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নগরের বসতিবিন্যাসের বর্তমান ধাঁচ (pattern) কেমন তা বর্ণনা করার থেকে জোর দিয়ে চায় বসতিবিন্যাসের ধাঁচ কেমন হওয়া উচিত—এই বিষয়ের উপর। তাছাড়া, আলোচ্য তত্ত্ব জিফ-প্রবর্তিত "ক্রম ও আয়তনের" নীতি অনুসারে কোনো বসতির রৈখিক-পারস্পর্যের বা অনবচ্ছেদের ধারণাকে (idea of a settlement continuum) প্রত্যাখ্যান করে এবং বসতিবিন্যাসে পৃথক পৃথক অনুক্রমিক স্তরের ধারণাকে (idea of discrete hierarchy of settlements) আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। দুটি মৌলিক ধারণার ওপর এই তত্ত্বের ভিত্তি, যেমন—(১) কেন্দ্রায়নের নীতি এবং (২) পদানুক্রমের নীতি। এছাড়া, আলোচ্য তত্ত্ব অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের মধ্যে নিহিত থাকে ছ'টি সিদ্ধান্তমূলক ধারণা, যেমন—(ক) কেন্দ্রীয় স্থানের ধারণা, (খ) পরিপূরক এলাকার ধারণা, (গ) কেন্দ্রীয় পরিষেবা ও দ্রব্যাদির ধারণ, (ঘ) দ্রব্যাদি প্রাপ্তির ব্যাপ্তি, (ঙ) স্থানিক দূরত্ব ও জনসংখ্যার সূচনা-সীমা এবং (চ) কেন্দ্রিকতার ধারণা। আলোচনার তৃতীয় স্তরে আমরা উল্লেখ করেছি, কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের বিশেষ অংশটির মধ্যে রয়েছে কতকগুলি মৌলিক নীতি বা অনুক্রমিক বসতিব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় স্থান ও তার পরিপূরক এলাকার মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে। এই নীতিগুলিকে পাঁচটি শিরোনামে ভাগ করে আলোচনা করা যায়, যেমন—(১) বসতির প্রাকৃতিক একরূপত্ব, (২) পরিপূরক এলাকার আকৃতি, (৩) কেন্দ্রীয় স্থানের সংখ্যা, (৪) অনুক্রমিক স্তর এবং (৫) পরিপূরক এলাকার বিন্যাসের ধাঁচ। আগেই বলা হয়েছে, ক্রিস্টেলারের মতো, ছোটবড় মিলিয়ে বিভিন্ন মানের বসতি (settlement) বা পরিষেবা কেন্দ্রগুলি ষড়ভুজ (hexagonal) আকৃতিতে বিন্যস্ত থাকবে। বড় বড় বসতি বা পরিষেবা কেন্দ্রগুলি তুলনামূলকভাবে দূরে অবস্থিত হবে আর অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট বসতি বা পরিষেবা কেন্দ্রগুলো পরস্পরের কাছাকাছি থাকবে। ক্রিস্টেলারের তত্ত্ব বিশ্লেষর করলে যে ধারণাগুলি গড়ে ওঠে, তা এখানে আপনাদের অনুধাবনের জন্য সহজভাবে জানাচ্ছি। ক্রিস্টেলারের মতে, আদর্শ অবস্থায় (ideal situation) প্রতিটি কেন্দ্রের প্রভাব বলয় হবে গোলাকৃতি এবং এরা পরস্পরকে অধিক্রমণ করবে (overlap)। এক্ষেত্রে দুটি গোলাকৃতি এলাকার মধ্যবর্তী অংশ (দ্রষ্টব্য চিত্র ৬২.২) অ-পরিষেবিত (unserved) থেকে যায়। এই সমস্যার অবসান ঘটানোর জন্য ক্রিস্টেলার গোলাকৃতি এলাকার বদলে ষড়ভুজাকার এলাকার কথা বলেন। তাঁর মতে, এইরকমভাবে বিভিন্ন ধাপের পরিষেবা কেন্দ্রের (hierarchical service centre) ষড়ভুজাকৃতি প্রভাব বলয় তৈরি হবে। পরিষেবা কেন্দ্রের সবচেয়ে নীচে থাকবে ক্ষুদ্র পল্লী (hamlet)। এখানে আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকায় ক্ষুদ্রতম বসতি বা পরিষেবা কেন্দ্রগুলি এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যাতে একটি কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে হাঁটা পথে যেতে প্রায় ২ ঘন্টা সময় লাগবে। সাধারণত একজন মানুষের হেঁটে যাবার গড় প্রতি হল ঘণ্টায় ৩.৫ কিলোমিটার। অতএব যে-কোনো দুটি বসতির বা পরিষেবা কেন্দ্রের মধ্যের দূরত্ব হবে ৭

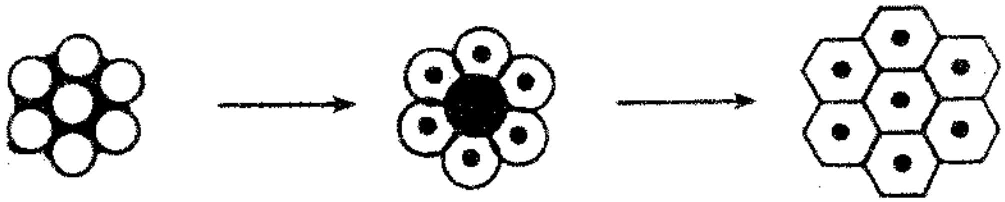

চিত্র-৬২.২ গোলাকৃতি প্রভাব বলয়ের বিবর্তন

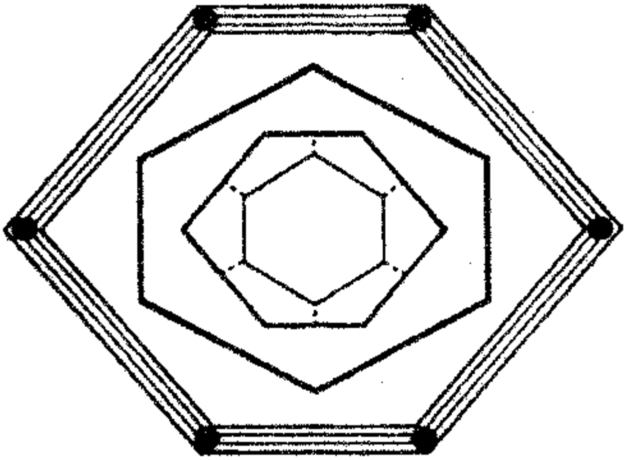

চিত্র-৬২.৩ ষড়ভুজের বৈশিষ্ট্য ও বিন্যাস

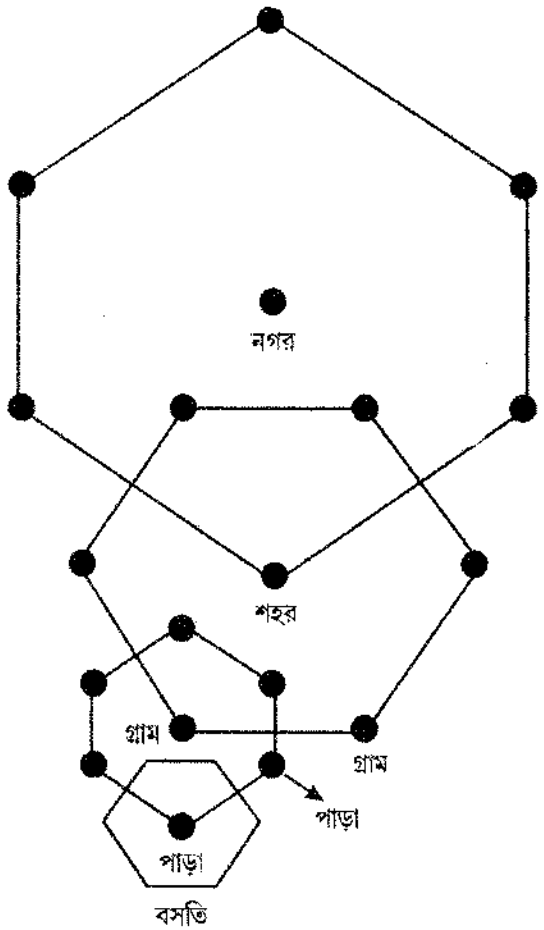

চিত্র-৬২.৪ ক্রিস্টেলারের মডেল

কিলোমিটার। এই নিয়মানুযায়ী ক্ষুদ্র পল্লীগুলোর একটির থেকে অন্যটির দূরত্বগত অবস্থান হবে ৭ কিলোমিটার। এই পল্লীগুলো নিয়ে এমন একটি বসতি গড়ে উঠবে যার পরিষেবার বৈচিত্র্য থাকবে এবং তা পারিপার্শ্বের বসতির বাসিন্দাদের আকৃষ্ট করবে। ক্রমশ এই বসতি আয়তনে বড় হয়ে উঠবে এবং গ্রামে পরিণত হবে। এই ধরনের গ্রাম ষড়ভুজের (দ্রষ্টব্য চিত্র ৬২.৩) কেন্দ্রে অবস্থিত হবে। এইভাবে দ্বিতীয় ধাপের বসতির উদ্ভব হলে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে শহর এবং ষড়বুজের ছ-কোণায় থাকবে ছ'টি গ্রাম। ক্রিস্টেলারের মতে, এই দ্বিতীয় ধাপ বা পর্যায়ের পরিষেবা কেন্দ্রগুলো তিনগুণ এলাকা ও তিনগুণ জনসংখ্যাকে পরিষেবা প্রদান করবে। এইভাবে দেখা যায়, শহরগুলোকে একে অন্যের থেকে ২১ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত হবে। অনুরূপভাবে পরিবর্তী উচ্চক্রমের পরিষেবা কেন্দ্রগুলো আরও তিনগুণ এলাকা এবং জনসংখ্যাকে পরিষেবা করবে।

৬২.৮ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব	—	Central place theory
ক্রম ও আয়তনের নীতি	—	Rank-size rule
বসতিব্যবস্থা	—	Settlement system
আধিপত্যস্থাপনকারী নগর সম্পর্কিত ধারণা	—	Primate city concept
কার্যকারণ নীতি	—	Behavioural theory
আদর্শস্থাপনকারী তত্ত্ব	—	Normative theory
আরোহমূলক	—	Inductive
অবরোহনমূলক	—	Deductive
প্রাথমিক কাজকর্ম	—	Primary activities
দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজকর্ম	—	Secondary activities
তৃতীয় পর্যায়ের কাজকর্ম	—	Teritary activities
পৌর বসতি	—	Urban settlement
পরিষেবা কেন্দ্র	—	Service centre
রৈখিক পারম্পর্য	—	Continuum
সিদ্ধান্তমূলক ধারণা	—	Derivative concepts
কেন্দ্রিকতা	—	Centrality
পরিপূরক এলাকা	—	Complementary areas
কেন্দ্রায়ন	—	Centralization
সূচনা-সীমা	—	Threshold
জ্যামিতিক	—	Geometric

ধাঁচ	—	Pattern
একরূপত্ব	—	Uniformity
ষড়ভুজাকার	—	Hexagonal
স্তর	—	Level
বিপণন, বাণিজ্যিক	—	Marketing
প্রশাসনিক	—	Administrative
জাতীয়	—	National
আঞ্চলিক	—	Regional
ব্যত্যয়	—	Deviation
ব্যাপ্তি	—	Range
পদানুক্রমিক স্তর	—	Hierarchical levels
পরিবহন সংক্রান্ত নীতি	—	Transportation priciple
উচ্চক্রম	—	Higher order
নিম্নক্রম	—	Lower order
জনসংখ্যা	—	Population
সদরদপ্তর	—	Headquarters
পল্লী	—	Hamlet

৬২.৯ অনুশীলনী

(১) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য আর কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।

(ক) কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা জে. কে. জিফ।

(খ) কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব হচ্ছে একটি আরোহমূলক এবং কার্যকারণ নির্ভর মতবাদ।

(গ) বসতিবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই তত্তেব দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) তিনটি মৌলিক ধারণা হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের ভিত্তি।

(ঙ) ১৯৩৮ সালে উত্তর জার্মানির বাভেরিয়া অঞ্চলের পৌর বসতিগুলির ওপর ভিত্তি করে ক্রিস্টেলার এই তত্ত্ব প্রয়োগ করেন।

(চ) সমস্ত পৌর এলাকাই আবশ্যিকভাবে কেন্দ্রীয় এলাকা নয়।

(ছ) পরিপূরক এলাকার আয়তন এবং কেন্দ্রীয় স্থানের গুরুত্ব প্রত্যক্ষভাবে একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

(জ) পরিপূরক এলাকার ভেতের কিন্তু কেন্দ্রীয় স্থানের ভেতরে ও বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের পরিষেবা প্রদান করে কেন্দ্রীয় স্থান।

(ঝ) অনুক্রমিক স্তরের সঠিক সংখ্যা কেবলমাত্র কোনো এলাকায় আয়তনের ওপর নির্ভর করে।

(ঞ) পরিষেবা কেন্দ্রের সর্বনিম্ন ধাপে থাকবে ক্ষুদ্র পল্লী।

(২) পাঁচলাইনের চারটি টীকা লিখুন :

(ক) কেন্দ্রায়নের নীতি।

(খ) পরিপূরক এলাকা।

(গ) সূচনা-সীমা।

(ঘ) অনুক্রমিক স্তর।

(৩) ৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন :

(ক) ভারতবর্ষে ছয়-স্তরের বসতির অনুক্রম।

(খ) পদানুক্রমের নীতি কাকে বলে হয়।

(গ) কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বকে কেন 'আদর্শস্থানপকারী তত্ত্ব' বলা হয়?

(ঘ) পরিপূরক এলাকার বিন্যাসের ধাঁচ কেমন?

(৪) ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন :

কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের মূল বিষয়গুলি।

৬২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) কার্টার, হ্যারল্ড— *দি স্টাডি অফ আরবান জিওগ্রাফি*, আর্নল্ড, লন্ডন, ১৯৮২।

(২) জিফ, জে. কে— *হিউম্যান বিহেভিয়ার অ্যান্ড দি প্রিন্সিপল অফ লিস্ট এফোর্ট*, ১৯৪৯।

(৩) মণ্ডল, আর. বি— *আরবান জিওগ্রাফি—এ টেক্সবুক, নিউদিল্লি* : কনসেপ্ট পাবলিশিং, ২০০০।

(৪) রামচন্দ্রন, আর— *আরবানাইজেশান এ্যান্ড আরবান সিস্টেমস ইন ইন্ডিয়া*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউদিল্লি ১৯৯১।

একক ৬৩ ❑ বার্জেস ও এককেন্দ্রিক মতবাদ/এককেন্দ্রিক বলয় তত্ত্ব

গঠন

৬৩.১ উদ্দেশ্য

৬৩.২ প্রস্তাবনা

৬৩.৩ মানবিক বাস্তববিদ্যা ও বার্জেস

৬৩.৩.১ সামাজিক এলাকার বিন্যাস

৬৩.৪ এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ

৬৩.৪.১ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা

৬৩.৪.২ পরিবর্তনশীল এলাকা

৬৩.৪.৩ কর্মচারী আবাসস্থল

৬৩.৪.৪ আবাসিক এলাকা

৬৩.৪.৫ দৈনিক যাত্রী এলাকা

৬৩.৫ সারাংশ

৬৩.৬ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

৬৩.৭ অনুশীলনী

৬৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৬৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা নগরের কায়িক গঠন সম্পর্কে একটি বিশেষ মতবাদের বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হব। এই একক অধ্যয়নের পর, আশা করা যায়, আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবেন—

- বার্জেস কীভাবে তাঁর তত্ত্ব নির্মাণ করেন।
- কেন্দ্রীয় ব্যবসায়-কর্মের এলাকা ও পরিবর্তনশীল এলাকার ব্যাখ্যা।
- কর্মচারী আবাসস্থল ও আবাসিক এলাকার ধারণা।
- দৈনিক যাত্রী বলয় কাকে বলে।

৬৩.২ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে আমরা নগরায়ণের একটি প্রধান তত্ত্ব—কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং দেখেছি বিভিন্ন পর্যায়ে নগরের বিকাশকে এই তত্ত্বের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আলোচ্য এককে আমরা নিম্নলিখিত দুটি বিষয় নীচে আলোচনা করব।

(১) মানবিক বাস্তববিদ্যা ও ই. ডব্লু. বার্জেস,

(২) এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ (Concentric Zone Theory)

৬৩.৩ মানবিক বাস্তববিদ্যা ও বার্জেস

আধুনিক নগরের কায়িক গঠনের বিষয়টিকে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে সমস্ত বিষয়টি বাস্তববিদ্যাগত পাঠের (ecological studies) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে অবশ্যই আপনাদের বলা দরকার যে সমাজতত্ত্বে 'মানবিক বাস্তববিদ্যা'র (Human Ecology) যে আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে তার ভিত্তি হচ্ছে আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের বাস্তববিদ্যার ওপর বেশ পুরোনো লেখাপত্র ও আলোচনা। এই বিষয়ে চিকাগো স্কুলের প্রবর্তিত চিন্তাধারার তিন পথিকৃত হলেন সমাজতত্ত্ববিদ্ আর. ই. পার্ক (R. E. Park) আর. ডি. ম্যাকেঞ্জি (R. D. Mackenzie) এবং তৃতীয়জন অবশ্যই ই. ডব্লু. বার্জেস (E. W. Burgess)। আপনারা আগেই জানেন যে, আমাদের এই এককে আলোচনার বিষয়বস্তু যেহেতু বার্জেস ও তাঁর প্রবর্তিত এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ, তাই আমরা মূল আলোচনায় যাব। তবে 'মানবিক বাস্তববিদ্যা'র আলোচনায় বার্জেস যেহেতু পার্কের চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাই পার্কের মতামতের ওপর সামানয আলোকপাত করা যেতে পারে। পার্কের মতে, উদ্ভিদ বা প্রাণীজগতের বাস্তববিদ্যার পর্যালোচনা পৌর সমাজতত্ত্বের (Sociology of the city) রূপরেখা প্রণয়নের কাজে পরিভাষা ও ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি সমৃদ্ধ উৎসক্ষেত্র হিসাবে কাজ করে।

৬৩.৩.১ সামাজিক এলাকার বিন্যাস

আমরা আগেই বলেছি যে, পার্কের মতের দ্বারা প্রভাবিত হলেও বার্জেস পার্কের চিন্তার সঙ্গে নিজের ধারণা যোগ করেছিলেন। নগরের কায়িক গঠন সম্পর্কে বার্জেসের যে ধারণা তার মূলে সক্রিয় ছিল আমেরিকার চিকাগো শহরের সামাজিক এলাকার (social areas) বসতিবিন্যাস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা। বার্জেসের মতে, একটি শহরের বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ভালো আবাসিক স্থান পাবার জন্য একটি অদৃশ্য প্রতিযোগিতা থাকে। এই প্রতিযোগিতার পেছনে আবার সক্রিয় থাকে ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য। জমির দাম ও আর্থিক সামর্থ্যের অদৃশ্য সম্পর্কের কারণে, দেখা যায়, বসতি গঠনের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। তাই, আমরা বলতে পারি, যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আবাসিক স্থান গড়ে তোলার মূলে থাকে ব্যক্তির অর্থনৈতিক বা আর্থিক সামর্থ্যের ভিন্নতা; এক্ষেত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর স্থানিক (local) প্রাধান্যকে আপেক্ষিকভাবে প্রতিযোগী শক্তি হিসাবে গণয করা হয়। তাই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রিয়াগত (functional) সম্পর্ককে মিথোজীবী (symbiotic) বলে মনে করা হয় এবং যখন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার প্রেক্ষিতে এইরকম সম্পর্ককে চিহ্নিত করা হয় তখন মানবিক বাস্তববিদা (Human Ecologist) তাকেই 'সম্প্রদায়' (communities) বলে নির্দেশ করেন বা 'প্রাকৃতিক এলাকা' (natural areas) বলেন। বার্জেসের (১৯৬৪) মতে, 'এলাকাভিত্তিক, এককগুলি, যাদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল—ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক—এগুলি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং বাস্তববিদ্যাগত প্রক্রিয়ার পরিকল্পনাহীন ক্রিয়াকলাপের ফলশ্রুতি। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক শক্তির এবং বিভিন্ন ধরনের এলাকার প্রতি গোষ্ঠী ও মানুষের আপেক্ষিক আকর্ষণের বিষয়টি পরিবর্তনের কারণে দেখা গেছে যে এই এলাকাগুলিও স্থানগত পরিবর্তন চাইছে। আমেরিকায় চিকাগো শহরে বসতিবিন্যাসের বিভিন্নতা ও পরিবর্তনের বিষয়ে বার্জেস যে মডেলের (model) কথা বলেছিলেন উপরিউক্ত সমস্ত বিষয় ও ধারণাকে এই মডেলের আলোচনার অন্তর্গত করা যায়।

৬৩.৪ এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ

পৌর সমাজতত্ত্ববিদ্ ই. ডব্লু. বার্জেসের নগরের কায়িক গঠন সম্পর্কে ধারণার ওপরে আলোকপাত করার পর এবার আমরা মূল আলোচনা অর্থাৎ বার্জেস প্রবর্তিত নগরায়ণের তত্ত্বের কথা বলব। আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে যুক্ত যে তিনজন সমাজতত্ত্ববিদ 'মানবিক বাস্তববিদ্যা' নিয়ে চর্চা করেছিলেন, তাঁদের নামের সঙ্গে আপনারা এর মধ্যেই পরিচিত হয়ে গেছেন। এঁরা হলেন যথাক্রমে পার্ক, ম্যাকেঞ্জি এবং বার্জেস। এঁরা তিনজনই বাস্তববিদ্যা (ecology) নিয়ে গভীরভাবে চর্চা করেছিলেন এবং তা পরবর্তীকালে মানবিক বাস্তববিদ্যার (Human Ecology) চর্চা ও গবেষণায় অনেক সাহায্য করেছিল, কিন্তু এদের মধ্যে ই. ডব্লু. বার্জেসই নগরের কায়িক গঠন সম্পর্কে ১৯২৫ সালে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ গড়ে তোলেন। এই মতবাদ 'এককেন্দ্রিক বলয় তত্ত্ব' হিসাবে পরিচিত। আপনারা আগেই জেনেছেন যে বার্জের মূলত আমেরিকার চিকাগো শহরের সামাজিক এলাকার বসতিবিন্যাসের ধারণার ভিত্তিতেই এই তত্ত্ব বা মতবাদ গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে নগরের কায়িক গঠনের বার্জেস-বর্ণিত প্যাটার্ন চিকাগো শহর ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতেই তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত পায়। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা সংগত যে বার্জেসের এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ পৌর সমাজতত্ত্ব এবং পৌর ভূগোল—এই দুটি লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই শহরের বা নগরের কায়িক গঠন সম্পর্কিত তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয় এবং গুরুত্ব পায়। এবার আমরা বার্জেসের মতবাদের মূল কথাগুলি জানব। তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্বে বার্জেস অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কোনো নগর বিকাশের ক্ষেত্রে এর কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা থেকে ক্রমশ বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা পর্যায়ক্রমে অনেকগুলি বলয় সৃষ্টি করে। এই বলয়গুলি হল এককেন্দ্রিক; তাই এই মতবাদ এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ নামে পরিচিত। বার্জেস তাঁর তত্ত্বের মোট পাঁচটি বলয়ের কথা বলেছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা একে একে এই পাঁচটি বলয়ের কথা জানব। তার আগে যে মডেলটির সাহায্যে বার্জেস তার তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন, সেই মডেলটির ছবি দেখে তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) মডেল—

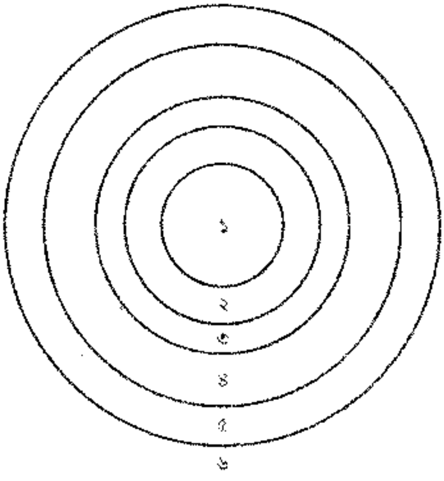

চিত্র-৬৩.১

চিকাগো শহরের সামাজিক এলাকার বিন্যাসের ভিত্তিতে বার্জেসের মডেল।

বলয় ১—লুপ বা কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা

বলয় ২—কলকারখানা এলাকা

বলয় ৩—পরিবর্তনশীল এলাকা

বলয় ৪—কর্মচারী আবাসস্থল

বলয় ৫—আবাসিক এলাকা

বলয় ৬—দৈনিক যাত্রী এলাকা

চিত্র অনুযায়ী (চিত্র ৬৩.১) এখানে ছবি বলয়ের কথা বলা হলেও বার্জেসের তত্ত্বে কলকারখানা এলাকাকে আলাদা বলয় হিসাবে স্বীকার করা হয়নি। তাই 'এককেন্দ্রিক বলয়' মতবাদে (১) কেন্দ্রীয় ব্যবসায়-কর্মের এলাকা, (২) পরিবর্তনশীল এলাকা, (৩) কর্মচারী আবাসস্থল, (৪) আবাসিক এলাকা এবং (৫) দৈনিক যাত্রী এলাকা—এই পাঁচটি বলয়ের কথাই বলা হয়েছে।

৬৩.৪.১ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা

এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ অনুসারে একটি নগর কেন্দ্রীয় স্থল থেকে ক্রমশ বাইরের দিকে বিস্তারলাভ করে। শহরের কেন্দ্রস্থলে থাকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা (বলয় : ১)। চিকাগো শহরে এই এলাকা লুপ (loop) নামে পরিচিত। এই এলাকায় থাকে দোকান, বড় বড় অফিস, ব্যাঙ্ক, হোটেল, থিয়েটার, মিউজিয়াম প্রভৃতি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকাকে আমরা বলতে পারি—এটি বাণিজ্যিক, সামাজিক এবং নাগরিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। অন্যান্য বলয়ভুক্ত এলাকা থেকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে মানুষকে এই এলাকায় আসতে হয়। এই এলাকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে এই এলাকায় অজস্র যানবাহন এবং উঁচু উঁচু বাণিজ্যিক অট্টালিকার সমাবেশ ঘটে। উদাহরণ হিসাবে আমরা ভারতবর্ষের অন্যতম মহানগরী কলকাতার কথাই বলতে পারি, কারণ আমরা এই মহানগরীতেই বাস করি। ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষ শাসন করতে সেই সময় থেকেই ডালহৌসী এলাকায় (বর্তমান বি. বা. দী বাগ বা বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহাকরণ, রাজভবন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, নিউ সেক্রেটারিয়েট, জি.পি.ও., পূর্ব রেল বিভাগের প্রধান দপ্তর, টেলিফোনের প্রধান দপ্তর ইত্যাদি নিয়ে এই এলাকা গড়ে উঠেছে। অনুরূপভাবে, আমরা যদি ভারতবর্ষের অন্যান্য বসতিবিন্যাস দেখি তাহলে প্রায় এইরকমই বিন্যাস দেখতে পাব। তবে শুধু মহানগর নয়, বড় বড় শহরগুলিতেও একই ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

৬৩.৪.২ পরিবর্তনশীল এলাকা

কেন্দ্রীয় ব্যবসায়-কর্মের এলাকাকে ঘিরে থাকে যে বলয়, তাকে পরিবর্তনশীল এলাকা (বলয় : ২) বলে। এই এলাকার বৈশিষ্ট হল যে এখানে রয়েছে জীর্ণ পুরোনো বাড়িঘর, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল লোকেদের বসতি। এই এলাকায় যারা বাস করে তাদের একটা বড় অংশ হচ্ছে অভিবাসী (immigrants)। কেন্দ্রীয় ব্যবসায়-কর্মের এলাকা থেকে সরে এসেছেন এমন ধরনের কম উচ্চতার বাণিজ্যিক অট্টালিকা ও হাল্কা ধরনের শিল্প এই এলাকায় দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে আপনাদের বলতে পারি ভারতবর্ষের কয়েকটি পুরোনো শহরের কথা। ভারতবর্ষে উত্তরপ্রদেশের কানুপুর, আহমেদাবাদ এবং পুরোনো দিল্লির প্রাচনী এলাকার ওপর যদি কোনো সমীক্ষা চালানো যায়, তাহলে এই এলাকার নির্দিষ্ট বৈশিষ্টগুলির প্রতিফলন হয়তো পরিলক্ষিত হতে পারে অর্থাৎ বহু পুরোনো অট্টালিকা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং শহরের একটি বিশেষ জায়গা জুড়ে আর্থিকভাবে দুর্বল লোকেদের বসতি এই শহরগুলিতে রয়েছে।

৬৩.৪.৩ কর্মচারী আবাসস্থল

পরিবর্তনশীল এলাকাকে বেষ্টন করে রয়েছে কর্মচারী আবাসস্থল (বলয় : ৩)। প্রধানত কলকারখানায় কাজ করেন যেসব শ্রমিকেরা এবং যারা পরিবর্তনশীল এলাকা থেকে পরিযান (migration) নিয়ে চলে এসেছে, তাঁরাই এই এলাকার বাসিন্দা। এঁরা কর্মস্থলের কাছাকাছি অর্থাৎ কলকারখানার কাছে বাস করতে চান, কারণ অনেকদূর থেকে কর্মস্থলে যাতায়াত করার মতো আর্থিক সংগতি এঁদের থাকে না।

৬৩.৪.৪ আবাসিক এলাকা

চতুর্থ বলয়টি হল আবাসিক এলাকা (বলয় : ৪)। শহরের প্রদান কেন্দ্র থেকে অনেকদূরে অবস্থান এই এলাকার, যেখানে বাস করেন এক পরিবার বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী। মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মানুষদের বাসগৃহের নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাঁদের বাড়িগুলি চিহ্নিত করা যায়।

৬৩.৪.৫ দৈনিক যাত্রী এলাকা

পঞ্চম বা শেষ বলয়টি হল দৈনিক যাত্রী এলাকা। শহরের উপকণ্ঠে এই এলাকার বাসিন্দারা প্রতিদিন কাজের প্রয়োজনে শহরে যাতায়াত করে এবং আর্থিক সংগতির দিক দিয়ে এঁরা উচ্চবিত্ত। দৈনিক যাত্রী এলাকা এবং আবাসিক এলাকার মাঝখানে থাকে "সবুজ বলয়" (Green Belt)—যা দুই বলয়কে আলাদা করে চিহ্নিত করেছে। দৈনিক যাত্রী এলাকায় (বলয় : ৫) কিছুটা গ্রাম্য পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যায়, যদিও শহরের প্রভাবে এই বৈশিষ্ট্য দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে অদূর ভবিষ্যতে শহরগুলিতে পরিণত হয়। সময়ের নিরিখে দৈনিক যাত্রী এলাকা থেকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকাতে পৌঁছাতে ৩০ থেকে ৬০ মিনিট সময় লাগে এবং শহরের কেন্দ্রীয় স্থানগুলির তুলনায় এখানে জমির দাম কম, যদিও তা দ্রুত ঊর্ধ্বগামী।

৬৩.৫ সারাংশ

এতক্ষণ আমরা এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ নিয়ে আলোচনা করলাম এবং শহরের কায়িক গঠন সম্পর্কে ই. ডব্লু. বার্জেসের অভিমত এবং তাঁর মডেল সম্পর্কে জানলাম। আমেরিকার চিকাগো শহরকে আদর্শ প্রকরণ (ideal type) হিসাবে ব্যবহার করে বার্জেস দেখিয়েছিল যে চিকাগো শহর তার কেন্দ্রস্থল থেকে কীভাবে ক্রমশ বাইরের দিকে বিস্তারলাভ করেছে এবং এইভাবে একে একে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি বলয় তৈরি হয়েছে। এগুলি আলাদাভাবে পাঁচটি ভিন্ন এলাকা বলে চিহ্নিত, যেমন—(১) কেন্দ্রীয় ব্যবসায়-কর্মের এলাকা, (২) পরিবর্তনশীল এলাকা, (৩) কর্মচারী আবাস এলাকা, (৪) মধ্যবিত্ত আবাসিক এলাকা, এবং (৫) দৈনিক যাত্রী এলাকা। বার্জেস প্রবর্তিত মতবাদ এবং ব্যবহৃত মডেল হতে বোঝা গেল যে (ক) যেসব ব্যক্তিদের আয় কম তারা কর্মস্থলের কাছাকাছি বাস করেন; (খ) মধ্যবিত্তরা কর্মস্থল থেকে যাতায়াত করা যায় এমন দূরত্বে বাস করেন এবং (গ) অর্থনৈতিকভাবে ধনী ব্যক্তিরা শহরের প্রান্তভাগে বাস করেন। বার্জেস নগরের কায়িক গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বসতিবিন্যাসের প্রেক্ষাপটটিও বিচার করেছেন। কারণ তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা শহরের অপেক্ষাকৃত ঘিঞ্জি ও নোংরা অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য হয় এবং সাধারণত এই ধরনের পরিবেশ শহরের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি হওয়ার জন্য এইসব ব্যক্তি এই অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হয়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা দেখব যে শহরের প্রান্তভাগে বিদেশির সংখ্যা, গরিব মানুষ ও অপরাধীর সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। আবার নগর বা শহরের

প্রান্তভাগের পরিবেশ সুস্থ জীবনযাপনের উপযোগী হওয়ার জন্যে এখানে সাধারণত ধনী ব্যক্তিরা কেন্দ্রীভূত হয়। আলোচনার শেষপর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বার্জেস প্রবর্তিত 'এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ' কেবলমাত্র ইউরোপের পশ্চিম ধাঁচের শহরগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যান্য মহাদেশের অন্য শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মার্কিনী শহরগুলির মতো suburbanization বা শহরতলীভবন প্রাচ্যের তথা তৃতীয় বিশ্বের শহরতলীগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় না। সেখানে downton-এর কোনো ধারণাও অপ্রযোজ্য। বরং কলকাতার বিত্তশালী অবাঙালি মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ কেন্দ্রীয় ব্যবসায়-কর্মের এলাকার আশেপাশে বসবাস করেন। আবার অনেক শহরেই, আমরা দেখেছি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হয়তো কাছে গড়ে উঠেছে বস্তি এলাকা। আর শিল্পের অবস্থান সম্পর্কেও বার্জেস তেমন আলোকপাত করেননি—এক্ষা তাঁর তত্ত্বের অসম্পূর্ণ দিক। যদিও পরিশেষে আমরা বলব যে শিল্পের অবস্থানগত কারণে খুব কমই একটি নিরবচ্ছিন্ন এককেন্দ্রিক বলয় তৈরি হয়। এখানে আমরা বার্জেসের অভিমতকে তুলে ধরতে পারি। বার্জেসের (১৯৫৫) মতে, ভৌগোলিক অবস্থানের এবং রাস্তা ও যানবাহনের সংযোগের কারণবশত শিল্প-বলয়ের বাহ্যিক আকারের পরিবর্তন হয়, এইজন্য এই ধরনের এককেন্দ্রিক বলয় তৈরি হয়নি।

৬৩.৬ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ	—	Concentric zone theory
মানবিক বাস্তববিদ্যা	—	Human ecology
বাস্তববিদ্যাগত পাঠ	—	Ecological studies
মিথোজীবী	—	Symbiotic
সামাজিক এলাকা	—	Social areas
সম্প্রদায়	—	Communities
কার্মিক	—	Functional
পৌর-ভূগোল	—	Urban geography
পৌর-সমাজতত্ত্ব	—	Urban sociology
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা	—	Central Business District of CBD
পরিবর্তনশীল এলাকা	—	Zone of transition
অভিবাসী	—	Immigrants
কর্মচারী আবাসস্থল	—	Zone of working men's homes
পরিযান	—	Migration
আবাসিক এলাকা	—	Residential zone
দৈনিক যাত্রী এলাকা	—	Commuters zone
সবুজ বলয়	—	Green Belt
আদর্শ প্রকরণ	—	Ideal type

৬৩.৭ অনুশীলনী

(১) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য আর কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।

(ক) এককেন্দ্রিক মতবাদের প্রবক্তা হচ্ছেন আর. ই. পার্ক।

(খ) কেন্দ্রীয় ব্যবসায়-কর্মের এলাকায় বাস করেন একক পরিবার বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী।

(গ) আবাসিক এলাকায় বাস করেন কলকারখানার কর্মরত শ্রমিকেরা।

(ঘ) দৈনিক যাত্রী এলাকা ও আবাসিক এলাকার মাঝখানে থাকে সবুজ বলয়।

(ঙ) পরিবর্তনশীল এলাকাকে বেষ্টন করে থাকে কর্মচারী আবাস এলাকা।

(চ) এককেন্দ্রিক মতবাদে পঞ্চম বা শেষ বলয়টি হল দৈনিক যাত্রী এলাকা।

(২) পাঁচ লাইনের দুটি টীকা লিখুন :

(ক) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা।

(খ) দৈনিক যাত্রী এলাকা।

(৩) ৮০-১০০টি শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন :

এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ।

(৪) আনুমানিক ৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন :

বার্জেস প্রবর্তিত এককেন্দ্রিক মতবাদের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৬৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বার্জেস, ই. ডব্লু. এবং বোগ, জে. সম্পাদিত—*কন্ট্রিবিউশন টু আরবান সোশিওলজি*, ইউনিভার্সিটি অফ চিকাগো প্রেস, ১৯৬৪।

(২) নকস্‌ পল—*আরবান সোস্যাল জিওগ্রাফি—অ্যান ইনট্রোডাকশন*, লংম্যান, ইউনাইটেড কিংডম, ১৯৮২।

(৩) নোলস্‌, আর. এবং ওয়ারিং, জে.—*ইকনমিক অ্যান্ড সোস্যাল জিওগ্রাফি*, ডব্লু. এইচ. অ্যালেন, লণ্ডন, ১৯৭৬।

(৪) মরিস্‌ আর. এন.—*আরবান সোশিওজলি*, জর্জ অ্যালেন এবং আনউইন লিমিটেড, লণ্ডন ১৯৬৮।

(৫) রিসম্যান, লিওনার্ড—*দা আরবান প্রসেস*, দ্য ফি প্রেস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৪।

একক ৬৪ ❑ বৃত্তকলা মতবাদ

গঠন

৬৪.১ উদ্দেশ্য

৬৪.২ প্রস্তাবনা

৬৪.৩ বৃত্তকলা মতবাদ

৬৪.৩.১ বৃত্তকলা মতবাদের প্রবক্তা

৬৪.৩.২ শহরের কায়িক গঠনের ক্ষেত্রে বৃত্তকলা মতবাদের প্রয়োগ

৬৪.৩.৩ বৃত্তকলা মতবাদের সমালোচনা

৬৪.৩.৪ এই মতবাদের অন্য প্রবক্তা

৬৪.৪ সারাংশ

৬৪.৫ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

৬৪.৬ অনুশীলনী

৬৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৬৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল নগরায়ণের একটি বিশেষ মতবাদকে বর্ণনা করে। এই এককটির পাঠ শেষ হলে আপনি নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন।

- বৃত্তকলা মতবাদ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা।
- বৃত্তকলা মতবাদের অর্থ ও কেন এই তত্ত্বকে বৃত্তকলা বলা হয় তা ব্যাখ্যা করা।
- নগরের কায়িক গঠনের আলোচ্য মতবাদের প্রয়োগ যথার্থ কিনা তা বিচার করা।
- বৃত্তকলা মতবাদের ভালোমন্দ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা।

৬৪.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় এককে আমরা শহরের বিকাশ ও কায়িক গঠনের ব্যাখ্যায় বার্জেস প্রবর্তিত এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ সম্পর্কে জেনেছি। আলোচ্য এককে নগরায়ণে তৃতীয় তত্ত্ব অর্থাৎ বৃত্তকলা মতবাদ সম্পর্কে জানব এবং দেখব, শহরের বিকাশ ও কায়িক গঠনের বিশ্লেষণে আলোচ্য মতবাদ কতখানি সফল।

৬৪.৩ বৃত্তকলা মতবাদ

আগেই বলেছি, আমরা দ্বিতীয় এককে পৌর সমাজতত্ত্ববিদ্ ই. ডব্লু. বার্জেসের এককেন্দ্রিক বলয় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে বার্জেস নগরের বিকাশ ও কায়িক গঠনের

ক্ষেত্রে তার তত্ত্বের মাধ্যমে আধুনিক নগরের বিস্তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং বার্জেসের চোখে আদর্শ শহর ছিল আমেরিকার চিকাগো শহর। উপরিউক্ত এককটির পরিশেষে আপনারা দেখেছেন যে এককেন্দ্রিক তত্ত্বের সমালোচনা করে বলা হয়েছে, বার্জেসের তত্ত্ব পশ্চিমী শহরগুলির ক্ষেত্রেই বেশিমাত্রায় প্রযোজ্য এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই তত্ত্বের ধারণা তেমন খাটে না। ফলে বার্জেসের তত্ত্ব পৃথিবীর সব দেশের বড় বড় নগরের কায়িক গঠনকে ব্যাখ্যা করতে তেমন সফল হয়নি। তাই সমাজতত্ত্ববিদরা নানাধরনের ভাবনাচিন্তা করা শুরু করেন এবং এমন একটি তত্ত্বের উদ্ভাবন করতে প্রয়াসী হন যা নগরের বিকাশ ও তার কায়িক গঠনকে সব দেশের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করতে সফল হবে। এটা বললে ভুল হবে না যে মতবাদ সমাজতত্ত্ববিদদের ভাবনাচিন্তায় ফলশ্রুতি।

৬৪.৩.১ বৃত্তকলা মতবাদের প্রবক্তা

১৯৩৯ সালে হোমার হাইট (Homer Hoyt) ও এম. আর. ডেভি (M. R. Davie) বৃত্তকলা মতবাদ বা সেক্টর থিওরির প্রস্তাব দেন। এককেন্দ্রিক বলয় তত্ত্বের প্রয়োগের দ্বারা নগরের কায়িক গঠনকে বোঝানোর যে অসম্পূর্ণতা ছিল তা দূর করার জন্যই হাইট এবং ডেভি এই তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন। এখন আমাদের জানা উচিত এঁদের প্রস্তাবিত তত্ত্বকে কেন বৃত্তকলা বলা হয়। আসলে হাইট একটি শহরকে বৃত্ত কল্পনা করেছেন এবং বলেছেন কেন্দ্র থেকে প্রসারিত বৃত্ত দ্বারা শহর বা নগর ক্রমশ কীলকাকারের (wedge like) নানা কলায় বিভাজিত হয়ে পড়ে; তাই এই তত্ত্ব 'বৃত্তকলা মতবাদ' নামে পরিচিত। প্রস্তাবিত তত্ত্বকে বোঝানোর জন্য হাইট একটি মডেলেরও উল্লেখ করেছেন। আমরা এখন এই মডেলের ছবি দেখলে তত্ত্বটির অন্তর্নিহিত অর্থগুলি অনুধাবন করতে পারব এবং এই মডেলে যে এলাকাগুলি হাইট (Hoyt) চিহ্নিত করেছেন সেগুলি সম্পর্কেও আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে।

মডেল :

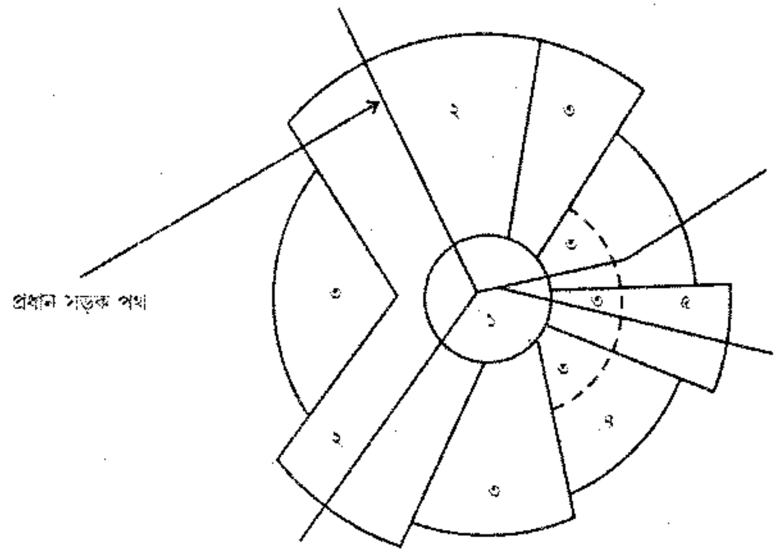

চিত্র-৬৪.১

১। কেন্দ্রীয় ব্যবসায়-কর্মের এলাকা

২। পাইকারি ও হাল্কা উৎপাদন

৩। নিম্নবিত্ত বসতি

৪। মধ্যবিত্ত বসতি

৫। উচ্চবিত্ত বসতি

৬৪.৩.২ শহরের কায়িক গঠনের ক্ষেত্রে বৃত্তকলা মতবাদের প্রয়োগ

বৃত্তকলা মতবাদ অনুসারে, নগরের বিকাশ ও জমি ব্যবহারে প্যাটার্ন বা ধাঁচ প্রভাবিত হয় নগরের থেকে বাইরের দিকে প্রধান সড়কপথের অবস্থানের দ্বারা। এর ফলে নগরের একটি তারার মতো (star shaped) কায়িক প্যাটার্ন তৈরি হয়। হাইট বলেছেন, নগরের বা শহরের কোনো অঞ্চলে যদি উচ্চভাড়া বিশিষ্ট বসতি গড়ে ওঠে তাহলে তা শহর বা নগরের বাইরের দিকে পরিযান (migration) গ্রহণ করবে এবং বাইরের দিকে গড়ে উঠবে কীলকের মতো ধাঁচে (pattern) নতুন বসতি অঞ্চল। অনুরূপভাবে, নিম্নভাড়া বিশিষ্ট বসতিগুলোও নগরের অন্য দিকে বিস্তৃতি লাভ করবে। এই যে দুই ধরনের বিপরীত ভাড়া বিশিষ্ট বসতি গড়ে উঠবে শহরের কেন্দ্রস্থলে—তা ক্রমশ নগরের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে স্থায়িত্ব লাভ করবে। আসলে হোমার হাইট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরের বসতিবিন্যাসের প্যাটার্ন বা ধাঁচ থেকে এই ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। হাইটের বৃত্তকলা মতবাদে যে মডেলটি গ্রহণ করা হয়েছে তার মূলে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরের বসতিবিন্যাস। হাইটের মডেলের যে পাঁচটি এলাকা চিহ্নিত হয়েছে সেগুলি হল—(১) কেন্দ্রীয় ব্যবসা-কর্মের এলাকা, (২) পাইকারি ও হাল্কা উৎপাদন হয় এমন এলাকা, (৩) নিম্নবিত্ত লোকেদের বসতি, (৪) মধ্যবিত্ত লোকেদের বসতি এবং (৫) উচ্চবিত্ত লোকেদের বসতি। নগরের কেন্দ্রস্থল থেকে কীলকগুলির মধ্যে প্রসারিত হয়েছে প্রধান সড়কপথ।

৬৪.৩.৩ বৃত্তকলা মতবাদের সমালোচনা

হাইটের বৃত্তকলা মতবাদ নগরের বিকাশ ও কায়িক গঠন বা ভূমি-ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করতে কতটা উপযোগী, এখন সেই ব্যাপারে আমরা অল্প পরিসরে আলোচনা করতে পারি। এই এককের শুরুতেই আমরা বলেছি এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ সব শহরের বিকাশ ও কায়িক গঠন বোঝাবার ক্ষেত্রে তত বেশি সফল নয় বলে সমাজতত্ত্ববিদরা নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন এবং তারই ফলশ্রুতি হাইটের বৃত্তকলা মতবাদ। আলোচনার পর আমরা বলতে পারি, নগরের কীলক-সদৃশ (wedge like) প্রসারণের মতবাদ পূর্ববর্তী এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদের চেয়ে কার্যকরী, কারণ এই তত্ত্বের মাধ্যমে নগরের বিস্তারের দিক ও দূরত্ব—এই দুটি বিষয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া নগরের বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবহনব্যবস্থার মাধ্যমে সড়ক যোগাযোগের মতো প্রয়োজনীয় বিষয়টিকেই স্বীকার করা হয়েছে। কারণ হাইট তাঁর তত্ত্বে বলেছেন যে উচ্চভাড়া বিশিষ্ট বসতিগুলো প্রধান প্রধান সড়কপথ ধরেই প্রসারলাভ করে।

৬৪.৩.৪ এই মতবাদের অন্য প্রবক্তা

কোনো বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য যে তত্ত্ব বা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তার ভালো ও খারাপ—দুটি দিকই আছে। কোনো বিষয় সম্পর্কে গৃহীত দুটি মতবাদকে যোগ করে যদি তৃতীয় বা নতুন কোনো তত্ত্ব চালু

করা যায় তাহলে দুটি মতবাদের ভালো দিকগুলি এই তৃতীয় বা নতুন তত্ত্বে স্থান পেতে পারে। এমনই চেষ্টা করেছিলেন বৃত্তকলা মতবাদের তৃতীয় প্রবক্তা পি. মান (P. Mann)। মান এককেন্দ্রিক বলয় তত্ত্ব ও বৃত্তকলা মতবাদের মূল উপাদানগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। আসলে, ব্রিটিশ নগরের অনুমিত (hypothetical) গঠনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মান তাঁর মডেলে চারটি বৃত্তকলা (ক-ঘ) যোগ করেছেন। তাঁর মতে, এই বিভিন্ন বৃত্তকলায় এককেন্দ্রিক বিকাশ বলয় সহাবস্থান করতে পারে। হাইটের মডেলে আমরা দেখেছি পাঁচটি এলাকা চিহ্নিত হয়েছে। মানের তত্ত্বে যে মডেল ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বার্জেস প্রবর্তিত এককেন্দ্রিক বলয় তত্ত্বের পাঁচটি এলাকার অতিরিক্ত চারটি এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলি হল—

(১) মধ্যবিত্ত বসতি এলাকা,

(২) নিম্নমধ্যবিত্ত বসতি এলাকা,

(৩) কর্মচারী শ্রেণির বসতি এলাকা,

(৪) শিল্প-কারখানার শ্রমিক এবং দরিদ্র শ্রমিকদের বসতি এলাকা।

এবার আমরা পি. মানের প্রস্তাবিত মডেলটির ছবি দেখে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারি।

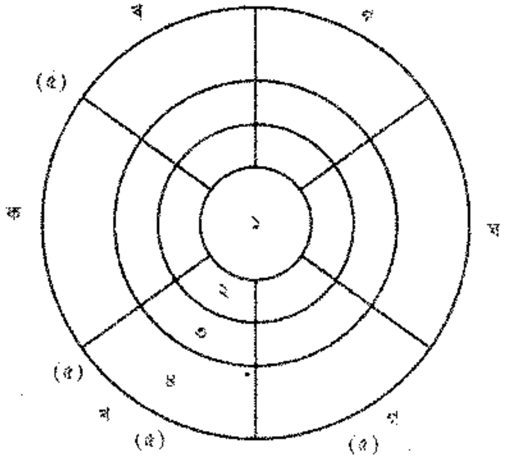

চিত্র-৬৪.২

মডেল-২

ক. মধ্যবিত্ত বসতি এলাকা।

খ. নিম্নমধ্যবিত্ত বসতি এলাকা।

গ. কর্মচারী শ্রেণির বসতি এলাকা।

ঘ. শিল্প-কারখানার শ্রমিক ও দরিদ্র শ্রমিকদের বসতি এলাকা।

১. কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা।

২. পরিবর্তনশীল এলাকা।

৩. 'গ' ও 'ঘ' বৃত্তকলাধীন ছোট ছোট বাড়ি সমন্বিত এলাকা; উপবিধি অনুযায়ী 'খ' বৃত্তকলায় বড় বাড়ি; বড় পুরানো বাড়ি 'খ' বৃত্তকলায়।

৪. ১৯১৮ সালের পরবর্তী বসতি এলাকা, তার সঙ্গে নগরের সীমানার দিকে ১৯৪৫ সালের পরবর্তী বাড়ি।

৫. যাতাযাতের দূরত্বে অবস্থিত আবাসিক শহরতলি।

৬৪.৪ সারাংশ

এই এককে আমরা সমাজতত্ত্ববিদ হোমার হাইটের বৃত্তকলা মতবাদ সম্পর্কে জানলাম। এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ যেহেতু একটি বিশেষ শহরের 'আদর্শ রূপ' এবং এই তত্ত্ব যে-কোনো শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তাই নগরের বিকাশ, তার কায়িক গঠন এবং ভূমি-ব্যবহারের বিষয়গুলিকে মনে রেখে হাইট ও ডিভি তাঁদের 'বৃত্তকলা মতবাদ' গড়ে তোলেন। এই তত্ত্ব প্রবর্তন ডেভি সহযোগী থাকলেও পৌর ভূগোল ও পৌর সমাজতত্ত্বে নগরায়ণের তত্ত্বের আলোচনার বৃত্তকলা মতবাদে হোমার হাইটের নামটিই এককভাবে উচ্চারিত হয়। আমরা হাইটের তত্ত্ব নিয়ে আগের আলোচনাতে দেখেছি, নগরের কায়িক গঠনের (urbanstructure) ধাঁচ কেন্দ্রীয় স্থান থেকে প্রধান সড়কপথের অবস্থান অনুযায়ী বাইরের দিকে গড়ে ওঠে এবং এইভাবে নগরের একটি তারকাকার (star-shaped) ধাঁচ তৈরি হয়। নগরের এই প্যাটার্ন বা ধাঁচ নিশ্চিতভাবেই বার্জেসের এককেন্দ্রিক মতবাদের তুলনায় অনেক বেশি যুক্তিসংগত এবং গ্রহণযোগ্য। হোমার হাইটের মতানুযায়ী যদি নগরের কোনো অঞ্চলে উচ্চভাড়া বিশিষ্ট বসতি গড়ে ওঠে এবং তা নগরের বাইরের দিকে পরিযান নেয় তাহলে নগরের বাইরের দিকে নিশ্চিতভাবে গড়ে উঠবে নতুন বসতি অঞ্চল। ঠিক একইভাবে, নিম্নভাড়া বিশিষ্ট বসতিগুলোও নগরের অন্যদিকে প্রসারলাভ করবে। এই হল বৃত্তকলা মতবাদ। পরিশেষে উল্লেখ করা দরকার যে, আলোচ্য তত্ত্ব অর্থাৎ বৃত্তকলা তত্ত্ব ও পূর্বোক্ত এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদের দুটি থেকেই গ্রহণযোগ্য উপাদান আহরণ করে পি. মান গড়ে তোলেন তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব—যা তাঁর অনুমিত ব্রিটিশনগরের কায়িক গঠনের ব্যাখ্যা দেয়। এই তত্ত্বে মান এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদের মডেলের উল্লেখিত পাঁচটি এলাকার অতিরিক্ত চারটি এলাকা (ক-ঘ) যোগ করেন।

৬৪.৫ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

বৃত্তকলা মতবাদ	—	Sector theory
কীলক-সদৃশ	—	Wedge-like
আদর্শ প্রকরণ/রূপ	—	Ideal type
ধাঁচ	—	Pattern
কেন্দ্রীয় ব্যবসায়-কর্মের এলাকা	—	Central Business district
পাইকারি ও হাল্কা উৎপাদন	—	Whole Saling & light manufacturing
নিম্নবিত্ত বসতি	—	Low class residential

মধ্যবিত্ত বসতি	—	Medium class residential
উচ্চবিত্ত বসতি	—	High class residential
অনুমিত	—	Hypothetical
পরিবর্তনশীল এলাকা	—	Zone of transition
উপবিধি	—	Bye-law
আবাসিক শহরতলি	—	Dormitory town

৬৪.৬ অনুশীলনী

(১) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য আর কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।

(ক) বৃত্তকলা মতবাদের প্রধান প্রবক্তা পি. মান।

(খ) হোমার হাইট একটি নগরকে বৃত্ত হিসাবে কল্পনা করেছেন।

(গ) হাইট প্রবর্তিত মডেলে ছ'টি এলাকা চিহ্নিত হয়েছে।

(ঘ) এম. আর. ডেভি এককেন্দ্রিক বলয় তত্ত্ব ও বৃত্তকলা তত্ত্বের উপাদানগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন।

(ঙ) হোমার হাইট তাঁর বৃত্তকলা তত্ত্বের ধারণা পেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরের বসতিবিন্যাসের ধাঁচ থেকে।

(২) পাঁচ লাইনের দুটি টীকা লিখুন :

(ক) পি. মান।

(খ) হোমার হাইটের মডেলের চিহ্নিত এলাকাগুলি।

(৩) আনুমানিক ৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন :

(ক) হাইট ও পি. মানের বৃত্তকলা তত্ত্বে ব্যবহৃত মডেলের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

(৪) ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন :

বৃত্তকলা মতবাদ।

৬৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) মণ্ডল, আর. বি.—*আরবান জিওগ্রাফি—এ টেক্সবুক্‌* কনসেপ্ট পাবলিশিং, নিউ দিল্লি, ২০০০।

(২) নেলস্‌, এ. অ্যান্ড ঈশ্বরন—*আরবান সোসিওলজি*, ১৯২২।

(৩) দাশগুপ্ত, সমীর—*অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৩।

(৪) নোলস্‌, আর. অ্যান্ড ওয়ারিং, জে.—*ইকনমিক অ্যান্ড সোস্যাল জিওগ্রাফি*, ডব্লু. এইচ. অ্যালেন, লন্ডন, ১৯৭৬।

একক ৬৫ ❑ বহুকেন্দ্রিক মতবাদ

গঠন

৬৫.১ উদ্দেশ্য

৬৫.২ প্রস্তাবনা

৬৫.৩ বহুকেন্দ্রিক মতবাদের প্রবক্তা

৬৫.৩.১ বহুকেন্দ্রিক মতবাদ

৬৫.৩.২ বিশেষীকৃত এলাকা

৬৫.৩.৩ উপযোগিতা

৬৫.৩.৪ এই মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা

৬৫.৪ সারাংশ

৬৫.৫ সামগ্রিক উপসংহার

৬৫.৬ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

৬৫.৭ অনুশীলনী

৬৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৬৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হচ্ছে নগরায়ণের অন্য একটি তত্ত্বকে উপস্থাপিত করা এবং নগরের বিকাশের ধাঁচকে এই তত্ত্বের মাধ্যমে বর্ণনা করা। এই একক অধ্যয়নের পর, আশা করা যায়, আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবেন—

- বহুকেন্দ্রিক মতবাদ সম্পর্কে ধারণা।
- বহুকেন্দ্রিক মতবাদের প্রবক্তার সম্পর্কে জানা।
- বহুকেন্দ্রিক মতবাদ নগরবিকাশের ধাঁচকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছে, তা জানা।

৬৫.২ প্রস্তাবনা

আমরা আগের একক দুটিতে (যথাক্রমে একক ৬৩ এবং একক ৬৪) নগরের বিকাশ ও কায়িক গঠন সংক্রান্ত দুটি মতাবদ যেমন, এককেন্দ্রিক বলয় তত্ত্ব এবং বৃত্তকলা তত্ত্ব সম্পর্কে জেনেছি। এককেন্দ্রিক বলয় তত্ত্ব এবং বৃত্তকলা তত্ত্ব---দুটিই ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযোগী; এবং স্বচ্ছ ও সাবলীলভাবে আমরা তত্ত্বদুটিকে বর্ণনার মাধ্যমে অন্যের কাছে বোধগম্য করে তুলতে পারি। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, নগরের ভূমি-ব্যবহারের চরিত্রটি অত্যন্ত জটিল। নগরে ভূমি-ব্যবহারের এই প্রকৃতিগত জটিলতা দূর করার জন্য দুজন সমাজতত্ত্ববিদ বিভিন্ন ধরনের নগরের প্যাটার্ন বা ধাঁচের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এমন একটি মতবাদের কথা বলেন। আমরা আলোচ্য এককে এই মতবাদটির প্রবক্তা এবং মতবাদের মূল বিষয়কে উপস্থাপিত করব।

৬৫.৩ বহুকেন্দ্রিক মতবাদের প্রবক্তা

নগরের বিভিন্ন ধরনের ধাঁচ বা প্যাটার্নকে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং নগরের ভূমি-ব্যবহারের (land-use) বিষয়টিকে তুলে ধরতে সক্ষম এমন একটি মতবাদ—যার কথা আমরা ওপরের আলোচনায় বললাম, মূলত সেই তত্ত্বের উদ্ভাবক আর. ডি. ম্যাকেঞ্জি (R. D. Mckenzie) নামে একজন সমাজতত্ত্ববিদ্। নগরায়ণের দ্বিতীয় তত্ত্ব অর্থাৎ এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদ আলোচনার সময় আমরা এই সমাজতত্ত্ববিদের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ইনি আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ম্যাকেঞ্জি ১৯৩৩ সালে নগরে ভূমি-ব্যবহার সম্পর্কে একটি অনুমিত (hypothetical) ধাঁচ বা প্যাটার্নের কথা বলেন। তাঁর সেই চিন্তাধারাকে ১৯৪৫ সালে দুজন পৌর সমাজতত্ত্ববিদ্ তাত্ত্বিক রূপ দেয়, তাঁরা হলেন সি. ডি. হ্যারিস্ (C. D. Harris) এবং ই. এল. উলম্যান (E. L. Ullman)। এঁদের প্রবর্তিত মতবাদকে বলা হয় বহুকেন্দ্রিক মতবাদ (Multi-Nuclei theory)।

৬৫.৩.১ বহুকেন্দ্রিক মতবাদ

এই মতবাদ অনুযায়ী অধিকাংশ বড় বড় নগরে ভূমি-ব্যবহারের ধাঁচ (pattern of land-use) একটি কেন্দ্রের বদলে অনেকগুলি আলাদা আলাদা কেন্দ্রকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। তাই একই নগরের মধ্যে বন্দর, রেলকেন্দ্র, খনি, শিল্প কিংবা পৌরবসতি প্রভৃতি কেন্দ্রগুলি থাকতে পারে। এককেন্দ্রিক বলয় তত্ত্ব কিংবা বৃত্তকলা মতবাদে বর্ণিত একটিমাত্র কেন্দ্রের বদলে এই মতবাদে বলা হয়েছে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র (neclei) বা কেন্দ্রমণ্ডলীর কথা, যেগুলিকে আশ্রয় করে বড় বড় শহর ভূমি-ব্যবহারের ধাঁচ গড়ে ওঠে। নগরে এই বিভিন্ন কেন্দ্র-নির্ভর ভূমি-ব্যবহারের বিভিন্ন ধরনের যৌগের ফলে নগরে একটি কোষসম্বলিত কায়িক গঠন (cellular structure) তৈরি হয়। পৌর সমাজতত্ত্ববিদ্ ই. ই. বারজেল (E. E. Bergel) [১৯৫৫] মন্তব্য করেছেন যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট নগরে বিভিন্ন ধরনের ভূমি-ব্যবহারের ধাঁচ বেশিমাত্রায় নির্ভর করে ঐ নগরের অবস্থান এবং নগরের ইতিহাসের ওপর। বহুকেন্দ্রিক তত্ত্ব যে-কোনো নগরের উপযোগী পৌর কায়িক গঠনের একটিমাত্র সরল বা সহজ মডেলকে উপস্থাপিত করে না, বরং বেশিরভাগ নগরের ভূমি-ব্যবহারের ধাঁচের ক্ষেত্রে দশটি আলাদা আলাদা কেন্দ্রের কথা বলা হয়েছে, যেমন—

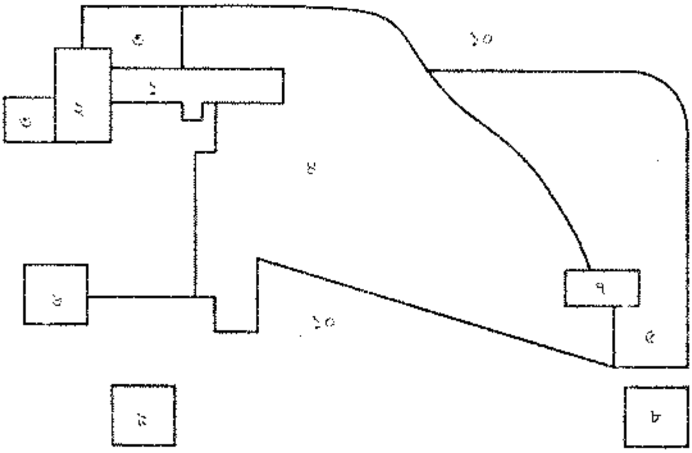

চিত্র-৬৫.১ : বহুকেন্দ্রিক মতবাদ—হ্যারিস ও উলম্যানের মডেল

7

১. কেন্দ্রীয় ব্যবসায়-কর্মের এলাকা
২. পাইকারি ও হাল্কা উৎপাদন এলাকা
৩. নিম্নবিত্ত বসতি
৪. মধ্যবিত্ত বসতি
৫. উচ্চবিত্ত বসতি
৬. ভারী উৎপাদন এলাকা
৭. প্রান্তিক বাণিজ্য এলাকা
৮. আবাসিক শহরতলি
৯. শিল্প শহরতলি
১০. দৈনিক যাত্রী অঞ্চল

৬৫.৩.২ বিশেষীকৃত এলাকা

বহুকেন্দ্রিক তত্ত্ব অনুসারে, নগর কতকগুলি বিশেষীকৃত এলাকায় বিভক্ত থাকে। উদাহরণ হিসাবে লা যায়, কয়েকটি কাজ যেমন খুচরা জিনিসপত্র বিক্রয় এমন এলাকায় গড়ে ওঠে, যেখানে মানুষ সহজেই যাতাযাত করতে পারে আবার, কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে আশ্রয় করে কোনো কোনো কাজ এমনভাবে গড়ে ওঠে, যেখানে এই কাজ আর্থিকভাবে লাভজনক হয়। এভাবেই নগরে গড়ে ওঠে, কেন্দ্রীয় ব্যবসায়-কর্মের এলাকা, পাইকারি ও হাল্কা উৎপাদন, ভারী শিল্প এলাকা, যদিও এই তিন ধরনের কাজ একে অন্যের আলাদা নয়।

৬৫.৩.৩ উপযোগিতা

পৌর সমাজতত্ত্বের আগের আলাচনায় এবং নগরের বিকাশ ও ভূমি-ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন পৌর সমাজতত্ত্ববিদদের অভিমত আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে নগরের বিশেষ কিছু কাজ মানুষের বসতি এলাকা থেকে দূরে গড়ে ওঠা সংগত, কারণ বসতি এলাকার মধ্যে কলকারখানা থাকলে তা বসতি এলাকার পরিবেশের ক্ষতি করে এবং তা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকারক। তাছাড়া, ভারী শিল্পকেন্দ্রগুলির নগরের মধ্যে অবস্থান হওয়া উচিত, যাতে রেলপথে ও জলপথে অন্য স্থানের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ রাখা যায়। তাই এই শিল্পকেন্দ্রগুলি রেলপথ ও নদীর কাছাকাছি গড়ে ওঠা সংগত। আবার, পোশাকের মতো হাল্কা শিল্প নগরের কেন্দ্রে গড়ে উঠলে ঐ শিল্প লাভবান হতে পারে। আবার, নগরে কিছু স্থান আছে যেগুলিতে লোক বাস করার জন্য বেশি টাকার ভাড়ার বাড়ি খোঁজে ও থাকতে চায়—এই ধরনের স্থান অভিজাত এলাকায় হওয়া উচিত। হ্যারিস ও উলম্যানের মতে, এই ধরনের কাজ নগরের কেন্দ্রে গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হবে এবং তা ক্রমশ বিস্তারলাভ করলে একটি পৃথক ভূমি-ব্যবহার অঞ্চলে গড়ে উঠবে। এই মতবাদের উপযোগিতা আলোচনায় আমরা অবশ্যই উল্লেখ করব যে, যে সমস্ত নগর প্রসারিত হতে গিয়ে অনেক ছোট শহর ও গ্রামকে গ্রাস করেছে, সেখানেই হ্যারিস ও উলম্যানের মডেল বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য চিত্র ৬৫.১)। এইসব নগরের প্রতিটি পৌর কুণ্ডলায়নের (urban agglomeration) মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে। এশিয়া এবং আফ্রিকার অনেক ঔপনিবেশিক নগরেও এই মডেল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পরিশেষে, আপনাদের বলতে চাই যে বহুকেন্দ্রিক মতবাদ দ্বারা বিশেষ করে ভারতীয় শহরগুলি গড়ন ব্যাখ্যা করা যায়। এই শহরগুলির বিকাশলাভের নির্দিষ্ট সময় আছে এবং এগুলি বিকাশলাভের ক্ষেত্রে শহরের নতুন ও পুরোনো ভাগগুলিকে প্রায়ই সমন্বিত করেছে।

৬৫.৩.৪ এই মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা

এই পর্যন্ত আলোচনায় আপনারা বহুকেন্দ্রিক মতবাদের মূল বিষয়গুলি জানলেন এবং শহরের কায়িক গঠনের ক্ষেত্রে ভূমি-ব্যবহার সম্পর্কে এই তত্ত্বের উপযোগিতা সম্পর্কেও অবগত হলেন। এখন আমরা এই মতবাদের ভালো দিক নিয়ে সামান্য আলোচনা করতে পারি। আমরা জানি, প্রত্যেকটি শহরের একটি নিজস্ব কায়িক গঠন (structure) আছে এবং নগর সবসময়েই মূল কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে বিস্তারলাভ করে। এককেন্দ্রিক বলয় তত্ত্ব এবং বৃত্তকলা তত্ত্বে নগরের এই কেন্দ্র থেকে বাইরে দিকে বিস্তারলাভের প্রবণতা বিশ্লেষিত হলেও, নগরের ভূমি-ব্যবহারের ধাঁচকে এই দুটি তত্ত্ব বিশেদভাবে বর্ণনা করতে পারেনি। সেক্ষেত্রে হ্যারিস ও উলম্যানের "বহুকেন্দ্রিক মতবাদ" একই নগরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বিভিন্নভাবে ভূমি-ব্যবহারকে বর্ণনা করেছে এবং এই তত্ত্ব বর্ণিত মডেল (চিত্র-৬৫.১) বিভিন্ন ধরনের শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৬৫.৪ সারাংশ

এই এককে এতক্ষণ আমরা বহুকেন্দ্রিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করলাম। ১৯৩৩ সালে আর. ডি. ম্যাকেঞ্জি প্রথম এই তত্ত্বের কথা বলেন এবং তাঁর সেই ভাবনাকে তাত্ত্বিক রূপ দেন হ্যারিস ও উলম্যান। এই মতবাদ অনুসারে, অধিকাংশ বড় বড় শহরে এবং নগরে ভূমি-ব্যবহারের ধাঁচ একটি কেন্দ্রের বদলে অনেকগুলি আলাদা আলাদা কেন্দ্রকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, ফলত একটি নগরের মধ্যে বন্দর, রেলকেন্দ্র, খনি, শিল্প ইত্যাদি কেন্দ্রগুলো থাকতে পারে। বিষয়টিকে হ্যারিস ও উলম্যান একটি মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এবং এই মডেলে তাঁরা দশটি এলাকা চিহ্নিত করেছেন। এই দশটি এলাকা হল—কেন্দ্রীয় ব্যবসায়-কর্মের এলাকা, পাইকারি ও হাল্কা উৎপাদন এলাকা, নিম্নবিত্ত বসতি, মধ্যবিত্ত বসতি, উচ্চবিত্ত বসতি, ভারী উৎপাদন এলাকা, প্রান্তিক বাণিজ্য এলাকা, আবাসিক শহরতলি, শিল্প শহরতলি এবং দৈনিক যাত্রী অঞ্চল। তাছাড়া, এই তত্ত্ব অনুসারে নগর কতকগুলি বিশেষীকৃত এলাকায় বিভক্ত থাকে। এই মতবাদের উপযোগিতা হিসাবে বলা যায়, যে সমস্ত নগর প্রসারিত হয়ে গিয়ে অনেক ছোট ছোট শহর ও গ্রামকে গ্রাস করেছে, হ্যারিস ও উলম্যানের বর্ণিত মডেল সেখানেই বিশেষ প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়েছে। এছাড়া, বহুকেন্দ্রিক মতবাদ দিয়ে এশিয়া মহাদেশের অনেক নগরের বিকাশলাভের প্যাটার্ন, বিশেষ করে, ভারতীয় শহরগুলির বিকাশলাভের ধাঁচকে বর্ণনা করা যায়।

৬৫.৫ সামগ্রিক উপসংহার

আমরা পূর্বে আলোচিত চারটি এককে নগরায়ণ সম্পর্কিত আদর্শস্থাপনকারী এবং কার্যকারণভিত্তিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে নগরায়ণের প্রক্রিয়াকে যেমন

কোনো আদর্শস্থাপনকারী তত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তেমনিই কোনো সীমিত হেতু-নির্ভর কার্যকারণভিত্তিক তত্ত্বের দ্বারাও তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে কোনো নগরের কায়িক গঠন কেবল বহুসংখ্যক হেতু দ্বারা নয়, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই কেন কোনো শহর এককেন্দ্রিক বলয়কে ধরে, কয়েকটি বৃত্তকলাকে আশ্রয় করে, একটি কেন্দ্রীয় স্থানকে আবর্তন করে অথবা বহুকেন্দ্রিকভাবে গড়ে ওঠে তার উৎস খুঁজতে হবে স্থানীয় ভূগোল, অতীত এবং আপেক্ষিকভাবে সাম্প্রতিক ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির মধ্যে। পিটার হল তাঁর *Urban Regional Planning* (পেঙ্গুইন, ১৯৭০) বইতে বলেছেন যে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডের নগরায়ণ প্রক্রিয়া অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আমাদের দেশে কেন নগরায়ণ প্রক্রিয়া আধিপত্যস্থাপনকারী (primate), মাথাভারী (macrocephalous) নগরসমূহের দ্বারা প্রভাবিত তার কারণগুলি যেমন অর্থনৈতিক, তেমনি রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি। কলকাতা শহর কেন তার অস্তিত্বের অধিকাংশ সময় জুড়ে উত্তর-দক্ষিণে বেড়েছে এবং এককেন্দ্রিক থেকে ধীরে ধীরে বহুকেন্দ্রিক (Polynuclear) এবং পূর্বগামী হয়ে উঠেছে তার সমাধান করছেন এবং করবেন সমাজতত্ত্ববিদরা এবং মানবকি বাস্তব্যবাদীরা। কিন্তু পূর্বোক্ত সমাজতত্ত্ববিদদের কৃতিত্ব হল তাঁরা যেমন আমাদের কয়েকটি আদর্শ মূলসূত্র দিয়েছেন তেমনই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

৬৫.৬ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

পৌর সমাজতত্ত্ববিদ	—	Urban sociologist
বহুকেন্দ্রিক মতবাদ	—	Multi-Nuclei theory
কোষসম্বলিত কায়িক গঠন	—	Cellular structure
পৌরকুণ্ডলায়ন	—	Urban agglomeration
বিশেষীকৃত এলাকা	—	Specialised area
খুচরা বিক্রয়	—	Retailing
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা	—	Central Business District (CBD)
পাইকারি ও হাল্কা উৎপাদন	—	Wholesale and light manufacturing
নিম্নবিত্ত বসতি	—	Low class residential
মধ্যবিত্ত বসতি	—	Medium class residential
উচ্চবিত্ত বসতি	—	High class residential
ভারী উৎপাদন	—	Heavy manufacturing
প্রান্তিক বাণিজ্য এলাকা	—	Outlying Business District (OBD)
আবাসিক শহরতলী	—	Residential suburb

শিল্প শহরতলি	—	Industrial suburb
দৈনিক যাত্রী অঞ্চল	—	Commuter's zone

৬৫.৭ অনুশীলনী

(১) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য আর কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।

(ক) নগরে ভূমি-ব্যবহারের অনুমতি ধাঁচ সম্পর্কিত তত্ত্বের উদ্ভাবক হলেন আর. ই. পার্ক।

(খ) হ্যারিস ও উলম্যান এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদের প্রবক্তা।

(গ) বহুকেন্দ্রিক মতবাদ অনুসারে একটিমাত্র কেন্দ্রের নির্ভরতায় নগরের ভূমি-ব্যবহারের ধাঁচ রূপায়িত হয় না।

(ঘ) বহুকেন্দ্রিক মতবাদে বর্ণিত মডেলে ১০টি এলাকা চিহ্নিত হয়েছে।

(ঙ) বহুকেন্দ্রিক তত্ত্ব দ্বারা ভারতীয় শহরগুলির গড়ন ব্যাখ্যা করা যায় না।

(২) টীকা লিখুন (পাঁচ লাইনের মধ্যে) :

(ক) বিশেষীকৃত এলাকা

(৩) ৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন :

(ক) বহুকেন্দ্রিক তত্ত্বের উপযোগিতা আলোচনা করুন।

(৪) ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন :

বহুকেন্দ্রিক মতবাদ এবং নগরের বিকাশে ভূমি-ব্যবহারের ধাঁচ।

৬৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বারজেল, ই. ই.—*আরবান সোসিওলজি*, ম্যাকগ্র হিল, নিউ ইয়কল, ১৯৫৫।

(২) বসকফ, আল্‌ভিন—*সোসিওলজি অফ আরবান*, রিজিঅন, ১৯৭০।

(৩) নোলস্‌, আরয় অ্যান্ড ওয়ারি, জে.—*ইকনমিক অ্যান্ড সোস্যাল জিওগ্রাফি*, ডব্লু. এইচ. অ্যালেন, লণ্ডন, ১৯৭৬।

(৪) মণ্ডল, আর. বি.—*আরবান জিওগ্রাফি—এ টেক্সবুক্‌* কনসেপ্ট পাবলিশিং, নিউ দিল্লি, ২০০০।

ই. এস. ও.—৫

পর্যায় ১৯

একক ৬৬ ❑ রৈখিক পারম্পর্যের ধারণা (Concept of Continuum)

গঠন

৬৬.১ উদ্দেশ্য

৬৬.২ প্রস্তাবনা

৬৬.৩ রৈখিক পারম্পর্যের সংজ্ঞা

৬৬.৩.১ সমাজতত্ত্বে রৈখিক পারম্পর্যের প্রবক্তা

৬৬.৩.২ অন্য সমাজতাত্ত্বিকদের ধারণা

৬৬.৪ গ্রাম ও শহরের বৈপরীত্য বলতে কী বোঝায়

৬৬.৪.১ শহরের আধিপত্য : সমাজতাত্ত্বিকদের মতামত

৬৬.৪.২ গ্রাম ও শহরের পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতা—সমালোচনা

৬৬.৫ রৈখিক পারম্পর্য বিষয়ে পর্যালোচনা

৬৬.৫.১ রৈখিক পারম্পর্যের ভবিষ্যৎ ছবি : ভারতীয় প্রেক্ষিত (মেগা-সিটির নিরিখে)

৬৬.৬ সারাংশ

৬৬.৭ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

৬৬.৮ অনুশীলনী

৬৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬৬.১ উদ্দেশ্য

এই একক আমরা রৈখিক পারম্পর্যের ধারণার সঙ্গে পরিচিত হব। এই একক অধ্যয়নের পর আশা করা যায় যে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন—

- গ্রামীণ ও পৌর সমাজতত্ত্বে রৈখিক পারম্পর্যের বিষয়;
- এই বিষয়ে প্রধান প্রবক্তা ও অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকদের মতামত;
- গ্রাম ও শহরের বৈপরীত্যের ধারণা থেকে রৈখিক পারম্পর্যের ধারণা কতটা আলাদা?
- আধুনিক সময়ে এই পারম্পর্য রক্ষা করা যাবে কিনা সেই বিষয়।

৬৬.২ প্রস্তাবনা

রৈখিক পারম্পর্য সংক্রান্ত ধারণা প্রসঙ্গে আমরা এই এককে কতকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

আলোচনার প্রথম অংশে রৈখিক পারম্পর্যের সংজ্ঞা এবং এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ্গণের বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গীসমূহকে উপস্থাপিত করা হবে।

পরবর্তী অংশে গ্রাম এবং শহরের বৈপরীত্যের ধারণা, শহরের আধিপত্যের বিষয়ে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ্দের অভিমত এবং গ্রাম ও শহরের পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতাকে কেন্দ্র করে একটি সমালোচনামূলক আলোচনার উল্লেখ থাকবে।

এর পরেই আসবে রৈখিক পারম্পর্য সম্পর্কিত পর্যালোচনা প্রসঙ্গ। এই অংশে কলকাতা মহানগরীর প্রেক্ষাপটে এই পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতার তত্ত্বগত দিকটির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পাবে।

৬৬.৩ রৈখিক পারম্পর্যের সংজ্ঞা

রৈখিক পারম্পর্য বা রৈখিক ধারাবাহিকতা বা রৈখিক নিরবচ্ছিন্নতা—এইরকম নানা নামে বোঝানো হয় ইংরেজিতে যাকে বলে 'Continuum'—তাকে। অর্থাৎ কোনোকিছুর মধ্যে বিভাজন বা ভেদরেখা মানা বা রক্ষা করা না হলেই 'রৈখিক পারম্পর্যের' ধারণা গড়ে ওঠে। তবে এখানে বলা প্রয়োজন, আভিধানিক অর্থে 'Continuum'-এর অর্থ যাই হোক না কেন, আমরা এখানে এই ধারণাটিকে আলোচনা করব গ্রাম ও শহরের সম্পর্কের মধ্যে। সমাজতত্ত্বের বিষয়গত আলোচনার পরিধিতে তাই 'Continuum' শব্দটি 'Rural Urban Continuum' বা 'গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্য বা 'গ্রাম ও শহরের রৈখিক ধারাবাহিকতা' হিসাবে বিবেচনা করব। তাহলে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করব গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্যকে? সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রথমে বলা যায় গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্যের ধারণা হচ্ছে গ্রাম ও শহরের বিভাজনের ধারণার (idea of rural urban dichotomy) একটি বিপরীত ধারণা। দ্বিতীয়ত বলা যায়, আধুনিক কালে গ্রাম ও শহর তাদের বিগত বিচ্ছিন্নতার যুগ পেরিয়ে পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছে। তাই আধুনিক যুগে গ্রাম ও শহরের মধ্যে তীব্র পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, বরং এই যুগে গ্রাম ও শহর পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। এভাবেই গ্রাম ও শহরের মধ্যে গড়ে উঠেছে 'Continuum' বা রৈখিক পারম্পর্য; বা অন্যভাবে বলা যায়, একটি সমরৈখিক ধারাবাহিকতা বা পারম্পর্যের দুই প্রান্তে গ্রাম ও শহরের অবস্থান গড়ে উঠেছে।

৬৬.৩.১ সমাজতত্ত্বে রৈখিক পারম্পর্যের প্রবক্তা

আমরা এতক্ষণ পৌর বা নগর সমাজতত্ত্বের আলোচনার পরিধিতে রৈখিক পারম্পর্যের ধারণা বিষয়ে কথা বললাম। এবার এই ধারণার প্রথম প্রবক্তার কথা বলব। গ্রাম ও শহরের পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতার ধারণার প্রথম প্রবক্তা রবার্ট রেডফিল্ড (১৯৩০)। উনবিংশ শতাব্দীতে পৌর সমাজতত্ত্বের চর্চার ক্ষেত্রে এরকম বিশ্বাস করা হত যে গ্রামীণ ও পৌর সমাজের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ও তীব্র বিভাজন রেখা বর্তমান। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই ধরনের বিভাজন হচ্ছে সরলীকরণ, কারণ গ্রামীণ ও পৌর সমাজের মধ্যে নানা ধরনের ক্রম ও পর্যায় রয়েছে। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম রৈখিক পারম্পর্যের কথা বলেন সমাজতত্ত্ববিদ রেডফিল্ড। তিনি ছোট ছোট গ্রাম (কিংবা লোকসমাজ) থেকে বড় শহর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রৈখিক ধারাবাহিকতার ধারণা গড়ে তোলেন। রেডফিল্ডের মতে, যে সমাজে পৌর বা শহুরে উপাদান বেশি সেখানে মানুষদের মধ্যে বেশিমাত্রায় ধর্মনিরপেক্ষতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাব, শ্রম-বিভাজন এবং পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনৈক্য বিদ্যমান। এইভাবে গ্রাম থেকে বড় বড় শহর পর্যন্ত বিস্তৃত মানুষের

বসতিবিন্যাসের মধ্যে সামাজিক কাঠামোর নানাবিধ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নানা ধরনের ক্রম ও পর্যায় রয়েছে। রবার্ট রেডফিল্ড গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্য বা রৈখিক ধারাবাহিকতার ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিন ধরনের সমাজের কথা বলেছেন—লোকসমাজ (folk society), গ্রামীণ সমাজ (rural society) এবং পৌর সমাজ (urban society)।

৬৬.৩.২ অন্য সমাজতাত্ত্বিকদের ধারণা

রবার্ট রেডফিল্ড ছাড়াও গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্য বা রৈখিক ধারাবাহিকতার কথা বলেন আর ফ্র্যাঙ্কেনবার্গ (১৯৬৬)। ফ্র্যাঙ্কেনবার্গের মতে, গ্রাম ও শহরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সংযোগ থাকলেও গ্রাম থেকে শহরের পার্থক্য নিরূপণ করা যায় সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা এবং সামাজিক সম্পর্ক-জালের নিরিখে। পৌর সমাজে ব্যক্তির নানা ধরনের ভূমিকা থাকে এবং সামাজিক সম্পর্ক নিবিড় হয় না। অপরদিকে, গ্রামীণ সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক অনেক বেশি গভীর হয় এবং সমাজে ব্যক্তির ভূমিকার মধ্যে অত বেশি জটিলতা থাকে না। পৌর ও গ্রামীণ জীবনযাপনের প্রণালীর মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তবু এই দুই ধরনের সমাজে নানা সামাজিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জীবনযাপন প্রণালীর মধ্যে যা পার্থক্য থাকে, তার জন্য ভৌগোলিক অবস্থানকে কখনোই দায়ী করা যায় না। সামাজিক শ্রেণির অবস্থানকেই পার্থক্যের কারণ হিসাবে নির্দেশ করা যায়।

সমাজতত্ত্ববিদ্‌দ্বয় অগ্‌বার্ন ও নিম্‌কফ শহর ও গ্রামের রৈখিক ধারাবাহিকতার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন সমষ্টির (community) পরিপ্রেক্ষিতে। অঞ্চলের আয়তনের দিক থেকে সমষ্টিগুলিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ—এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, ক্ষুদ্র সমষ্টি হচ্ছে গ্রাম এবং বৃহৎ সমষ্টি হচ্ছে শহর। শহর ও গ্রামের আয়তনের কোনো নির্দিষ্ট বিভাজন রেখা নেই। ইংরেজিতে, বড় বড় শহর—যাকে আমরা City বলি এবং বাংলায় বলি 'নগর', অপেক্ষাকৃত ছোট শহরগুলিকে বলি 'Town'। নগর ও শহরের বাসিন্দাদের বলি পৌর সমষ্টি। আবার আয়তন অনুসারে গ্রামাঞ্চলগুলিকেও নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ইংরেজি পরিভাষায় ক্ষুদ্রতম গ্রাম Hamlet বলে, সাধারণ গ্রামকে Village এবং বড় গ্রাম বা গণ্ডগ্রামকে Large Village বলা হয়। এই আয়তন অনুক্রমিক গ্রামগুলির কোনো নির্দিষ্ট বিভেদ-রেখা নেই। দ্বিতীয়ত, কোন্‌টি গ্রাম, কোন্‌টি শহর তা নির্ণয় করতে গেলে কেবলমাত্র অধিবাসীর সংখ্যা নয়, তাদের প্রকৃতি, সমষ্টিবোধ, জীবনযাত্রার প্রণালী, পৌর সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি বোঝা দরকার। যেমন, এমন কিছু গ্রাম আছে যেখানে পৌর পরিষেবা (municipal services) পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, এমন কতকগুলি শহর আছে যেখানকার পৌর শাসনব্যবস্থা খুবই নিম্নমানের। এইভাবে গ্রাম, গণ্ডগ্রাম, ছোট শহর, বড় শহর, নগর-মহানগর বা প্রধান নগর (metropolis)—এদের মধ্যে একটি রৈখিক ধারাবাহিকতা বা পারম্পর্য দেখতে পাওয়া যায়।

অগ্‌বার্ন ও নিম্‌কফের মতো উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক সমাজতত্ত্ববিদই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সমষ্টির ধারণা ব্যবহার করেছেন। 'সমষ্টি'র ধারণার মাধ্যমে এইসব সমাজতত্ত্ববিদ বোঝাতে চেয়েছেন যে গ্রামীণ ও পৌর সমাজ কিংবা প্রাক্‌-শিল্প সমাজ ও শিল্প-সমাজের বিভাজনের মধ্যে মধ্যে এই 'সমষ্টি' কাজ করেছে। উদাহরণ হিসাবে এখানে আমরা জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ ফার্দিনান্দ টয়েনীজের 'গেমেনস্যাফট' এবং 'গেসেলস্যাফট' (১৮৮৭)—বিভাজনের কথা বলতে পারি। টয়েনীজ 'গেমেনস্যাফট' বলতে 'সমষ্টি' এবং গেসেলস্যাফট বলতে 'সমিতি' বোঝাতে চেয়েছেন। গ্রামীণ সমাজ থেকে শিল্প-সমাজে রূপান্তরের বিষয়টি বোঝাবার জন্য টয়েনীজ এই ধারণা দুটি ব্যবহার করেছেন। আসলে 'গেমেনস্যাফট' ও 'গেসেলস্যাফট'

বিভাজনের মধ্যে টয়েনীজ 'সমষ্টি'কে নির্দেশ করেছেন একটি নির্দিষ্ট সমাজ হিসাবে যা গ্রামীণ, যেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে আত্মীয়তা বন্ধন ও নিজস্বতা এবং আত্মসংযম আছে।

গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্য বা রৈখিক ধারাবাহিকতা আগেই আমরা বলেছি, গ্রাম-শহরের বিভাজনের একটি বিপরীত ধারণা। আধুনিক সময়ে এই ধরনের বিভাজন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পৌর-সমাজ নিয়ে চর্চারত গবেষকদের মধ্যে এই বিষয়টি অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। যেমন, সমাজবিজ্ঞানী পাহল্ (১৯৩৮) গ্রাম ও শহরের মধ্যে তীব্র বিভাজন রেখা না টেনে একটি রৈখিক ধারাবাহিকতার ধারণা গড়ে তোলার সপক্ষে তার মত প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, গ্রাম ও শহরের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে নানা ধরন (type) এবং মাত্রা (degree) বর্তমান। তবে এখানে এই কথা বলা দরকার যে 'রৈখিক পারম্পর্যের' বিষয়টি উন্নত দেশ, যেখানে নগরায়ণের মাত্রা বেশি তার থেকে অনুন্নত দেশে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ।

৬৬.৪ গ্রাম ও শহরের বৈপরীত্য বলতে কী বোঝায়

গ্রাম ও শহরের বৈপরীত্য বলতে উভয়ের মধ্যে ভৌগোলিক আয়তনগত পার্থক্য বোঝায় না। সমাজতত্ত্বে গ্রাম ও শহরের বৈপরীত্য বলতে গ্রামীণ ও পৌর সমাজজীবনের মধ্যে বিদ্যমান জীবনধারাগত পার্থক্যকে বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে, দুই ধরনের সমাজজীবনের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু বৈষম্য রয়েছে। যেমন, গ্রামীণ সমাজ হল একটি 'ক্ষুদ্র সমষ্টি' বিশেষ। গ্রামের মানুষের যাবতীয় সম্পর্ক সীমাবদ্ধ থাকে তার পরিবার, প্রতিবেশী ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে। অপরদিকে, পৌর জনসম্প্রদায়গুলি হল এক-একটি 'বৃহৎ সমষ্টি'। নগরের অধিবাসীদের মধ্যে মুখোমুখি পরিচয়ের অন্তরঙ্গতা সচরাচর থাকে না। শহর বা নগরের বাসিন্দাদের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে মূলত যান্ত্রিক এবং পরোক্ষ প্রকৃতির।

দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় বৃত্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য অনুপস্থিত এবং গ্রামাঞ্চলে বৃত্তির বিশেষীকরণ (Specialisation) সম্ভব নয়। তাছাড়া গ্রামের সমাজজীবন হল সহযোগিতামূলক, প্রতিযোগিতামূলক নয়। সামাজিক বিচলনীয়তার (social mobility) সুযোগ ও সম্ভাবনা গ্রামে প্রায় নেই বললেই চলে। অন্যদিকে শহরে বৃত্তির ব্যাপক বৈচিত্র্য বর্তমান। শুধু বৈচিত্র্যই নয়, শহরের অর্থনৈতিক জীবনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল বৃত্তির বিশেষীকরণ। পৌর সমাজব্যবস্থায় জীবনযাত্রা হল প্রতিযোগিতামূলক, গ্রামীণ জীবনের মতো সহযোগিতামূলক নয়। তাছাড়া, নগর-জীবনে সামাজিক বিচলনীয়তার সুযোগ বর্তমান থাকে। তৃতীয়ত, গ্রামীণ জীবনে ভৌগোলিক দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ও অন্তরঙ্গতা থাকে। অন্যদিকে শহরবাসীদের মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য থাকলেও সামাজিক দূরত্ব দেখা যায়। শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে 'আমরা-বোধ' (we-feeling) অত্যন্ত শিথিল হয়, নয়তো একেবারেই থাকে না। এই প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ববিদ্ ম্যাকাইভার ও পেজের অভিমত হল : নগর-জীবনের জটিলতার ফলে শহর-বাসিন্দাদের মধ্যে 'আমরা বোধ'-এর বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে (The we-feeling of the city-dweller is weakend by the very complexity of urban society.)। চতুর্থত, গ্রামের সমাজজীবনে পারিবারিক সংহতির বন্ধন এবং লোকাচার ও লোকনীতির প্রভাব বেশি। গ্রামঞ্চলের সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত সনাতন প্রথা ও রীতিনীতির নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভাবও বেশি হওয়ার ফলে এই প্রভাব ব্যক্তির বৃত্তি, বিবাহ, ধর্ম ও অন্যানয সামাজিক কার্যকলাপের ওপর কায়েম হয়। অন্যদিকে, নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হয় আইন,

আদালত প্রভৃতি সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। নগরের বাসিন্দাদের ওপর প্রথা, লোকাচার, লোকনীতির নিয়ন্ত্রণ দুর্বল এবং কোথাও নেই বললেই চলে। তাই নগরজীবনে সামাজিক বন্ধন যেমন শিথিল, সামাজিক নিয়ন্ত্রণও কার্যকরী হওয়া সহজ নয়।

গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতা আছে—এই ধারণায় বিশ্বাস করেন যেমন অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্, তেমন অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন, গ্রাম এবং শহরের সমাজব্যবস্থা হচ্ছে সমান্তরাল এবং স্বতন্ত্র ব্যবস্থা এবং এ দুটি কখনও এক বিন্দুতে এসে মিলিত হতে পারবে না। সোরোকিন এবং জিমারম্যান ১৯২৮ সালে এই বিষয় নিয়ে একটি বই লেখেন, যার নাম—প্রিন্সিপিলস্ অফ রুরাল অ্যান্ড আরবান সোশিওলজি (Principles of Rural and Urban Sociology)। সোরোকিন এবং জিমারম্যান—এই দুই সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, সামাজিক সম্পর্ক ও বিচলনীয়তা, পরিবেশ, আয়তন এবং ঘনত্ব—এসবের নিরিখে গ্রাম ও শহর একে অপরের থেকে আলাদা। তাঁদের মতে, জনসংখ্যা এবং স্থানগত আয়তন দুই-ই গ্রামের থেকে শহরে অনেক বেশি ও বড়। তাছাড়া, গ্রামের তুলনায় শহরে জনসংখ্যার ঘনত্বও বেশি। দ্বিতীয়ত, শহরে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের লোক বাস করে। গ্রামে সাধারণত এক বা দুইটি গোষ্ঠীর লোকের বসবাস। ফলে শহরে ভিন্নজাতীয় (heterogeneous) উপাদানের সমাবেশ দেখা যায়, অন্যদিকে গ্রামে দেখা যায় সমজাতীয় (homogeneous) উপাদান। চতুর্থত, গ্রাম ও শহরের বৈষম্যের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পরিযান (migration)। জীবিকার খোঁজে এবং নগর-জীবনের নানা সুযোগ-সুবিধার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। অন্যদিকে, শহর থেকে পরিযান নিয়ে মানুষ গ্রামে চলে যাচ্ছে—এমন মানুষের সংখ্যা নেহাতই নগণ্য এবং প্রায় নেই বললেই চলে। পরিশেষে, সোরোকিন এবং জিমারম্যানের মতে, গ্রামীণ সমাজে জনসমষ্টি হচ্ছে প্রাথমিক গোষ্ঠী (primary group), যেখানে সামাজিক সম্পর্ক হচ্ছে প্রত্যক্ষ, মুখোমুখি এবং আন্তরিক। অন্যদিকে, নগর-জীবনে জনসমষ্টিগুলি হচ্ছে গৌণ গোষ্ঠী, যেখানে সামাজিক সম্পর্ক হচ্ছে অপ্রত্যক্ষ (indirect), নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) এবং যান্ত্রিক (mechanical)।

সমাজতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজও গ্রাম এবং শহরের এই বৈষম্যের বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেছেন। শহরের এবং গ্রামের জীবনযাত্রার অর্থ হল দুটি ভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা প্রণালী। গ্রামে যে সামাজিক প্রতিন্যাস (attitude) দেখা যায়—শহরে তার বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য আছে। শহরের পরিবেশ সামাজিক পরিবেশ। গ্রামের পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশ। শহরের মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিবর্তিত বা অপসারিত করেছে। এইজন্য দেখা যায় যে মানুষের নাগরিক জীবন অতীতে একরকম ছিল আর বর্তমানে আর একপ্রকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামীণ সমষ্টির সঙ্গে শহরের সমষ্টির এই যে ফারাক, অনেকে মনে করেন যে এর জন্য কোনও একটি 'বিশেষ' কারণ দায়ী। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, একটি 'বিশেষ' কারণের নির্ভরশীলতায় কোনো কিছুর বিশ্লেষণ—একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। মানুষ বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের ফল এবং এই সামাজিক পরিবেশ সামগ্রিক। তাই জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠী এইসবের নিরিখে গ্রাম ও শহরের পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না। মানুষের বাসযোগ্য অঞ্চলকে যে শহর এবং গ্রাম—এরকমভাবে বিভাজিত করা হয়েছে, এই বিভাজন চিরাচরিত প্রথামাফিক হলেও এর কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমত, গ্রাম ও শহরের সীমারেখা অস্পষ্ট, এমন কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই যা প্রয়োগ করে বলা যায় যে কোন্ জায়গা থেকে শহর শেষ হয়ে গ্রামের সীমা আরম্ভ হয়েছে কিংবা কোন্ সীমারেখায় গ্রামের পরিধি শেষ হয়েছে এবং শহরের ভৌগোলিক রেখা শুরু হয়েছে। তাই গ্রাম ও শহরকে সংজ্ঞায়িত করা অসুবিধাজনক এবং প্রচলিত যেসব সংজ্ঞা আছে তাই নিয়েও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। দ্বিতীয়ত, শহরের মধ্যে একাধিক সমষ্টি

(community) বাস করে এবং এইসব সমষ্টি যে পরিবেশে বাস করে তারও প্রকারভেদ আছে। নাগরিক জীবন সমজাতীয় নয়। নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যের সূত্র তেমনভাবে প্রত্যক্ষ নয়, বরং বলা যায় নগরে মানবপ্রকৃতির বৈপরীত্যই বেশি, যাকে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন 'শহর বা নগর হচ্ছে বৈপরীত্যের আবাসস্থল' (The city is the home of opposites.)—যেখানে ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, খারাপ ও ভালো সহাবস্থান করছে। তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল উভয়ই পরিবর্তিত হচ্ছে। শহরের প্রভাবে গ্রামগুলির মধ্যে রূপান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আর অন্যদিকে গ্রামবাসী শহরে এসে ভিড় করছে, শহর গ্রামকে গ্রাস করছে। আবার, শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে যে 'একাকীত্ববোধ' বা 'বিচ্ছিন্নতাবোধ', তার কারণ হিসাবে নির্দেশ করা যায় যে শহরে নানাশ্রেণির মানুষের ভীড়ের মধ্যে মানুষ মনের মতো সঙ্গী বা বন্ধু খুঁজে পায় না। তাছাড়া শহরের যান্ত্রিক ও কর্মব্যস্ত জীবনে খুব কম মানুষই অন্য মানুষের জন্য সময় ব্যয় করতে পারে। ফলে, শহরে মানুষ একাকীত্ব' বা 'বিচ্ছিন্নতা' বোধে আক্রান্ত হয়।

৬৬.৪.১ শহরের আধিপত্য : সমাজতাত্ত্বিকদের মতামত

ওপরের আলোচনায় আমরা বুঝতে পারলাম শহর ও গ্রাম্যজীবনের মধ্যে নানা বৈষম্য আছে, আছে নানা বৈপরীত্যও। এই বৈপরীত্য, অমিল—এইসব নৈতিবাচক দিকগুলো থাকা সত্ত্বেও একটা বিষয় কিন্তু অস্বীকার করা যায় না, তা হল গ্রামের ওপর শহরের আধিপত্য। এই আধিপত্য বা প্রাধান্যের বিষয়টির কথা বলেছেন 'ম্যাকাইভার ও পেজ'-এর মতো দুজন খ্যাতনামা সামাজতত্ত্ববিদ্। এঁদের মতে, গ্রাম ও শহরের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে দেখা যায় শহরবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাত্রার ধরন (style) ইত্যাদি গ্রামীণ মানুষদের জীবনের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। শহরের এই প্রাধান্যের কারণগুলো কী? কারণগুলোর মধ্যে নির্দেশ করা যায় শহরের নাগরিক সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনযাপন পদ্ধতি (way of life), অর্থ উপার্জন করার নানা উপায় বা পন্থা, গ্রামবাসীর উৎপাদিত পণ্য কেনাবেচার উদ্দেশ্য ইত্যাদি। অপরদিকে, গ্রামীণ মানুষের জীবন প্রবাহিত হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারায়, ফলে মানুষের অনেক ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন অপূর্ণ থাকে বা অবদমিত থাকে—সেই অপূর্ণ বা অবদমিত ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য মানুষ হয়ে ওঠে শহরমুখী। ফলে সমষ্টির যে সাংস্কৃতিক চেতনা থাকে—তার বন্ধন হয়ে ওঠে শিথিল। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন মেটাতে চাওয়ার জন্য সমষ্টিগুলো একাধিক গোষ্ঠী বা Multi-group-এ বিভক্ত হয়ে পড়ে।

শহরের এই যে প্রাধান্য বিস্তার করার প্রবণতা সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা এর মধ্যে দু-ধরনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছেন। যেমন, অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার (Oswald Spengler) বলেছেন, সভ্যতার ইতিহাসে এমন একটা সময় আসে যখন প্রধানতম সার্বজনীন নগরকেন্দ্র গ্রামের জীবনীশক্তিকে গ্রাস করে নিতে উদ্যত হয়। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে পরস্পরবিরোধী। স্পেঙ্গলারের মতানুসারে শহরের এই প্রবণতা, মানে, আধিপত্য বিস্তার করার প্রবণতার মধ্যে রয়েছে গ্রামকে বা গ্রামীণ জীবনের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলোকে গ্রাস করার বাসনা, যা মানুষের সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার এটাও ঠিক, শহর বা নগর থেকে ক্রমান্বয়ে মহানগরে বিস্তৃত হয়ে উঠবার প্রক্রিয়ারও এটা একটা লক্ষণ। অপরদিকে, লুইস মামফোর্ডের (Lewis Mumford) মতো বিশিষ্ট নগর-সমাজতত্ত্ববিদ্ শহরগুলিকে দু'টি ভাগে বিন্যাস করেছেন, যেমন—(১) ঈওপোলিস (Eopolis), (২) পোলিস্ (Polis) (৩) মেট্রোপোলিস (Metropolis) (৪) মেগ্যালোপোলিস্ (Megalopolis), (৫) টির‍্যানোপোলিস (Tyrannopolis) এবং (৬) নেক্রোপোলিস্ (Nekropolis)। শহরের এই স্তরবিন্যাস—

মামফোর্ডের মতে, কোনো ঐতিহাসিক সত্য নয় এবং ভবিষ্যতেও এই বিভাজন কোনো ঐতিহাসিক ভবিতব্য নির্দেশ করবে না। তবে লুইস মামফোর্ডের চিন্তাভাবনা অনুসরণ করে বলা যায়, শহর বা নগরে বসবাসকারী মানুষ যদি সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং শহর বা নগরগুলোর কেন্দ্রীকরণ না করে বিকেন্দ্রীকরণ (decentralised)-এর পথ অনুসরণ করে, তাহলে মানুষের সমাজ আসন্ন বিপর্যয় অর্থাৎ টির‍্যানোপোলিস্ ও নেক্রোপোলিসের পর্যায়ে পৌঁছানোর বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

৬৬.৪.২ গ্রাম ও শহরের পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতা—সমালোচনা

আমরা এই এককে গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। প্রথম দিকের আলোচনাতেই উল্লেখ করেছি যে রবার্ট রেডফিল্ড (Robert Redfield) হলেন এই 'রৈখিক পারম্পর্য নামক প্রত্যয়ের (concept) প্রধান প্রবক্তা। তাই সমাজতত্ত্বে এই বিষয়ে তাঁর অবদানকে (contribution) স্বীকার করে নেওয়া হলেও তাঁর মতবাদ কিন্তু সমালোচনা মুক্ত নয়। অধ্যাপক ব্রিজরাজ চৌহান তাঁর একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। চৌহানের মতে, রবার্ট রেডফিল্ডের 'গ্রাম-শহরের ধারাবাহিকতা' তত্ত্বের প্রধান সমালোচনা হল এই যে রেডফিল্ড ধারাবাহিকতার বিষয়ে শহরের প্রান্তের বিস্তৃতি কতদূর—তা পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করেননি এবং সমস্ত ধরনের শহরকে একই শ্রেণিতে রেখে তিনি আলোচনা করেছেন। রেডফিল্ডের তত্ত্বের এই সীমাবদ্ধতাকে অধ্যাপক রেডফিল্ড ও সিঙ্গার (Rdfield and Singer) তাঁদের প্রবন্ধ "কালচারাল রোল অফ সিটিস্" (Cultural Role of Cities)-এ সংশোধন করে আলোচনা করেছেন। রেডফিল্ড ও সিঙ্গার প্রস্তাবিত শহরের শ্রেণিবিভাগ হচ্ছে এরূপ :

শ্রেণি	প্রশাসনিক শহর	বাণিজ্যিক শহর
প্রাক্-শিল্পযুগীয়	লাসা	মার্সেই
শিল্পযুগীয়	নতুন দিল্লী	মুম্বাই

প্রথম শ্রেণিভুক্ত শহরগুলোকে তারা 'প্রাথমিক নগরায়ণের' উদাহরণ হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। এইসব শহরে স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারে নগরায়ণের প্রণালী চলতে থাকে এবং দেশীয় সভ্যতার উচ্চতম প্রকাশ-এর মাধ্যমে দেখা যায়। অপরদিকে, শিল্পযুগে এবং তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাকে রেডফিল্ড ও সিঙ্গার বলেছেন গৌণ নগরায়ণ (Secondary Urbanisation)। তাঁদের মতে, প্রাথমিক নগরায়ণকে (Primary Urbanisation) বলা হয় 'ঋজু-জনন সম্পর্কিত' উন্নয়ন এবং গৌণ নগরায়ণকে বলা যায় 'অসম-জনন সম্পর্কিত' উন্নয়ন। প্রথম শ্রেণির নগরায়ণের ফলে শহরগুলোর যে পরিবর্তন ঘটে তা নীতি-সম্পর্কিত এবং এর ফলে শহরবাসীদের দেশীয় সংস্কৃতিরই পূর্ণতর বিকাশ ঘটে, যাতে বলা যায় "স্থানীয় সংস্কৃতি বা ক্ষুদ্র ঐতিহ্য"। এভাবে দেশীয় সংস্কলতি বা "ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের' কাঠামোর মধ্যেই প্রাথমিক নগরায়ণের প্রণালী চলতে থাকে এবং এর ফলে দেশীয় সংস্কৃতি হয়ে ওঠে আরও বেশি নগরায়িত এবং তা শেষ পর্যন্ত স্বদেশী সভ্যতায় পরিবর্তিত হয়। অপরদিকে, গৌণ নগরায়ণ পদ্ধতি বিদেশী সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। রেডফিল্ড ও সিঙ্গারের মতে, গৌণ নগরায়ণের প্রবণতা হল এমন একটি মানসিকতা তৈরি করা, যা দেশীয় সংস্কৃতি সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং যা এই স্থানীয় ঐতিহ্যভিত্তিক সংস্কৃতিকে দুর্বল করে দেয়, নয়তো এই ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে অতিক্রম করে যেতে চায়। রেডফিল্ড ও সিঙ্গার এই দু'ধরনের নগরায়ণের প্রক্রিয়ার ওপর কী কারণে আলোকপাত করতে চেয়েছেন তার বিশ্লেষণে জানিয়েছেন—এশিয়া এবং আফ্রিকার

নগরায়ণের ধারার মধ্যে বিদেশী সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও এই ভাবধারার প্রবেশ ঘটেছে, আবার কোথাও তা বর্জন করাও হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার জাতীয় আন্দোলনের ফলে শহরের মানুষ বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে জাতীয় ঐতিহ্য ও দেশজ সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। সমাজতত্ত্ববিদ্ মিল্টন সিঙ্গার এই প্রেক্ষাপটেই মাদ্রাজের (এখন যার নাম চেন্নাই) ওপর তাঁর পর্যালোচনাটি করেন, কিন্তু সেই পর্যালোচনার বিষয় আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিধিতে প্রাসঙ্গিক নয়। সিঙ্গারের বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে প্রাচীনতা থেকে নগরায়িত আধুনিকতায় উত্তরণ, কিংবা গ্রামীণ সংস্কৃতির নাগরিক সংস্কৃতিতে রূপান্তর—এটা কিন্তু সামগ্রিক নয়, কারণ গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্কৃতিবান মানুষ শহরে বসবাসকারী লৌকিক স্তরের মানুষের সংস্কৃতির দৈন্য মেটাতে উদ্যোগী হয়। একইভাবে গ্রামে নাগরিক সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার হয়। তাই মিল্টন সিঙ্গার (১৯৬০) বলেছেন, "ক্ষুদ্র ঐতিহ্য ও বৃহত্তর ঐতিহ্য স্পষ্টত সবসময়েই গ্রামভিত্তিক বা শহরভিত্তিক নয়। দু'ধরনের ঐতিহ্যকে আলাদা আলাদাভাবে গ্রাম ও শহরে পাওয়া যায়। "Littel and great traditions are not neatly differentiated along a village urban axis. Both kinds of tradition are found in villages and in the city in different forms". তাই বড় বড় শহরে লোকগানের আসর বসে বা যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। যাত্রার অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য শহরের আধুনিক রঙ্গমঞ্চের আংশিক অনুসরণ করা হয় গ্রামে গ্রামে। তাই বিদেশী সংস্কৃতি দেশীয় ভাবধারাকে প্রভাবিত করলেও—দেশীয় সংস্কৃতি কিন্তু তার নিজস্বতা হারায় না, বরং শহরের আধুনিক ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, আধুনিক চিত্রনির্মাতা, শিল্পী বা নাট্যকার গ্রাম্যজীবনের আলেখ্য নিয়ে ছবি করেছেন, ছবি এঁকেছেন এবং নাটক লিখেছেন। এইভাবে নাগরিক মানুষ গ্রাম্যজীবনের কাহিনী, কথকতা বা ধর্মীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে মানসিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। মিল্টন সিঙ্গারের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে তাই বলা যায়, নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে গ্রাম ও শহরের ভৌগোলিক দূরত্ব কমে গিয়ে শহর ও গ্রাম নিকটতর হয়েছে। আধুনিক মানুষের সামাজিক বিচলনীয়তা (social mobility), যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রম-উন্নতি এবং শিক্ষার প্রসার এবং সাংস্কৃতিক প্রাধান্য—এসবের ফলে গ্রাম ও শহরের পারস্পরিক নৈকট্য বেড়ে গেছে। অধ্যাপক ব্রিজরাজ চৌহান গ্রাম ও শহরের রৈখিক ধারবাহিকতার সম্প্রসারণের দূরপ্রসারী সম্ভাবনার দিকে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

৬৬.৫ রৈখিক পারম্পর্য বিষয়ে পর্যালোচনা

আগের আলোচনাতেই আপনাদের বলা হয়েছে যে গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্যের ধারণা হচ্ছে গ্রাম-শহরের বিভাজনের বিপরীত ধারণা এবং সমাজতত্ত্বের আলোচনায় অনেক গবেষকই এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন (গাহ্ল, ১৯৬৮)। এখানে যে বিষয়টা বলা দরকার তা হল যে গ্রাম শহরের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) বিভিন্ন ধরন ও মাত্রা আছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলো যেমন ভারত, পাকিস্তান কিংবা আফ্রিকাতে গ্রাম-শহরের রৈখিক পারম্পর্য নিয়ে যেসব পর্যালোচনা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে বড় বড় শহর এবং শিল্পনগরীগুলো গ্রামীণ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর নানাভাবে ছাপ ফেলে। পাকিস্তানে আয়ার্ড (১৯৫৭) এবং আফ্রিকাতে কে (১৯৬০) এই বিষয়ে সমীক্ষা ও পর্যালোচনা

করেছেন। আমাদের দেশ, ভারতবর্ষেও গ্রাম-শহরের রৈখিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার নিরিখে গ্রামের ওপর শহরের প্রভাব নিয়ে নানা ধরনের সমীক্ষা হয়েছে যেমন এম. এস. এ. রাও তাঁর ''এ রুরাল কমিউনিটি অন দি দিল্লী মেট্রোপলিটান ফ্রিনজ'' নামক আলোচনাপত্রে দিল্লীর প্রত্যন্তে অবস্থিত গ্রাম 'যাদবপুরের' মানুষের আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ওপর শহরের প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। এম. এন. শ্রীনিবাস (১৯৭৪) তাঁর সমীক্ষায় দেখিয়েছেন গ্রামীণ মানুষের ওপর নগরায়ণের ও শিল্পায়নের বহুমুখী প্রভাব। ডি. এন. মজুমদার (১৯৫৮) লক্ষ্ণৌ-এর কাছে অবস্থিত 'মোহনা' নামক গ্রামে কৃত তাঁর সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, পরোক্ষভাবে শহরের বাজারগুলোর দ্বারা কীভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি প্রভাবিত হয়। উত্তরপ্রদেশে একটি গ্রামে-কৃত এমসের (Eames) (১৯৫৪) সমীক্ষায় গ্রামের ওপর শহরের ভিন্নধরনের অর্থনৈতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ব্যাঙ্গালোর শহরের নিকটে অবস্থিত একটি গ্রামের সামাজিক পরিবর্তন কিভাবে সূচিত হয়েছে শহরের প্রভাবে—তা বিল (১৯৫৫) দেখিয়েছেন তাঁর সমীক্ষায়। আর. ডি. ল্যামবার্ট (১৯৬২) তাঁর বিস্তারিত পর্যালোচনায় জানিয়েছেন, গ্রামীণ জীবনের ওপর শহরের প্রভাব এবং নির্দেশ করেছেন এই প্রভাবের বহুমুখী মাত্রা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শুধু সমাজতত্ত্ববিদ্ নয়, এলেফসনের (১৯৬২) মতো ভৌগোলিকেরাও এই ধরনের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং সন্দেহ নেই, এই ধরনের সমীক্ষা ও পর্যালোচনা গ্রাম-শহরের ধারাবাহিকতার সামাজিক ধারণা খুঁজে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিতের হদিস দিতে পারে।

৬৬.৫.১ রৈখিক পারম্পর্যের ভবিষ্যৎ ছবি : ভারতীয় প্রেক্ষিত (মেগা-সিটির নিরিখে)

গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনার তত্ত্বগত দিকটি আমরা জানলাম। এবার আমরা ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এই ধারণার প্রয়োগগত দিকটির প্রতি আলোকপাত করতে পারি। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে আমরা কলকাতা মহানগরীর কথা এখানে তুলে ধরতে পারি। ৩১২ বছরের পুরোনো এই শহর সৃষ্টি হয়েছিল ক্ষুদ্র তিনটি গ্রাম নিয়ে। তারপর ক্রমশ বিস্তৃত এই শহর বিস্তৃততর হয়েছে ভৌগোলিক সীমারেখা ও বহুমুখী কার্যপরিধি বাড়িয়ে। তাই পরিকল্পনাকারী মানুষের কাছে কলকাতার নাম হয়েছে কলকাতা মহানগরী এলাকা (Calcutta Metropolitan Region) বা কলকাতা মহানগর জেলার (Calcutta Metropolitan District) বাইরে বিস্তৃত হয়েছে বহুদূর পর্যন্ত। কলকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে যে শহরতলী গড়ে উঠেছে এবং উঠছে, তা পৌর বিক্ষেপণের ((urban sprawl) বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলছে। এই পৌর বিক্ষেপণের দুটি কারণ আছে—(১) শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বাসস্থানের জন্য জমির অভাব এবং (২) শহরের উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা আবাস-স্থানগুলি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের পক্ষে ক্রয়যোগ্য। মহানগরের বিস্তৃতি ও উন্নয়নের প্রশ্নে উপকণ্ঠের এই তাৎপর্য (Significance of the periphery) থেকে বোঝা যায় যে এই অঞ্চলে বাধাহীনভাবে গ্রাম থেকে শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং ভবিষ্যতে শহরের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কলকাতা মহানগরীর বিপুল জনসংখ্যার ভার লাঘব করার জন্য এবং এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বর্ধিত শহরের আরও নানা সামাজিক সমস্যা হ্রাসের উদ্দেশ্যে 'রিজিওনাল পার্সপেকটিভ : ২০১১ সাল' বা 'আঞ্চলিক প্রেক্ষিত : ২০১১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত' নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণের কথা ভাবা হয়। কলকাতা শহরের ভবিষ্যৎ নিয়ে গৃহীত এই পরিকল্পনাটির রূপরেখা আলোচনা করলে আমাদের এই অতি পরিচিত শহরের মাধ্যমে 'গ্রাম-শহরের রৈখিক পারম্পর্য বা ধারবাহিকতা'র তত্ত্বগত বিষয়টি হয়তো আপনাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ভবিষ্যৎ কলকাতার ছবি নিয়ে ভাবার সময় পরিকল্পনাবিদরা যে বিষয়টি আগে চিন্তা করেন তা হল জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিক স্থান

অনুসারে এই জনসংখ্যার বণ্টন। যেমন, ২০১১ সালের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ভাবা হয়েছে কলকাতা মহানগর অঞ্চলের মধ্যে আরও ৮ মিলিয়ন লোকের অতিরিক্ত ভার। ১৯৮১-এর জনগণনায় ভূমি-ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কলকাতা মহানগর অঞ্চলের (Calcutta Metropolitan Area) পরিধির মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ একর জমি অনুন্নত ও খালি অবস্থায় পড়ে আছে : এর মধ্যে ৫০ শতাংশ জমিকে ব্যবহার করা যেতে পারে চাষবাস ও অন্য অনেক রকমের কাজে। বাকি ৫০ হাজার একর জমিকে যদি তেমনভাবে গড়ে তোলা যায় তাহলে প্রায় ২ মিলিয়ন লোককে এই জমিতে বাসের সুযোগ দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে যদি বসতি গড়ে তোলা যায় তার ঘনত্ব হবে প্রতি একরে ৪০ জন ব্যক্তির বাস। তাহলে বাকি থাকছে আরও ৬ মিলিয়ন লোকের বসতিবিন্যাসের বিষয়টি এবং সেক্ষেত্রে কলকাতা নগর এলাকার (Calcutta Metropolitan Region) মধ্যে এই লোকেদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এক্ষেত্রেও কিন্তু আশঙ্কার কথা আছে, কারণ ইতিমধ্যে কলকাতা নগর অঞ্চলের মধ্যে যদি আরও অতিরিক্ত চার মিলিয়ন লোক বেড়ে যায় ২০০১ সালের সময়সীমায়, তাহলে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ১০ মিলিয়ন লোককে শহরের বসতির মধ্যে বাসের সুযোগ করে দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিঃসন্দেহে। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে ২০১১ সালের মধ্যে 'কলকাতা মহানগর এলাকার'র মধ্যে আরেকটা 'কলকাতা মহানগর অঞ্চল' গড়ে তোলা কি কঠিন কাজ নয়? নগর সমাজতত্ত্বের আলোচনার পরিধিতেও এই ধরনের কাজ নতুন মাত্রা যোগ করবে, কারণ ভবিষ্যতের এই প্রকল্প 'গ্রাম-শহরের রৈখিক পারম্পর্য' এমনভাবে গড়ে তুলবে যে যাতে পরিবেশের কোনো ক্ষতিসাধন না করে মহানগরের বিপুল জনসংখ্যা সমস্যাকে অনেকটা পরিমাণে সমাধান করা যাবে। মহানগরের এই নতুন বসতিবিন্যাস হবে শহরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রচলিত কাঠামোর মধ্যেই।

কলকাতা মহানগরের ভবিষ্যৎ বসতিবিন্যাসের ধারণাটি, যাকে তুলনা করা হয়েছে (Outstretched Man) বা হস্ত প্রসারিত মানুষের সঙ্গে গ্রাম-শহরের রৈখিক পারম্পর্যের নিরিখে—এই ধারণাটি বিশিষ্ট নগর পরিকল্পনাবিদ্ মণিদীপ চট্টোপাধ্যায়ের। এই বিষয়ে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত "ক্যালকাটাস্ আরবান ফিউচার" নামক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

মহানগরের ভবিষ্যতের বসতিবিন্যাসের এই ধারণাকে তুলনা করা যায় কোনো কাল্পনিক "হস্তপ্রসারিত মানুষের" চেহারার সঙ্গে; যার বিস্তৃতি হবে রাণাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ এবং কালনা পর্যন্ত। মূল কেন্দ্র অবস্থিত হবে কলকাতা-হাওড়ায়। পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রসারিত হবে বনগাঁ থেকে কালনা পর্যন্ত এবং নীচের দিকে প্রসারিত হবে ক্যানিং থেকে কোলাঘাট-পাঁশকুড়া অবধি অঞ্চল এবং এই অঞ্চলের প্রধান বনিয়াদ হবে হলদিয়া-গেয়োখালি-ফলতা-ডায়মণ্ডহারবার। বসতিবিন্যাসের এই কাল্পনিক কাঠামো, যাকে তুলনা করা হয়েছে 'হস্তপ্রসারিত মানুষের' সঙ্গে তা ২০১১ সাল পর্যন্ত মহানগরের আঞ্চলিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ ছবিকে তুলে ধরতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতের এই কাল্পনিক কাঠামোর মাধ্যমেই হয়তো বেরিয়ে আসবে আরও অনেক উন্নয়নমূলক ভাবনা-চিন্তা, যা মহানগরীর সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রাম-শহরের পারম্পর্য বা রৈখিক ধারাবাহিকতার প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে নতুনতর মাত্রা সংযোজন করবে। এছাড়া, প্রকৃত অর্থে গ্রাম-শহরের রৈখিক ধারাবাহিকতার প্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করে নগর-উন্নয়নের ক্ষেত্রেও যুক্ত হবে নতুন দিক। যেমন—পরিবেশের উন্নতি, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি। এই উন্নতির বিষয়টি স্পষ্ট হবে যদি পরিকল্পনার সময় নতুন গড়ে ওঠা এলাকায় প্রত্যেকটি গ্রামের বসতিবিন্যাসের দিকে মনোযোগ দেওয়া যায়, যাতে জনসংখ্যার বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই শহরের নতুন মানুষদের সেখানে স্থান দেওয়া হয়। এই গ্রামের নতুন বসতিতে বাস করতে আসা মানুষদের জন্য আবাসন হওয়া উচিত নগরায়ণ সম্পর্কিত জাতীয় আয়োগ (National Commission

on Urbanization) অনুমোদিত 'ঘন-বসতি', কিন্তু বাড়িগুলির উচ্চতা কম (high density, but low-rise housing) এমন ধরনের।

৬৬.৬ সারাংশ

এই এককে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম রৈখিক পারম্পর্য বা রৈখিক ধারাবাহিকতার বিষয়ে। জানলাম ইংরেজিতে যাকে Continum বলে, নগর সমাজতত্ত্বের চর্চায় তাকেই রৈখিক পারম্পর্য বা রৈখিক নিরবচ্ছিন্নতা—এইরকম নানা নামে বোঝানো হয়। এঁর সংজ্ঞাগত অর্থ হল কোনোকিছুর মধ্যে বিভাজন বা ভেদরেখা না টানা। Continum বা ধারাবাহিকতা এই ধারণাটিকে নগর-সমাজতত্ত্বের আলোচনায় Rurai Urban Continuum বা 'গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্য বা রৈখিক ধারাবাহিকতা' এই নামে অভিহিত করা হয় এবং বলা হয় যে গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্যের ধারণা হচ্ছে গ্রাম-শহরের বিভাজনের ধারণার একটি বিপরীত ধারণা। অতীতদিনের মতো এখন আর শহর এবং গ্রামের মধ্যে তীব্র পার্থক্য দেখা যায় না; তাই একটি সমরৈখিক ধারাবাহিকতার দুই প্রান্তে গড়ে উঠেছে গ্রাম ও শহরের আধুনিক অবস্থান। সমাজতত্ত্ববিদ্ রবার্ট রেডফিল্ড সর্বপ্রথম এই রৈখিক পারস্পর্যের বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন যে, লোকসমাজ বা ছোট গ্রাম থেকে বড় বড় শহর পর্যন্ত বিস্তৃত মানুষের বসতিবিন্যাসের মধ্যে নানারকমের ক্রম ও পর্যায় রয়েছে এবং রেডফিল্ডের ধারণা অনুসারে তিন ধরনের সমাজ গড়ে উঠেছে—লোকসমাজ (Folk Society), গ্রামীণ সমাজ (Rural Soceity) এবং পৌর সমাজ (Urban Society)। রবার্ট রেডফিল্ড (Robert Redfield) প্রথম প্রবক্তা হলেও অন্যান্য কয়েকজন সমাজতত্ত্ববিদ্ এই বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। যেমন—১৯৬৬ সালে আর. ফ্র্যাঙ্কেনবার্গ (R. Frankenberg) গ্রাম ও শহরের পার্থক্যের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েও বলেন যে দুই সমাজের মধ্যে যথেষ্ট সংযোগ আছে। পার্থক্যের কারণ হিসাবে তিনি নির্দেশ করেছেন সামাজিক শ্রেণির অবস্থানকে। অপরদিকে, সমাজতত্ত্ববিদদ্বয় অগ্‌বার্ন ও নিম্‌কফ সমষ্টির প্রেক্ষিতে (from perspective of community) শহর ও গ্রামের রৈখিক ধারাবাহিকতার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী পাহ্‌ল (Pahl)-ও গ্রাম-শহরের মধ্যে তীব্র ভেদরেখা না টেনে একটি রৈখিক পারম্পর্য গড়ে তোলার বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল শহরগুলির একটি আধিপত্য বিস্তার করার প্রবণতা আছে এবং এই প্রবণতার ফলে শহরগুলি গ্রাম ও গ্রামীণ জীবনের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। নগরবিজ্ঞানী লুইস মামফোর্ড (Lewis Mumford) শহরগুলিকে ছটি ভাগে ভাগ করে বলেছেন যে এই বিভাজন কোনো ঐতিহাসিক সত্য নয়। তবে মামফোর্ড চেয়েছেন শহর বা নগরগুলির কেন্দ্রীকরণ নয়, বিকেন্দ্রীকরণ। আগেই আপনাদের বলেছি, উন্নত দেশে নয়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলিতে গ্রাম-শহরের রৈখিক পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতা' হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ভারত, পাকিস্তান বা আফ্রিকাতে এই বিষয়ে যেসব সমীক্ষা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাকিস্তানে আয়ার্ড, আফ্রিকাতে কে. এর সমীক্ষা ইত্যাদি। ভারতবর্ষে যেসব পর্যালোচনা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এম. এস. এ. রাও; এমস্, এম. এন. শ্রীনিবাস, ডি. এন. মজুমদার-কৃত সমীক্ষা। এইসব সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছ গ্রামীণ জীবনের ওপর শহরের বহুমুখী ও দূরবিস্তারী প্রভাব। তবে শুধু সমাজতত্ত্ববিদ্‌রাই নন, নগর-ভৌগোলিকেরাও তাদের গবেষণার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের রৈখিক ধারাবাহিকতার আলোচনাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন।

তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি এই এককে গ্রাম ও শহরের রৈখিক ধারাবাহিকতার বিষয়ে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে কলকাতা মহানগরের ভবিষ্যৎ ছবিকে তুলে ধারা হয়েছে। শহরের প্রভাব শুধু নয়, শহরের

ভৌগোলিক সীমাকে বিস্তৃত করে কীভাবে 'Continuum' গড়ে তোলা যায় এবং বর্ধিত জনসংখ্যার সমস্যাকে কীভাবে সমাধান করা যায় তা বলা হয়েছে।

৬৬.৭ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

রৈখিক পারম্পর্য বা ধারাবাহিকত	—	Continuum
গ্রাম-শহরের রৈখিক ধারবাহিকতা	—	Rural-Urban Continuum
গ্রাম-শহরের বিভাজন	—	Rural-Urban Dichotomy
লোকসমাজ	—	Folk Society
গ্রামীণ সমাজ	—	Rural Society
পৌরসমাজ	—	Urban Society
সমষ্টি	—	Community
ক্ষুদ্রতম গ্রাম	—	Hamlet
গ্রাম	—	Village
পৌর পরিষেবা	—	Municipal Services
মহানগর বা প্রধান নগর	—	Metropolis
ধরন	—	Type
মাত্রা	—	Degree
বিশেষীকরণ	—	Specialisation
সামাজিক বিচলনীয়তা	—	Social Mobility
আমরা বোধ	—	We-feeling
শহর-বাসিন্দা	—	City-dweller
জটিলতা	—	Complexity
ভিন্নজাতীয়	—	Heterogeneous
সমজাতীয়	—	Homogeneous
প্রাথমিক গোষ্ঠী	—	Primary group
অপ্রত্যক্ষ	—	Indirect
নৈর্ব্যক্তিক	—	Impersonal
যান্ত্রিক	—	Mechanical
প্রতিন্যাস	—	Attitude
বৈপরীত্যের আবাসস্থল	—	Home of opposites
জীবনযাপন পদ্ধতি	—	Way of life
একাধিক গোষ্ঠী	—	Multigroup
গৌণ নগরায়ণ	—	Secondary Urbanisation
প্রাথমিক নগরায়ণ	—	Primary Urbanisation
কলকাতা মহানগর এলাকা	—	Calcutta Metropolitan Region

কলকাতা মহানগর জেলা	—	Calcutta Metropolitan district
পৌর বিক্ষেপণ	—	Urban sprawl
উপকণ্ঠের তাৎপর্য	—	Significance of the periphery
কলকাতা মহানগর অঞ্চল	—	Calcutta Metropolitan Area
হস্তপ্রসারিত মানুষ	—	Outstretched Man
নগরায়ণ সম্পর্কিত জাতীয় Urbanisation আয়োগ	—	National Commission in
ঘন বসতি	—	High density
কম-উচ্চতাবিশিষ্ট বাড়ি	—	Low-rise housing

কয়েকজন সমাজতাত্ত্বিকের নাম :

রবার্ট রেডফিল্ড	—	Robert Redfield
আর. ফ্রাঙ্কেনবার্গ	—	R. Frankenberg
অগ্‌বার্ন ও নিমকফ্	—	Ogburn and Nimkoff
ফার্দিনান্দ টয়েনীজ	—	Ferdinand Tonnies
আর. ই. পাহ্‌ল	—	R. E. Pahl
সোরোকিন ও জিম্যারম্যান	—	Sorokin and Zimmerman
ম্যাকাইভার ও পেজ	—	Maclver and Page
অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার	—	Oswald Spengler
লুইস মামফোর্ড	—	Lewis Mumford
ব্রিজরাজ চৌহান	—	Brijraj Chouhan
মিল্টন সিঙ্গার	—	Milton Singer
জে. আয়ার্ড	—	J. Aird
জি. কে	—	G. Key
এম. এস. এ. রাও	—	M. S. A. Rao
এম. এন. সিঙ্গার	—	M. N. Singer
ই. এমস্	—	E. Eames
এ. আর. বিলস্	—	A. R. Beals
আর. ডি. ল্যামবার্ট	—	R. D. Lambert
আর. এ. এলেফ্‌সন	—	R. A. Ellefson

৬৬.৮ অনুশীলনী

(১) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য আর কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।

(ক) গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্যের ধারণা হচ্ছে গ্রাম-শহরের বিভাজনের ধারণার সমার্থক।

(খ) সমাজতত্ত্বের আলোচনায় রৈখিক পারম্পর্যের ধারণার প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন রবার্ট রেডফিল্ড।

(গ) ফার্দিনান্দ টয়েনীজ 'গেমেনস্যাফট' বলতে 'সমিতি'-কে বোঝাতে চেয়েছেন।

(ঘ) শহরবাসীদের মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য থাকে যেমন, তেমন থাকে সামাজিক নৈকট্য।

(ঙ) গ্রামে সমজাতীয় উপাদানের সমাবেশ দেখা যায়।

(চ) 'শহর বা নগর হচ্ছে বৈপরীত্যের আবাসস্থল'—এই কথা বলেছেন সমাজতাত্ত্বিকদ্বয় অগ্‌বার্ন ও নিমকফ্।

(ছ) গ্রাম ও শহরের বৈষম্যের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পরিযান।

(জ) গ্রাম ও শহরের মিথস্ক্রিয়ার বিভিন্ন ধরন ও মাত্রা আছে।

(ঝ) কলকাতা মহানগরীর বয়স হচ্ছে ৩১২ বছর।

(ঞ) নগরায়ণ-সম্পর্কিত জাতীয় আয়োগ অনুমোদিত আবাসনের ধরন হওয়া উচিত 'ঘন-বসতিপূর্ণ, কিন্তু কম উচ্চতাবিশিষ্ট বাড়ি'।

(২) ৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন :

(ক) গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতা কাকে বলে?

(খ) গ্রাম ও শহরের বৈপরীত্য বলতে কী বোঝায়?

(৩) ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন :

(ক) শহরের আধিপত্য বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের মতামত।

(খ) রৈখিক পারম্পর্য (গ্রাম ও শহরে) বিষয়ে কয়েকটি পর্যালোচনা।

(গ) গ্রাম ও শহরের ধারাবাহিকতা বিষয়ে রবার্ট রেডফিল্ডের ধারণার ব্রিজরাজ চৌহান-কৃত সমালোচনা।

(ঘ) কলকাতা মহানগরীর প্রেক্ষাপটে রৈখিক পারম্পর্যের যে ভবিষ্যৎ ছবি পাওয়া যায় "রিজিওনাল পার্সপেক্টিভ : ২০০১"-এর আলোচনায়, সেই সম্পর্কে।

৬৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) অগ্‌বার্ন অ্যান্ড নিমকফ্—*আ হ্যান্ডবুক অফ সোশিওলজি*, লণ্ডন, ১৯৬০।

(২) ম্যাকাইভার অ্যান্ড পেজ—*সোসাইটি, অ্যা ইনট্রোডাকটরি অ্যানালিসিস*, ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোঃ লিটিটেড, লন্ডন, ১৯৫৯।

(৩) রাও, এম. এস. এ., ভাট, সি., কাদেকার, এল. এন.—(*এডিটেড*) *আ রীডার ইন আরবান সোশিওলজি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯১।

(৪) সোরোকিন অ্যান্ড জিমারম্যান—*প্রিন্সিপিলস্ অফ রুরাল আরবান সোশিওলজি*।

(৫) গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল—*ক্যালকাটাস্ আরবান ফিউটার, কলকাতা*, ১৯৯১ (এডিটেড বাই দাসগুপ্ত, ভট্টাচার্য, বসু, চ্যাটার্জী)।

(৬) উন্নিথান, দেবা অ্যান্ড সিং—(*এডিটেড*) *টুওয়ার্ডস এ সোশিওলজি অফ কালচার ইন ইন্ডিয়া*, প্রেন্টিস্ হল, *ইন্ডিয়া*, ১৯৬৫।

একক ৬৭ ☐ আধুনিক শহরের বিকাশ

গঠন

৬৭.১ উদ্দেশ্য

৬৭.২ প্রস্তাবনা

৬৭.৩ শহর ও নগরের পার্থক্য

৬৭.৩.১ চিরাচরিত শহর

৬৭.৩.২ ইউরোপ ও আমেরিকায় শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ

৬৭.৩.৩ আফ্রিকা এবং এশিয়ায় শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ

৬৭.৪ প্রাক্-শিল্প শহর এবং শিল্প শহর

৬৭.৪.১ শহর ও নগরর শ্রেণিবিভাগ

৬৭.৪.২ আধুনিক শহরের বিকাশ

৬৭.৪.৩ পৌরপুঞ্জ, পৌর মহাপুঞ্জ ও মহানগর

৬৭.৫ ভারতবর্ষে আধুনিক শহরের বিকাশ

৬৭.৬ সারাংশ

৬৭.৭ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

৬৭.৮ অনুশীলনী

৬৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬৭.১ উদ্দেশ্য

এই একক আমরা আধুনিক শহরের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব। এই একক অধ্যয়নের পর আশা করা যায় যে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন। যেমন—

- শহর ও নগরের পার্থক্য;
- চিরাচরিত শহর বলতে কী বোঝায়?
- ইউরোপে শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ;
- এশিয়া ও আফ্রিকায় শহরের বিকাশ;
- বিভিন্ন নগর-সমাজতত্ত্ববিদদের ধারণা অনুসারে শহর এবং নগরের শ্রেণিবিভাজন;
- পৌরপুঞ্জ, পৌর মহাপুঞ্জ এবং মহানগর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা।

৬৭.২ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল রৈখিক পারম্পর্য সম্পর্কিত একটি সাধারণ ধারণা, বর্তমান এককে আমরা আধুনিক শহরের বিকাশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আলোচনার প্রারম্ভে শহর এবং নগরের পার্থক্য, চিরাচরিত প্রাচীন শহরগুলির ইতিহাস, ইউরোপ-আমেরিকা এবং আফ্রিকা-এশিয়ায় বিভিন্ন শহরের উৎপত্তি এবং বিকাশ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের অবতারণা করা হবে।

পরবর্তী অংশে প্রাক্-শিল্প শহর এবং শিল্প শহরের প্রকৃতি, শহর এবং নগরের শ্রেণিবিভাজন সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ এবং ভূগোলবিদ্‌দের অভিমত, আধুনিক শহরের বিকাশ, পৌরপুঞ্জ, পৌর মহাপুঞ্জ এবং মহানগর সম্পর্কিত ধারণা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এর পরেই অনিবার্যভাবে এসে পড়ে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ। এই অংশে আমাদের দেশে আধুনিক শহরের বিকাশের ধারাকে তুলে ধরা হবে।

৬৭.৩ শহর ও নগরের পার্থক্য

মূল বিষয় অর্থাৎ এই এককের যেটি কেন্দ্রীয় বিষয়—'আধুনিক শহরের বিকাশ'—এই সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আপনাদের জানা প্রয়োজন 'শহর' এবং 'নগর'-এর সঠিক সংজ্ঞা; কারণ ইংরেজিতে 'শহর' এবং 'নগর'-কে যথাক্রমে town ও city বলা হলেও আমাদের ব্যবহারিক আলোচনায় পরিধিতে সাধারণত 'শহর' শব্দটাই বেশিমাত্রায় প্রচলিত। অবশ্য urbanisation শব্দটাকে আমরা বাংলায় 'নগরায়ণ' বলি। অতীতকালেও শহর এবং নগরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করা হত না। তাই যে-কোনো পৌর বসতিকেই 'নগর' বলা হত, কারণ সেই সময়ে পৌর বসতির বৈশিষ্ট্য কিংবা পৌর পরিষেবার কার্যবিধিগুলো তেমন সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হতে পারেনি। আমরা জানি যে শহর এবং নগরের মূল পৌর বৈশিষ্ট্যগুলো মোটামুটিভাবে একইরকম, তবু তাদের মধ্যে কিছুক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। ভারতবর্ষে কোনো পৌর বসতির জনসংখ্যা এক লক্ষ অতিক্রম করলে তাকে 'নগর' বা city আখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণভাবে, আয়তনের দিক থেকে 'শহরের' থেকে 'নগর' অনেক বড় এবং শহরের তুলনায় নগরের পৌর জীবনের মান অনেক বেশি উন্নত হয়। তাছাড়া, প্যাট্রিক গেডেসের (Patrick Geddes) মতো বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ 'নগর' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে 'সভ্যতার মূর্ত রূপ হচ্ছে নগর' (a city is a concrete image of a civilization)—তাই সাধারণ আলোচনাতেও 'নগর'কে বলা হয় সভ্যতার পীঠস্থান। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, বৃত্তিমূলক পড়াশোনার সুযোগ-সুবিধা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলার বিকাশ 'নগর'-কে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে এবং এগুলিই হয়ে ওঠে নগরের নানা বৈশিষ্ট্য—যা শহরের ক্ষুদ্র পরিসরে গড়ে ওঠা সম্ভবপর নয়। যুক্তরাজ্যে (United Kingdom) দেখা গেছে যে সাধারণ ক্যাথিড্রালবিশিষ্ট শহরকেই 'নগর' আখ্যা দেওয়া হয়। তাহলে দেখা গেল যে 'শহর' ও 'নগরের' মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্যের মাত্রা বা মানের (standard) ক্ষেত্রে কিছু কিছু ফারাক আছে। তবে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য দেশে 'মহানগর'গুলোকে ইংরাজিতে metropolitan city বলা হলেও ব্যবহারিক কথাবার্তায় তাদের 'শহর' বলেই চিহ্নিত করা হয়। যেমন, 'কলকাতা

মহানগরী'কে আমরা কলকাতা শহর বলি তেমনি 'চেন্নাই', 'মুম্বাই' বা 'দিল্লীর' ক্ষেত্রেও 'শহর' শব্দটাই ব্যবহার করি। এখানে তাই আপনাদের বলা দরকার যে সংজ্ঞাগত দিক থেকে 'শহর' ও 'নগরের' মধ্যে পার্থক্য থাকলেও আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা 'শহণ' শব্দটাই এই এককে ব্যবহার করব, যদিও ইংরেজিতে তা 'city' বলেই স্বীকৃত হয়েছে।

৬৭.৩.১ চিরাচরিত শহর

চিরাচরিত প্রাচীন শহরগুলো ছিল আধুনিক শহরের আয়তনের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে ছোট। ব্যাবিলনের মতো প্রাচীন শহরের বিস্তৃতি ছিল মাত্র ৩.২ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে এবং জনসংখ্যা ছিল ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০-এর মধ্যে। গৌরবের শীর্ষ সময়ে ব্যাবিলনের জনসংখ্যা এক লক্ষও হয়নি। পৃথিবীতে নগর-বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পৃথিবীতে প্রথম শহরগুলো গড়ে উঠেছিল নীলনদের উপত্যকায়—মেমফিস্, থেবস্ প্রভৃতি এবং সিন্ধুনদের উপত্যকায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর। মিশর এবং ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের উত্থানের পর তাদের প্রধান প্রধান শহরগুলো বহুদূরের অঞ্চল থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করত এবং এইভাবেই তারা ক্রমশ বিকাশলাভ করেছিল। প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতায় যেসব শহরগুলোর জন্ম হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এরিডু, লাগাস এবং উর। শহরের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের প্রাচীনতম নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী-উপত্যকায়। এইসব শহরগুলোর জন্ম হয়েছিল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ থেকে ২৬০০-এর মধ্যে। এরপরে চীনদেশেও বহু বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল, যেমন মধ্য হোয়াং-হো উপত্যকায় আনয়াং (Anyang), লেভান (Levant) উপকূলে উগারিত (Ugarit) ও ব্যবল্স (Byblos) প্রভৃতি। প্রাচীন এই শহরগুলির গড়ে ওঠা ও বিকাশের মধ্যে কতকগুলো সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যদিও তাদের সভ্যতার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন ভিন্ন। শহরগুলো ছিল সাধারণত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা—নিরাপত্তার কারণে এই প্রাচীরের ব্যবহার করা হয়েছিল এই কারণটি মেনে নেওয়া গেলেও, এ কথাও অবশ্য ঠিক যে এই উঁচু প্রাচীরনগরে বসবাসকারী মানুষকে গ্রামের মানুষজন থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। প্রাচীন এই শহরগুলোতে একেবারে মধ্যবর্তী স্থানে ছিল একটা বিরাট জায়গা যা আবার দ্বিতীয় একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। মধ্যবর্তী এক স্থানে বাজারের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা থাকলেও এই স্থানটি আধুনিক শহরে যেমন দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা (Central Business District) তার থেকে একেবারেই আলাদা ধরনের ছিল। কক্স (১৯৬৪), জোবার্গ (১৯৬০) এবং Wheatley হোয়েটলের (১৯৭১) মতো নগরবিষয়ক গবেষকরা আমাদের জানিয়েছেন যে প্রধান প্রধান অট্টালিকাগুলো ছিল মূলত ধর্মীয় বা পৌর প্রতিষ্ঠানের যেমন মন্দির, বড় বড় প্রাসাদ বা আদালতের কাছে অবস্থিত। অভিজাত সম্প্রদায় ও শাসকশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় স্থানের কাছে বাস করতেন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিরা শহরের প্রান্তে কিংবা তার বাইরে বাস করতেন। কিন্তু হঠাৎ যদি শত্রুপক্ষ আক্রমণ করত, তাহলে তারা শহরের মধ্যবর্তী বা কেন্দ্রীয় স্থানের কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারতেন। প্রাচীন এই শহরগুলোতে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষজন নিয়ে আলাদা বসতি গড়ে উঠেছিল; কোথাও কোথাও এই বসতিগুলো ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ফলে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক স্থানের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা থাকতেন এবং কাজ করতেন।

প্রাচীন শহরগুলোতে উন্নত ধরনের রাস্তার ব্যবস্থা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হত; তবে সাধারণত সৈন্যবাহিনী ও বণিক সম্প্রদায়ের মানুষজন রাস্তার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা

করত। সাধারণ মানুষজনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না, বিশেষ করে আধুনিক শহরে যাকে "স্ট্রীট" (Street) বলা হয়—তেমন রাস্তা খুবই কম ছিল। বেশিরভাগ মানুষজনের বাসস্থান আর কর্মস্থান একই জায়গায়, এমনকি একই ঘরে ছিল। তাই সেই সময় আধুনিক শহরে যেমন দেখা যায় "কর্মের প্রয়োজনে অন্যত্র যাওয়া", (journey to work) তা প্রায় অজানা ছিল।

শহরগুলো ছিল শিল্প-কলা-সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার মূল কেন্দ্র এবং নাগরিক সভ্যতার পীঠস্থান। শহরের লোকসংখ্যা ছিল কম এবং গ্রাম ও শহরের মধে বিভাজন ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। গ্রামীণ জীবনে তাই নাগরিক সভ্যতার প্রভাবও ছিল আধুনিক যুগের তুলনায় অনেক কম।

৬৭.৩.২ ইউরোপ ও আমেরিকায় শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ

ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যে পূর্ব ইউরোপে শহরবসতির অস্তিত্ব সর্বপ্রথম দেখা গিয়েছিল এবং নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ ধরনের শিল্প ছোট ছোট শহরে বিকাশলাভ করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম এবং সপ্তম শতাব্দীতে গ্রীস দেশে জন্ম হয়েছিল গ্রীক রাষ্ট্র-শহরের (city state)। তার বাণিজিক কর্মধারা ব্যাপ্ত হয়েছিল পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। এর ফলে জন্ম হয়েছিল মাসিলিয়া (Massilia), সাইরাকিউস (Syracuse) এবং কুমা'র (Cuma) মতো ঔপনিবেশিক বসতির। পরবর্তী সময়ে রোম সাম্রাজ্যের বিকাশ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ অংশে নগরজীবনের সূচনা করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রোম শহরের আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল দু'লক্ষের মতো। রোম সাম্রাজ্যের অধীন ইউরোপের অন্যান্য অংশে নানা ধরনের শহর গড়ে উঠেছিল এবত এই শহরগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল উন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আয়তন ও মানের নিরিখে এদের বিভিন্নতা। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শহর পরিবর্তিত হয়েছে, কোনো শহর ধ্বংস হয়ে গেছে, আবার কোনো শহরের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক কমে গেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা বিস্ময়ের ব্যাপার তা হল যে, আপনারা অনেকেই জানেন যে অনেক প্রাচীন শহর যেমন প্যারিস, লন্ডন কিংবা কোলোন (Colegene) আজ পর্যন্ত আধুনিক ইউরোপের প্রধান নগর হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

উত্তর আমেরিকায় নগরায়ণের সূত্রপাত করেছিল ইউরোপীয়রা, বিশেষ করে ফরাসী ও ইংরেজরা। হাডসনের মতো নগর-ভৌগোলিকেরা আমাদের জানিয়েছেন যে দক্ষিণ আমেরিকায় নগরজীবনের সূচনা করেছিল স্পেনীয় ও পোর্তুগিজরা। নতুন গড়ে ওঠা নগরজীবনে মানুষের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিল ছোট ছোট বাজার ও সেবা-কেন্দ্র (Service Centre) এবং বিভিন্ন ধরনের শহর বসতি সমুদ্রবন্দর হিসেবে জন্ম নিয়েছিল। কালক্রমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে অর্থাৎ জলপথ ও রেলপথ গড়ে উঠলে দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ করা সহজতর হয়েছিল। এর ফলে বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র এবং শিল্পকেন্দ্র এই নতুন শহরগুলোতে গড়ে উঠল। এদের মধ্যে মন্ট্রিল, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বুয়েনস্ এয়ার্স এবং রিও-ডি-জেনেরো উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে উত্তর আমেরিকার অভ্যন্তরভাগে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটলে বড় বড় শহরের উৎপত্তি হয়েছিল, যেমন—পিটস্‌বার্গ, চিকাগো, ডেট্রয়েট এবং সেন্ট লুইস। উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগর উপকূল অঞ্চলে প্রচণ্ড জনসংখ্যাবৃদ্ধি লস এঞ্জেলস্ স্যান ফ্রান্সিকো, সিটল ও ভ্যাঙ্কুভার ইত্যাদি নগরের দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন তথ্য ও পর্যালোচনা থেকে জানা যায় যে ১৮৬০ সালে লস এঞ্জেল্‌সে মাত্র হাজার পাঁচেক (৫০০০) লোক বাস করত, কিন্তু ১৯০০ সালে এই শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষে এবং ১৯৩২ সালে দশ লক্ষ পৌঁছেছিল। বর্তমানে লস এঞ্জেল্‌সে প্রায় এক কোটির মতো লোকসংখ্যা

এর বিরাট মহানগর (Metropolis) এলাকায় বাস করে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে (United States) এক লক্ষের মতো জনসংখ্যা বিশিষ্ট দুশোটি নগর (city) আছে।

৬৭.৩.৩ আফ্রিকা এবং এশিয়ায় শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ

আফ্রিকা ও এশিয়া—এই দুই মহাদেশে পৃথিবীর কয়েকটি প্রাচীনতম শহরের জন্ম হয়েছিল। তবে এই দুই মহাদেশের নগরের উত্থানের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা হয়—তাহলে দেখা যাবে যে এই দুই মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় অনুকূল স্থান ছাড়া নগর বা শহরের বিকাশ সম্ভবপর হয়নি। আফ্রিকা মহাদেশে চিরদিনই অল্পসংখ্যক নগর রয়েছে। পূর্ব উপকূলে মোগাডিসু (Mogadishu) ও জাঞ্জিবারের মধ্যবর্তী স্থানে আরব বণিকেরা কয়েকটি মধ্যযুগীয় শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং এগুলো 'দাস বন্দর' (Slava Ports) হিসাবে পরিচিত ছিল। সাহারার দক্ষিণে পৌর বসতি সম্পর্কে অধিকাংশ লোকের কোনো ধারণা ছিল না। কোনো (Kano) ও বেনিন-এর (Benin) মতো প্রাচীরবেষ্টিত শহর ছিল পশ্চিম আফ্রিকার স্থানীয় দেশীয় রাজ্যের রাজধানী। আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সম্পদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয়রা কয়েক জায়গায় বন্দর এবং সামরিক ছাউনি তৈরি করে। এর ফলে জন্ম হয় মোম্বাসা (Mombasa) আক্রা (Accra) ও লাগোস (Lagos)-এর মতো শহর। এর পরে আফ্রিকায় আরও কয়েকটি শহর গড়ে ওঠে, মূলত প্রশাসন কেন্দ্র হিসাবে। যেমন—নাইরোবি (কেনিয়ার রাজধানী কিন্তু মূলত উগাণ্ডা রেলপথের সদরদপ্তর), সলিসবেরি (রোডেসিয়ার রাজধানী) এবং জোহান্সবার্গ (আফ্রিকার সবচেয়ে বড় শিল্প ও আর্থিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে পরবর্তী সময়ে)। আফ্রিকায় ২০,০০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহর রয়েছে। আলজিরিয়া, মরক্কো, সেনেগাল, মিশর এবং টিউনিসিয়াতে এবং এইসব দেশে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় শহরগুলো অবস্থিত। যেমন—কেপটাউন, ডারবান, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, আলজিয়ার্স ইত্যাদি। বর্তমান সময় পর্যন্ত, দেখা গেছে, এই মহাদেশে শিল্প নগরের সংখ্যা তেমন বেশি নয়, তবে সাধারণ শহরের সংখ্যা বাড়ছে।

এশিয়া মহাদেশে লক্ষ্যণীয় এই যে, চীন বা ভারতের চেয়ে জাপান নগরায়ণের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে আছে, যদিও এখানে পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তারের সময়কাল মাত্র এক শতাব্দী। জাপানে এক লক্ষ লোকসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের সংখ্যা দেড়শোটি (১৫০) এবং মহানগরের সংখ্যা আট (৮)। জাপানে বড় বড় শহরগুলো হচ্ছে সেই দেশের শিল্প এবং বাণিজ্যকেন্দ্র। টোকিও, নাগোয়া এবং কিয়োটোর মতো বড় শহরগুলোর উত্থান ঘটেছিল অতীতের গর্ভ থেকে। টোকিও, নাগোয়া সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যের প্রতিরক্ষা কেন্দ্র হিসাবে বিকাশলাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে টোকিওতে লোকসংখ্যা ছিল দশলক্ষ এবং সেই সময়ে জনসংখ্যার নিরিখে চীনের রাজধানী পিকিং (বর্তমানে বেজিং) ছাড়া পৃথিবীর যে-কোনো নগরের চেয়ে টোকিও (Tokyo) বড় ছিল।

এশিয়া মহাদেশে পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তারের আগে পর্যন্ত চীন ও ভারতবর্ষের মতো দেশে শহর বসতি বলতে বড় বড় কৃষি বাজারকেই বোঝাত। রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, ম্যানিলা, মাদ্রাজ (বতর্মানে চেন্নাই), বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই) এবং কলকাতার মতো বড় বড় নগরগুলো বিদেশী প্রশাসক এবং বণিকরা গড়ে তুলেছিল সমুদ্র বন্দর হিসাবে এবং সেই সময় এইসব শহরগুলোর কাজ ছিল ইউরোপীয় বাণিজ্যের যোগান (supply) এবং বন্টন (distribution) ব্যবস্থা চালু রাখা। ভারতবর্ষ এবং চীনের মতো কৃষিভিত্তিক দেশগুলোতে প্রধান

শহরগুলো হচ্ছে অতীতকালের প্রশাসনিক রাজধানী; যেমন—আগ্রা, হায়দ্রাবাদ, পুরোনো দিল্লী, পিকিং এবং নানকিং, এছাড়া বেনারসের মতো ধর্মীয় শহরের অস্তিত্ব অতীত দিনেও ছিল।

৬৭.৪ প্রাক্-শিল্প এবং শিল্প শহর

বিভিন্ন নগর-সমাজতত্ত্ববিদ ও নগর-ভূগোলবিদ্দের পর্যালোচনা ও সমীক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে পশ্চিম নগর সম্পর্কে এ পর্যন্ত ব্যাপক অনুসন্ধান হয়েছে। পশ্চিমী নগরগুলোর বিকাশ যেহেতু শিল্পোন্নয়নের (Industrial development) সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, তাই এগুলোকে সাধারণত শিল্প নগর (Industrial city) বলা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, তুলনামূলকভাবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার শহরগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান কমই হয়েছে। এখানে আপনাদের বলা দরকার যে এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল Sjoberg (জোবার্গ)-এর "The Pre-Industrial City" নামক গ্রন্থটি, যেখানে তিনি উপস্থাপিত করেছেন ইউরোপের এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের প্রাক্-শিল্প যুগের নগরায়ণ সম্পর্কে আলোচনা। জোবার্গের মতানুসারে, তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে সমাজ গড়ে উঠেছিল। প্রথম পর্যায়ে কোনো শহরের অস্তিত্ব ছিল না—এই পর্যায়ে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন জনসমাজ ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে জোবার্গ বলেছেন কৃষি-সমাজের কথা, যা বংশপরম্পরা অনুসরণ করেছে এবং এই সমাজের বৈশিষ্ট্য হল জনগণের সীমিত কারিগরী জ্ঞান। তৃতীয় বা শেষ পর্যায় হল শিল্পনির্ভর উন্নত শহরভিত্তিক সমাজ।

প্রাক্-শিল্প শহরগুলো (Pre-industrial City) ছিলি বেশিরভাগ পুরোনো। এদের প্রত্যেকটিরজনসংখ্যা ছিল ৫০,০০ -এর বেশি। তবে এই শহরগুলোতে বসতিবিন্যাস ছিল স্থায়ী এবং পরিকল্পনাহীন, ফলে বাসগৃহগুলো ছিল কাছাকাছি-ঘেঁষা। পরিকল্পনা না থাকার জন্য এই শহরগুলোতে দোকানপাট, বাড়িঘর এবং কর্মস্থল কোনো নির্দিষ্ট বিন্যাস-অনুসারে গড়ে ওঠেনি। প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হত শহরের চারদিকে দেয়াল দিয়ে বেষ্টন করে বা পরিখা দিয়ে ঘিরে। আগেই বলা হয়েছে যে শিল্প-নগর বা শহরগুলো ছিল শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থাৎ শহরায়ণ বা নগরায়ণ প্রক্রিয়া বিস্তৃত হয়েছিল শিল্পায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়েই এই দুই প্রক্রিয়ার প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল। পৃথিবীর বুকে ব্রিটেনই হচ্ছে প্রথম সমাজ, যেখানে শিল্পায়ন শুরু হয়েছিল এবং এরই ফলশ্রুতিতে ব্রিটেন একটি গ্রামীণ সমাজ থেকে পুরোপুরি শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত হয়েছিল। ব্রিটেনের পুরোনো শহরগুলোতে শিল্পোদ্যোগ দেখা দিয়েছিল এবং কয়লাখনি অঞ্চলগুলিতে গড়ে উঠেছিল নতুন শিল্প-শহর। বড় বড় শহরগুলোতে রাস্তার দুপাশে শ্রমিকদের জন্য আবাসস্থল গড়ে তোলা হয়েছিল। রাজধানী শহর লন্ডনে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জনসংখ্যা ছিল ১ : ১ মিলিয়ন, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এই জনসংখ্যা এক লাফে গিয়ে পৌঁছোয় ৭ মিলিয়নের চেয়েও বেশি। সেই সময়ে লন্ডন শহর ছিল পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ শহর—যা দ্রুত বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরী উৎপাদক কেন্দ্র বলে গণ্য হত। কারিগরী অগ্রগতির যুগে এই শিল্প-শহরগুলোতে পৌর পরিষেবা পাওয়া যেত ঠিকই, কিন্তু এই ব্যবস্থা তেমন খুশি করতে পারেনি লুই মামফোর্ডের (Lewis Mumford) মতো বিখ্যাত নগর সমাজতত্ত্বদিকে, যার জন্য তিনি মন্তব্য করেছেন যে শিল্পের উন্নতি হলেও এই শহরগুলোতে মানুষের সামাজিক সত্তা তেমনভাবে আবিষ্কৃত হয়নি। মামফোর্ড আরও বলেছেন, কিছু আধুনিক ও উন্নত ব্যবস্থা ছাড়া এইসব শিল্প-শহর (Industrial city) সপ্তদশ শতাব্দীর শহরের চেয়ে তেমন উন্নত ছিল না।

যাই হোক, শিল্পায়নের পর ব্রিটেনে যেমন পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার কয়েক দশক পর একই ধরনের পরিবর্তন দেখা গেল ফ্রান্স, জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্রে (United States)। কারিগরী পরিবর্তন সূচিত হওয়ার ফলে শহরগুলো আয়তনে বৃদ্ধি পেতে লাগল। শহর এবং শহরতলিতে ট্রাম, বাস, পাতাল-রেল, রেল এবং ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ার জন্য মানুষ নিজেদের কর্মস্থল থেকে অনেকটা দূরে বসবাস করার সুযোগ পেয়েছিল। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলোতে অধিকাংশ পশ্চিমী শহরগুলো নিজেদের পরিধি ছাড়িয়ে আরও দূরে বিস্তৃত হল। শহরের এই বিস্তৃতির জন্য শহরের ঘনসংবদ্ধ নির্মিত এলাকা (Compact built-up area) এবং তার লাগোয়া গ্রামাঞ্চলের চিরাচরিত পার্থক্য মুছে গিয়েছিল। শহরতলিতেও শহরের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার কারণে এই অঞ্চলে শহরের মতো বড় বড় অট্টালিকা গড়ে উঠতে লাগল।

৬৭.৪.১ শহর ও নগরের শ্রেণিবিভাগ

শহর ও নগরের ক্রিয়াকলাপের ওপর নির্ভর করে নগর সমাজতত্ত্ববিদ ও ভূগোলবিদরা শহর ও নগরের নানাধরনের শ্রেণিবিভাজন করেছেন। আধুনিক শহরের বিকাশের আলোচনায় এই শ্রেণিবিভাজন সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা আমাদের প্রয়োজন। আর. ডি. ম্যাকেঞ্জি, সি. ডি. হ্যারিস্ এবং এইচ. জে. নেলসন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে শহর ও নগরের শ্রেণিবিভাজন করেছেন।

আর. ডি. ম্যাকেঞ্জি (Mekenzie) অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর ভিত্তি করে পৌরবসতিগুলোকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যেমন—(১) প্রাথমিক কর্মধারাভিত্তিক, (২) ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক, (৩) শিল্পভিত্তিক এবং (৪) অনুৎপাদমূলক ক্রিয়াভিত্তিক।

সত্যি বলতে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে খুব দ্রুতলয়ে নগরায়রে বিকাশ ঘটতে থাকে, তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে যেমন বাড়তে থাকে পৌরবসতি, তেমনি বাড়তে থাকে তার নানা জটিলতা। শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রেও জটিলতা বৃদ্ধি পায়। যাইহোক, ম্যাকেঞ্জির শহর ও নগরের শ্রেণিবিভাজনের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে সি. ডি. হ্যারিস (১৯৪৩) শহরের যে শ্রেণিবিভাগ করেন, তার মধ্যে রয়েছে—(১) শিল্প শহর, (২) খুচরা ব্যবসাকেন্দ্রিক শহর, (৩) পাইকারি ব্যবসাভিত্তিক শহর, (৪) পরিবহন শহর, (৫) খনি শহর, (৬) বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রিক শহর, (৭) অবসরকালীন শহর বা স্বাস্থ্যনিবাস। হ্যারিস-কৃত অষ্টম শ্রেণিভুক্ত শহরকে হ্যারিস পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে 'শ্রেণিহীন' শহর বলেছেন, যার মধ্যে রয়েছে সামরিক শহর, কৃষি শহর, বৃত্তিমূলক কেন্দ্র এবং আঞ্চলিক রাজধানী। হ্যারিস তার শহরের শ্রেণিবিভাজনের ক্ষেত্রে শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকের ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেননি। এখানে মনে রাখা দরকার যে হ্যারিসের এই শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি হল যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩০ সালের লোকগণনা।

এইচ. জে. নেলসন্ (H. J. Nelson) ১৯৫০ সালের জনসংখ্যাকে ভিত্তি করে দশ হাজার ও তার বেশি জনসংখ্যাযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় নশোটি শহর ও নগরের বৃত্তির শ্রেণিবিভাগ করেছেন। হ্যারিসের মতো তিনিও নানাধরনের শহরের সন্ধান পেয়েছেন। যেমন—(১) খনি, (২) শিল্প, (৩) পরিবহন ও যোগাযোগ, (৪) পাইকারি ব্যবসা, (৫) খুচরা ব্যবসা, (৬) আর্থিক, (৭) ব্যক্তিগত, (৮) বৃত্তিমূলক এবং (৯) সরকারি প্রশাসনভিত্তিক।

এল. এল. পাওনালও ১৯৫০ সালে শহরের শ্রেণিবিভাগ করেছিলেন; অবশ্য তার এই বিভাজনের ভিত্তি

ছিল নিউজিল্যান্ডের ১০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলো। পাওনাল-কৃত বিভাজন নেলসনের শহরের শ্রেণিবিভাগ থেকে তেমন স্বতন্ত্র কিছু নয়। পাওনাল শহরের ছটি কর্মধারা খুঁজে পেয়েছেন, যেমন—(১) শিল্প, (২) গৃহনির্মাণ, (৩) প্রাথমিক পর্যায়ের শিল্প, (৪) পরিবহন (৫) আর্থিক, (৬) বৃত্তিমূলক কাজ।

ম্যাকেঞ্জি, হ্যারিস, নেলসন কিংবা পাওনাল (L. L. Pownall) সাধারণত বৃত্তির ওপর নির্ভর করে শহরের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। শ্রেণিবিভাগের এই গতানুগতিক পদ্ধতি থেকে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় ই. ই. বারজেল (E. E. Befgel) কৃত শ্রেণিবিভাজনে, কারণ বারজলে শহরের বৈশিষ্ট্যমূলক কাজকর্মকে গুরুত্ব দিয়েছেন বলে এর সামাজিক মূল্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাছাড়া, গুণগত বিচারের দিক দিয়ে একই শহর বা নগরকে বহু কর্মমুখী শহর (multi-functional town) বলা যেতে পারে। যেমন, উদাহরণ হিসাবে আমরা কলকাতা মহানগরীর কথা বলতে পারি। কলকাতাকে বন্দর-নগর (port city) বলা যায়, আবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্রও হচ্ছে কলকাতা।

৬৭.৪.২ আধুনিক শহরের বিকাশ

এই এককে প্রথমেই আপনাদের বলেছি যে সুদূর অতীতে 'শহর' এবং 'নগরের' মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হত না। বিংশ শতাব্দীর শুরুর থেকেই পরিসংখ্যানবিদ এবং জনসংখ্যাতত্ত্ববিদরা তথাকথিত শহর ও নগরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে শুরু করেন। কারণ আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি নানা দেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া সূচিত হবার পর শিল্পোন্নয়ন-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ শহরকে কেন্দ্র করেই আরম্ভ হয়। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ বিপুল সংখ্যায় গ্রাম থেকে শহর পরিযান (migration) নিতে থাকে এবং এর ফলে শহরে লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়তে শুরু করে। কেবল গ্রাম থেকে নয়, এক শহর থেকে অন্য শহরেও মানুষ পরিযান নেয়, তার ফলশ্রুতিতে নতুন নতুন শহর যেমন তৈরি হয়, তেমনি শহরগুলো আয়তনেও বাড়তে থাকে। অবশ্য পরিবর্তন শুধু আকারেই নয়, শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লোকজন শহরে ভিড় করায় ছোট ছোট শহর বড় নগরে রূপান্তরিত হয় এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় তার আন্তর্জাতিক চরিত্রের নতুন 'মাত্রা'। এই বড় বড় নগরগুলো স্বীকৃতি পায় 'মহানগরের'। কোনো কোনো মহানগর তাদের কোনো বিশেষ কাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। যেমন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস (Los Angels) সিনেমা শিল্প (Film industry), ডেট্রয়েট (Detroit) মোটরগাড়ি শিল্প, নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং যুক্তরাজ্যের (United Kingdom), অক্সফোর্ড (Oxford) শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে সারা পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করেছে। আধুনিক নগরায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মিলিয়ন বা দশ লক্ষ ও তার চেয়েও বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট নগরের সংখ্যাবৃদ্ধি। ১৮০০ সালে সারা পৃথিবীতে মিলিয়ন নগরের অস্তিত্বই ছিল না। এই সময়ে লণ্ডনের জনসংখ্যা ছিল ৯,৫৯,৩১০ জন। ১৮৫০ সালে পৃথিবীতে দুটো মিলিয়ন নগর ছিল—লন্ডন এবং প্যারিস। ১৯০০ সালে মিলিয়ন নগরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১১-তে, যেমন—লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, মস্কো, সেন্ট পিটসবার্গ, নিউ ইয়র্ক, চিকাগো, ফিলাডেলফিয়া, টোকিও এবং কলকাতা। এখানে আমাদের লক্ষ্য করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঐ সময়কালে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বাইরে মাত্র দুটো মিলিয়ন নগর রয়েছে—টোকিও এবং কলকাতা। ১৯২০ সালে মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত নগরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২০-তে, ১৯৪০ সালে ৫১-তে, ১৯৬০ সালে ৮০ এবং ১৯৭০ সালে ২২৯-তে। তবে এটা ঠিক যে মিলিয়ন (অর্থাৎ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত নগর) নগরের বেশিরভাগই রয়েছে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে, কিন্তু আপনারা যদি আধুনিক নগরায়ণের গতি-প্রকৃতি

পর্যালোচনা কবেন তাহলে দেখবেন যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এইরকম মিলিয়ন নগরের সংখ্যাও দ্রুত বেড়ে চলেছে। এই বিষয়ে আমরা আটষট্টি এককে আলোচনা করব, তাই এখানে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু উল্লেখ করা যায় যে ১৯৫০ সালে তৃতীয় বিশ্বে কেবল চারটি মিলিয়ন নগরের অস্তিত্ব ছিল, এগুলি হল—কলকাতা, বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই), মেক্সিকো সিটি এবং সাওপাওলো। ১৯৭০ সালের পর এই ধরনের নগরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬-এ।

এখানে আরও একটি বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার বলে মনে হয়—তা হল, আধুনিক নগরায়ণের এই ধারা অনুসরণ করে সমগ্র বিশ্বে সময়ানুক্রমিকভাবে এই যে আধুনিক শহর বা নগর বা মহানগরের সৃষ্টি হল, এর প্রভাবও ছিল দূরপ্রসারী। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকরা তাদের সমীক্ষায় এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে এই বিষয়টি অনুধাবন করেছেন। লীস (Lees, ১৯৮৫) বলেছেন, আধুনিক শহরের উত্থান ও ক্রমবিকাশ সামাজিক মানুষের আচার-আচরণ বা অভ্যাসকে শুধুমাত্র ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেনি, এমনকি মানুষের অনুভূতি ও চিন্তার জগৎকেও প্রভাবিত করেছে। এরও আগে স্করস্কি (Schorske) ১৯৬৩ সালে আধুনিক শহরগুলোকে বর্ণনা করেছেন 'Civilized virtue' বা 'সভ্যতালব্ধ গুণ' এবং Cultural creativity বা 'কৃষিগত সৃজনশীলতার' প্রতিনিধিকারী হিসাবে। বায়ার্ড (Burd) বলেছেন যে একটি বড় শহর বা নগরের বৈশিষ্ট্যকে তুলনা করা যায় একটি উদ্যানের সঙ্গে কিংবা যাদুঘরের সঙ্গে কিংবা অসমাপ্ত সঙ্গীতের ঐকতানের সঙ্গে। আবার, শহরের উত্থান ও ক্রমবিকাশের যে নেতিবাচক সামাজিক দিক ছিল সেই সম্পর্কেও অনেকে আলোকপাত করেছেন। কারুর কাছে শহর জল 'জ্বলন্ত নরকের মতো'—যেখানে বাস করে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা হাজার হাজার মানুষজন এবং যে শহরে আধিপত্য করে হিংসা, পাপ অঅর অপরাধ। শহরের যান্ত্রিক জীবনে মানুষের মনও হয়ে ওঠে যন্ত্রের মতো—হৃদয়ের উত্তাপ বর্জিত। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ জর্জ সিমেল (George Simmel) শহুরে আধুনিক মানুষের এই যান্ত্রিক মনোভাবকে বলেছেন 'blase attitude'—নির্বিকারত্ব অর্থাৎ কোনো কিছুতেই ব্যক্তিমানুষের কিছু আসে বা যায় না। নির্বিকার ব্যক্তিসত্তা জনতার ভিড়ে বিলীয়মান, তাই শহরে মানুষ একা, isolated বা বিচ্ছিন্ন, শিকড়হীন। একে সিমেল বলেছেন 'metropolitan type of individuality' মানে, ব্যক্তিমানুষের মহানাগরিক ধরন। বিশিষ্ট বাঙালি সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ আধুনিক শহুরে মানুষের এই হৃদয়হীন, আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতাকে বলেছেন 'অটোমোবিল মন' বা Automobile mind। তাঁর মতে—'মেট্রোপলিটন শহরে অটোমোবিল হল মানুষের 'ইমেজ'। অটোমোবিল মানুষের আত্মার আয়না। অটোমোবিল মানুষের বিকৃত ব্যক্তিত্ব এবং লুপ্ত মহত্ত্বের প্রতীক। এবং সবার চেয়ে বড় সত্য আটোমোবিলের মতো যান্ত্রিক মানুষের মন।' তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক নগরায়ণ মানুষের সামাজিক জীবনে নানা সুযোগ-সুবিধা এনে দিলেও, ব্যক্তিমানুষের জীবনে এর একটা নেতিবাচক প্রভাব ছিল। মহানগরের উত্তাল জনসমুদ্রে প্রতিটি নাগরিক যেন বিচ্ছিন্ন, একা, নির্জন দ্বীপের মতো। অথচ শহুরে জীবনে নাগরিক জনসমাবেশের সুযোগ প্রচুর—মিছিল, মিটিং, নানা উৎসব অনুষ্ঠান সবসময়েই জনসমাকীর্ণ হয়, কিন্তু এই জনতা কখনোই সামাজিক জনসংযোগ (social participation) অথবা মানুষের সঙ্গে মানুষের একাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে না বরং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার (social isolation) পথকে আরও সুগম করে দেয়। বিচ্ছিন্নতার এই ছবি দেশ বা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন, সর্বত্রই একরকম—কী কলকাতায়, কী নিউইয়র্কে।

৬৭.৪.৩ পৌরপুঞ্জ, পৌর মহাপুঞ্জ ও মহানগর

আধুনিক নগরায়ণের আর একটি ফল হল Conurbation বা পৌরপুঞ্জের সৃষ্টি। আধুনিক শহরের

বিকাশের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি পৌরপুঞ্জ এবং তারপর পৌর মহাপুঞ্জের উল্লেখ না করলে। Conurbation বা পৌরপুঞ্জ কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন প্যাট্রিক গেডেস (Patrick Geddess) ১৯১৫ সালে। ব্রিটেনের জনবন্টন মানচিত্র পর্যালোচনা করতে গিয়ে গেডেস দেখেছিলেন যে, বিভিন্ন পৌর-অঞ্চল পরস্পরের সঙ্গে একত্রে যুক্ত হয়ে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে এবং তা এমন একটি বড় মাপের পৌরাঞ্চল সৃষ্টি করেছে যা যে-কোনো নগরের থেকে আয়তনে এবং লোকসংখ্যায় বড়। এই ধরনের শহরগুচ্ছ (urban aggregates) বা শহরাঞ্চলকে গেডেস বলেছেন পৌরপুঞ্জ এবং তিনি পৌরপুঞ্জের আরও একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, তা হল এইসব পরস্পর-সংলগ্ন শহরগুলো অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাধারণত প্রশাসনিক দিক থেকে স্বতন্ত্র। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে পৌরপুঞ্জ কীভাবে সৃষ্টি হয়? পৌরপুঞ্জ সৃষ্টির কারণ হিসাবে দুটি প্রক্রিয়াকে (process) নির্দেশ করা যায়—(১) সম্প্রসারণ পদ্ধতি এবং (২) একত্রীকরণ পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে একটি প্রান্তবর্তী নগর সম্প্রসারিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত পৌরপুঞ্জের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে প্রতিবেশী শহর ও নগর পারস্পরিক সম্প্রসারণের ফলে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড পৌরপুঞ্জ তৈরি করে। এখানে আপনাদের একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে, সম্প্রসারণ এবং একত্রীকরণ পদ্ধতিতে সৃষ্ট পৌরপুঞ্জ এককেন্দ্রিক এবং বহুকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—কলকাতা পৌরপুঞ্জ সৃষ্টির পেছনে এই দুটি পদ্ধতিই কার্যকর ছিল। পৌরপুঞ্জের দুটি মূল বিন্দু—হাওড়া ও কলকাতা সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে পাশের ছোট ছোট শহরগুলোকে নিজেদের পরিধির মধ্যে নিয়ে এসেছে।

কয়েকটি পৌরপুঞ্জ বা Conurbation একত্রে যুক্ত হয়ে, আবার সৃষ্টি করে পৌর মহাপুঞ্জ বা Megalopolis। জে. গটম্যান (J. Gottmann) তাঁর Megalopolis গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। পৌর মহাপুঞ্জ সৃষ্টির কারণ হিসাবে বলা যায় যে, প্রতিটি মহানগর সম্প্রসারিত হয়ে আস্তে আস্তে প্রতিটি মহানগরের মধ্যবর্তী নগরগুলোকে গ্রাস করে পৌর মহাপুঞ্জ বা megalopolis গঠন করে। এই পৌর মহাপুঞ্জের বৈশিষ্ট্য হিসাবে নির্দেশ করা যায় ব্যাপক বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তথা সাংস্কৃতিক কার্যবিধিকে। কারণ এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্পকলা, চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনয় কেন্দ্র। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, জাপানের ওসাকা থেকে কোবে, ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লীডস্, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের অঞ্চলগুলোতে বিকাশ লাভ করেছে এমন পৌর মহাপুঞ্জ। তবে অনুকূল পরিবেশ ছাড়া এই ধরনের পৌর মহাপুঞ্জ গঠিত হতে পারে না এবং অনেক বিশিষ্ট স্থপতিবিদ্ এবং নগর-ভূগোলবিদগণের মতে, পৌর মহাপুঞ্জের গঠন একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা এবং এর সৃষ্টি কাম্যও নয় (বি. গার্নিয়ের, ১৯১৬)।

'আধুনিক শহরের বিকাশ'—এই বিষয়টি আলোচনার সময় 'মহানগর' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। Metropolitan শব্দটার বাংলা অর্থ হল 'মহানগর'। আর. ই. ডিকিনসন (R. E. Dicknison) মন্তব্য করেছেন যে, মহানগর সৃষ্টির মূলে আছে তার বহুবিধ কর্মধারা এবং মহানগরের অর্থনীতি হল আধুনিক সভ্যতার এক সার্বজনীন বৈশিষ্ট। মহানগরের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা হয় যে মহানগরের জনসংখ্যা ১০ লক্ষ হবে। তবে জনসংখ্যার এই সীমারেখা দিয়ে মহানগরকে চিহ্নিত করা যায় না, কারণ মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর আন্তর্জাতিক চরিত্র (cosmopolitan character) । তাই দশ লক্ষ জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহরকে মহানগর বলা হয় না, যেহেতু সেই শহরের কর্মধারার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নেই।

৬৭.৫ ভারতবর্ষে আধুনিক শহরের বিকাশ

এতক্ষণ আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আধুনিক শহরের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এইবার আমরা ভারতবর্ষে আধুনিক শহরের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব। কারণ আধুনিক শহর বিকাশের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি ভারতবর্ষে নগরায়ণের প্রেক্ষাপটটি কেমন ছিল, সে বিষয়ে আমরা না অবহিত হই। সময়ানুক্রমিকভাবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের আগমনের পরবর্তী সময়কালকে— নগরায়ণের আধুনিক পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও, ভারতবর্ষে আধুনিক শহর জন্ম নিতে থাকে মোগল সাম্রাজ্যের আধিপত্যের সময়েই। পর্তুগিজরা ভারতে প্রথম দুটি বন্দর শহর স্থাপন করে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পানাজীতে এবং ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে (বর্তমানে মুম্বাই)। এরপর ওলন্দাজ এবং ফরাসিরাও বন্দর শহর প্রতিষ্ঠা করে যথাক্রমে ১৬০৫ খ্রীঃ মছলিপত্তনামে এবং ১৬৫৮ খ্রীঃ নাগাপত্তিনামে ও ১৬৭৩ খ্রীঃ পণ্ডিচেরীতে এবং ১৬৯০ খ্রীঃ চন্দননগরে। ব্রিটিশরাও মাদ্রাজে (বতর্মানে চেন্নাই) ১৬৩৯ খ্রীঃ এবং ১৬৯০ খ্রীঃ কলকাতায় দুটি বন্দর শহর গড়ে তোলে। ১৮৫৮ খ্রীঃ ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শাসনপর্ব শুরু হয় এবং সেই সময়ে থেকে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে নগরায়ণের গতিপ্রকৃতি স্থির হয়েছে ব্রিটিশরাজের সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি এবং তাদের মানসিকতার মাধ্যমে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, ভারতবর্ষে একলক্ষ বা তার অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট ১৬টি নগর এবং প্রায় ১৫০০টি শহর সারা দেশে বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে নগরায়ণের গতি ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো, কিন্তু পূর্ব ভারত ছিল সবচেয়ে কম নগরায়িত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নগরায়ণের মাত্রা ছিল প্রায় ১১ শতাংশ। সেই সময় ভারতবর্ষে বারাণসী ছিল সবচেয়ে বড় শহর। তারপর আয়তনের ও লোকসংখ্যার নিরিখে নাম করা যায় কলকাতা, সুরাট, পাটনা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লীর। এই শহরগুলির লোকসংখ্যা ছিল দেড়লক্ষের মতো। উপরোক্ত শহরগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি (কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই) শহর ছিল ব্রিটিশদের স্থাপিত সম্পূর্ণ নতুন শহর, বাকি শহরগুলির জন্ম হয়েছিল মোগল সাম্রাজ্যাধীন বা তারও আগে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রথম লোকগণনা শুরু হয়, সেই সময় ভারতবর্ষে শহরে বসবাসকারী লোকসংখ্যা ছিল ৮.৭ শতাংশ, অথচ ১৮০০ খ্রীঃ এই সংখ্যা ছিল ১১ শতাংশ। এক লক্ষ লোক অধ্যুষিত বড় শহরের সংখ্যা ছিল ১৬টি। এই সময়কালের মধ্যে কলকাতা ৮ লক্ষ জনসংখ্যা-বিশিষ্ট সবচেয়ে বড় শহরের পরিণত হয়।

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতবর্ষে রেলপথের মাধ্যমে সারা দেশের মধ্যে সংযোগ সাধনের বিষয়টি সূচনা হলেও, তেমন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর উন্নত রেলব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং সারা দেশের মধ্যে রেল-যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই রেল-যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নতির ইতিবাচক দিক হল মেট্রোপলিটান শহরগুলি বিকাশ। এছাড়া, রেলপথের যোগাযোগের মাধ্যমে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কানপুরের মতো বড় বড় শহরে আধুনিক শিল্পের সূচনা এবং কলকারখানা স্থাপনের সুযোগ বাড়ল। এছাড়া, দক্ষিণ ভারত এবং হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায় এক ধরনের নতুন শ্রেণির শহর গড়ে উঠল। এগুলি হল দিল্লীর সন্নিকটে সিমলা-মুসৌরী-নৈনিতাল, কলকাতার কাছে দার্জিলিং ও মুসৌরী, বোম্বাই-

এর কাছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় অবস্থিত মহাবালেশ্বর এবং তামিলনাড়ুতে নীলগিরি ও কোদাইকানালের মতো শৈল শহর।

এই এককে আগেই আপনাদের বলেছি যে ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর রেল-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল। এই উন্নতির ফলশ্রুতি হিসাবে সারা ভারতে গড়ে ওঠে নতুন নতুন শহর। এই শহরগুলিকে বলা হত 'রেলওয়ে টাউনস' (railway towns) কারণ রেল-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যই এসব শহরে স্থাপিত হয় রেলওয়ে কারখানা এবং সেখানে বহু মানুষের কর্মসংস্থানও হয়। এই শহরগুলি হল বিহারের জামালপুর, অন্ধ্র ওয়ালটেয়ার, উত্তরপ্রদেশের বেরিলি ও মীরাট, মহারাষ্ট্রের নাগপুর ইত্যাদি। এছাড়া, বহু শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নতুন শিল্প (industry)। ব্রিটিশ শাসনকালে, যেমন কানপুর শহর পরিচিত হয় চর্মশিল্প ও পশম বস্ত্রশিল্পের (woolen textile industry) কেন্দ্র হিসাবে; জামসেদপুর হয়ে ওঠে ইস্পাত ও লৌহশিল্প কেন্দ্র।

প্রায় দুশো বছর পরিব্যাপ্ত ব্রিটিশ শাসন শেষ হয় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। এই সময়কালও ভারতবর্ষে নগরায়ণের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এই সময় গড়ে ওঠে কয়েকটি নতুন রাজধানী শহর; যেমন—ওড়িষ্যায় ভুবনেশ্বর, গুজরাটে গান্ধীনগর, আসামে দিসপুর। নতুন এই শহরগুলির বিকাশের ফলে ভারতবর্ষের শহর-পরিকল্পনার (town planning) ক্ষেত্রেও সংযোজিত হয় নতুন মাত্রা।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শিল্পায়নের জোয়ার আসে, এ কথা সকলেরই জানা। এই শিল্পায়নের ফলশ্রুতি হিসাবে গড়ে ওঠে রৌরকেল্লা, দুর্গাপুর, ভিলাই এবং বোকারোর মতো শিল্পনগরী, যার প্রতিটির লোকসংখ্যা এক লক্ষ বা তার বেশি। এছাড়া আরও নতুন নতুন শিল্প-নগরী গড়ে ওঠে যেমন হলদিয়া বারাউনি, কোবরা, রত্নগিরি প্রভৃতি।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নগরায়ণের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এক লক্ষ বা এক মিলিয়ন জনসংখ্যা বিশিষ্ট বড় শহরের উৎপত্তি। ১৯৫১ সালে এই ধরনের শহরের সংখ্যা ছিল ৭৬; ১৯৮১ সালে তা বেড়ে হয়ে যায় ২১৯টি। বর্তমানে এই সংখ্যা যে আরও বেড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৬৭.৬ সারাংশ

এই এককে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম তা থেকে আপনাদের নিশ্চয়ই আধুনিক শহরের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি রূপরেখা প্রতীয়মান হয়েছে। আলোচনার শুরুতেই আপনাদের বলতে চেষ্টা করেছি 'শহর' ও 'নগরের' মধ্যে কী পার্থক্য আছে এবং আধুনিক সময়ে নগরায়ণ সম্পর্কিত আলোচনায় অর্থগতভাবে যাকে 'নগর' বোঝায়—তা ব্যবহারিক আলোচনায় 'শহর' এই শব্দে বোঝানো হয়। এরপর 'traditional city' বা চিরাচরিত শহরের আলোচনায় আমরা দেখেছি এইসব শহরগুলি ছিল আয়তনের দিক থেকে আধুনিক শহরের তুলনায় অনেক ছোট এবং পৃথিবীতে প্রথম শহরগুলি গড়ে উঠেছিল নীলনদের উপত্যকায় যেমন থেবস (Thebs), মেমফিস (Memphis) এবং সিন্ধুনদের উপত্যকায়, যেমন—হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর। এরপর আমেরিকায় এবং ইউরোপে শহর কীভাবে বিকাশলাভ করল, তা আমরা বলেছি। বলা হয়েছে এশিয়া ও আফ্রিকায় শহরের বিকাশ সম্পর্কেও। এশিয়া মহাদেশে পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তারের আগে পর্যন্ত চীন এবং ভারতের মতো দেশে শহর-বসতি বলতে প্রধানত কৃষিবাজারকেই বোঝানো হত এবং এইসব দেশে প্রধান প্রধান শহরগুলো হচ্ছে অতীতকালের প্রশাসনিক রাজধানী; যেমন—আগ্রা, হায়দ্রাবাদ, পুরোনো দিল্লী, পিকিং ও নানকিং প্রভৃতি। পৃথিবীতে ব্রিটেনই হচ্ছে এমন দেশ, যেখানে প্রথম শুরু হয়েছিল শিল্প-বিপ্লব (industrial revolution) এবং তারই ফলশ্রুতিতে সেখানে সূচিত হয়েছিল শিল্পায়ন প্রক্রিয়া। শিল্পায়নের পর ব্রিটেনে নানা স্থানে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে লাগল। পুরোনো শহরগুলোর জায়গায় তৈরি হল নতুন নতুন শিল্প শহর।

এরপর আমরা আলোচনা করেছি বিভিন্ন নগর-সমাজতত্ত্ববিদ ও ভূগোলবিদদের শহর ও নগরের শ্রেণিবিভাজন সম্পর্কে। শহর ও নগরের ক্রিয়াকলাপকে ভিত্তি করে আর. ডি. ম্যাকেঞ্জি, সি. ডি. হ্যারিস, এইচ. জে. নেলসন এবং এম. এল. পাওনাল নানা ধরনের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে আপনারা জেনেছেন যে আধুনিক নগরায়ণের ধারা অনুসরণ করে সারা পৃথিবী জুড়ে যে আধুনিক শহর বা নগরের উদ্ভব হল, তার দূরপ্রসারী সামাজিক প্রভাব সমীক্ষিত ও পর্যালোচিত হয়েছে লীস, বায়ার্ড প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা। আধুনিক শহরের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের আলোচনায় মহানগর (metropolitan city) পৌরপুঞ্জ (conurbation) এবং পৌর মহাপুঞ্জের (Megalopolis) উল্লেখ প্রয়োজন। আর. ই. ডিকিনসন বলেছেন যে মহানগরের অর্থনীতি হল আধুনিক সভ্যতার এক সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য এবং মহানগর সৃষ্টির মূলে আছে তার বহুমুখী কর্মধারা। সমাজতত্ত্ববিদ প্যাট্রিক গেডেস পৌরপুঞ্জ বা conurbation কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ১৯১৫ সালে। পৌরপুঞ্জ বলতে বোঝায় শহরগুচ্ছকে যা সৃষ্টি হয় অনেকগুলি পৌর অঞ্চল পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। এইরকম কয়েকটি পৌরপুঞ্জ মিলে সৃষ্টি হয় পৌর মহাপুঞ্জ বা Megalopolis। পরিশেষে, আমরা আলোচনা করেছি ভারতবর্ষে আধুনিক শহরের বিকাশ সম্পর্কে—যেখানে বলা হয়েছে ভারতবর্ষে আধুনিক শহরের বিকাশকাল হিসাবে এই দেশে ব্রিটিশদের আগমনের পরবর্তী সময়কে নির্দেশ করা হলেও দেখা গেছে, ভারতবর্ষে আধুনিক শহর জন্ম নিতে থাকে মোগল সম্রাজ্যের আধিপত্যের সময়ে। তবে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে এক লক্ষ বা এক মিলিয়ন লোকসংখ্যা বিশিষ্ট বড় বড় শহরের উদ্ভব ঘটে।

৬৭.৭ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

নগরায়ন	—	Urbanisation
প্রাক্-শিল্প শহর	—	Pre-industrial city
শিল্প শহর	—	Industrial city
শিল্পোন্নয়ন	—	Industrial development
ঘনসংবদ্ধ নির্মিত এলাকা	—	Compact built-up area
পরিযান	—	Migration
সামাজিক জনসংযোগ	—	Social participation
সামাজিক বিচ্ছিন্নতা	—	Social isolation
মহানগর	—	Metropolis
পৌরপুঞ্জ	—	Conurbation
পৌরমহাপুঞ্জ	—	Megalopolis
আন্তর্জাতিক চরিত্র	—	Cosmopolitan character
শহর পরিকল্পনা	—	Town planning
চিরাচরিত শহর	—	Traditional city
সভ্যতালব্ধ গুণ	—	Civilized virtue
কৃষ্টিগত সৃজনশীলতা	—	Cultural creativity

৬৭.৮ অনুশীলনী

(১) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য আর কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।

(ক) 'সভ্যতার মূর্ত রূপ হচ্ছে নগর'—এই উক্তি করেছেন লুইস মামফোর্ড।

(খ) চিরাচরিত শহরগুলির ছিল আধুনিক শহরের তুলনায় আয়তনের দিক থেকে অনেক বড়।

(গ) এশিয়া মহাদেশে জাপান নগরায়ণের দিক থেকে চীন বা ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে।

(ঘ) পৌরপুঞ্জ কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন প্যাট্রিক গেডেস।

(ঙ) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে এক লক্ষ বা তার অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট ১৬টি নগর এবং প্রায় ১৫০০টি শহর সারা দেশে বিস্তৃত ছিল।

(২) ৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন :

পৌরপুঞ্জ ও পৌর মহাপুঞ্জ

(৩) ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন :

ভারতবর্ষে আধুনিক শহরের বিকাশ।

৬৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) গিডেনস, অ্যানথনি—*সোশিওলজি*, ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশার্স, ১৯৯১।

(২) ঘোষ, বিনয়—*মেট্রোপলিটন মন*, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ; ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৩।

(৩) মামফোর্ড, লুইস—*দি সিটি ইন হিস্ট্রি*, লন্ডন, ১৯৭৩।

(৪) ম্যাকেঞ্জি, আর. ডি.—*দি মেট্রোপলিটান কমিউনিটি*, ম্যাকগ্রহিল, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৩।

(৫) রাও, এম. এস. এ—*আ রীডার ইন আরবান সোশিওলজি, সি. ভাট, কাদেকার এল: এন।* (*এডিটেড*) ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯১।

(৬) রামচন্দ্রণ, আর.—*আরবানাইজেশান অ্যান্ড আরবান সিস্টেমস্‌ ইন ইন্ডিয়া*; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী, ১৯৯১।

একক ৬৮ ☐ তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণ

গঠন

৬৮.১ উদ্দেশ্য

৬৮.২ প্রস্তাবনা

৬৮.৩ নগর, নগরায়ণ সম্পর্কে ধারণা এবং 'আরবানিজম ও আরবানাইজেশান'-এর মধ্যে পার্থক্য

৬৮.৪ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নগরায়ণের গতিপ্রকৃতি

৬৮.৪.১ লাতিন আমেরিকায় নগরায়ণ

৬৮.৪.২ আফ্রিকায় নগরায়ণ

৬৮.৪.৩ এশিয়া মহাদেশে নগরায়ণ

৬৮.৫ তৃতীয় বিশ্বের দুটি শহর : দিল্লী ও মেক্সিকো

৬৮.৫.১ নগরায়ণের ফলে তৃতীয় বিশ্বে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যা

৬৮.৬ সারাংশ

৬৮.৭ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

৬৮.৮ অনুশীলনী

৬৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণ সম্পর্কে আলোচনা করা। এই এককটির পাঠ শেষ হলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অনুধাবন এবং ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন। যেমন—

- নগর, নগরায়ণ সম্বন্ধে ধারণা। ইংরেজিত 'নগরায়ণ'কে বোঝাতে 'urbanisation' শব্দটি ব্যবহার করা হয়; কিন্তু সমাজতত্ত্বের আলোচনায় 'নগরায়ণ' বলতে ব্যবহার করা হয় 'urbanism'—এই শব্দটি। তাই 'urbanisation' ও 'urbanism'-এর সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার।
- লাতিন আমেরিকায় নগরায়ণ বিষয়ে,
- আফ্রিকা মহাদেশে নগরায়ণ সম্বন্ধে,
- এশিয়া মহাদেশে নগরায়ণ বিষয়ে। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষে নগরায়ণ সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা।

৬৮.২ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে আধুনিক শহরের বিকাশধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এই এককে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হবে তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণ প্রক্রিয়া।

তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনাকালে নগর ও নগরায়ণ এবং 'আরবানিজম' ও 'আরবানাইজেশন' সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়ে আলোকপাত করা হবে আলোচনার প্রথম অংশে।

পরবর্তী অংশে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নগরায়ণের গতি-প্রকৃতি, বিশেষত, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশে নগরায়ণ প্রক্রিয়াকে উপস্থাপিত করা হবে।

আলোচনার অন্তিম পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের দুটি শহর—দিল্লী এবং মেক্সিকো সম্পর্কে এবং তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত নানাবিধ সামাজিক সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৬৮.৩ নগর, নগরায়ণ সম্পর্কে ধারণা এবং 'আরবানিজম' ও 'আরবানাইজেশন'-এর মধ্যে পার্থক্য

এই এককে আমরা আলোচনা করব 'নগরায়ণ' সম্পর্কে, তারপরে আমরা জানব তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণ প্রসঙ্গে, কিন্তু সেই আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আমাদের জানা দরকার 'নগরায়িত এলাকা' কাকে বলে আর 'নগরায়ণ' বলতেই বা কী বোঝায়। 'শহর' বা 'নগর' বা 'নগরায়িত এলাকা' (urban area) সাধারণত, দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়—জনবিন্যাসগত (demographically) এবং সমাজতাত্ত্বিক (sociologically) অর্থে। জনবিন্যাসগত অর্থে, জনসংখ্যার আয়তন, ঘনত্ব ইত্যাদি ওপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে বিষয়গুলি দেখা হয় তা হল বিভিন্নতা (heterogenity) পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (interdependency), অ-ব্যক্তিক সম্পর্ক (impersonality) এবং জীবনযাত্রার মান। জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ, এফ, টয়েনিজ (১৯৫৭) সামাজিক সম্পর্ক এবং মূল্যবোধের (social relationship and values) নিরিখে গ্রামীণ ও শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। টয়েনিজের মতে, শহুরে সমাজ (gesellschaft society) হচ্ছে এমন সমাজ যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে গৌণ এবং চুক্তিভিত্তিক (contractual) কিংবা কোনো বিশেষ পরিষেবার (serice) ওপর নির্ভরশীল। অন্যান্য সমাজতত্ত্ববিদ্ যেমন জর্জ সিমেল (George Simmel) (১৯৫০) এবং ম্যাক্স হেবার (Max weber) [১৯৬] শহরের বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিবর্তনশীলতা, অ-ব্যক্তিক সম্পর্ক এবং ঘনবসতিপূর্ণ বাসস্থানের উল্লেখ করেছেন। সমাজতত্ত্ববিদ লুইস ওয়ার্থের (১৯৩৮) মতে, সমাজতাত্ত্বিক ধারণায় একটি নগর (Louis wirth) বা শহরকে সংজ্ঞায়িত করা যায় 'সামাজিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত বড়, স্থায়ী এবং ঘন বসতি এলাকাকে। রুথ গ্লাস (১৯৫৬) [Ruth Glass] কতকগুলি উপাদানের ওপর ভিত্তি করে শহরকে বর্ণনা করেছেন; যেমন—জনসংখ্যার ঘনত্ব, লোকসংখ্যা, প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসনের ধরন এবং কতকগুলি সামাজিক বৈশিষ্ট্য। সমাজতত্ত্ববিদ্ রবার্ট রেডফিল্ড (১৯৪২) [Robert Redfield] শহুরে সমাজের (urban society) কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন যেমন বিশাল সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি-সমন্বিত জনসমাজ, অন্য ধরনের সম্প্রদায়ের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ, জটিল ধরনের শ্রম-বিভাজন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রাধান্য এবং পরিশেষে, চিরাচরিত মান বা আদর্শের পরিবর্তে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে আচরণ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা।

এ তো গেল বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ্দের ধারণা বা মতামত অনুসারে নাগরিক সমাজ বা শহুরে সমাজের (যাকে আমরা অন্যত্র শহর বা নগর বলেছি) বৈশিষ্ট্য। এবার আপনারা জানবেন নগরায়ণ বা

আরবানাইজেশন (Urbanisation) সম্পর্কে। 'আরবানাইজেশান' বা 'নগরায়ণ' বলতে বোঝায় গ্রাম থেকে শহরে মানুষের পরিযান গ্রহণ (migration) এবং তার ফলশ্রুতিতে গ্রামের তুলনায় শহরে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধিকে। অ্যান্ডারসনের (Anderson; 1953) মতে, নগরায়ণ আরবানাইজেশান কখনোই একমুখী প্রক্রিয়া নয়, বরং একে বলা যায় দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া; কারণ 'নগরায়ণ' কেবল গ্রাম থেকে শহরে পরিযানকেই নির্দেশ করে না—এর দ্বারা শহরের পরিযায়ী মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিবর্তনকেও বোঝায়।

আগেই আপনারা জেনেছেন, সমাজতত্ত্বের আলোচনায় 'নগরায়ণের' এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়নি। সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা শহর ও নগরকে ব্যাখ্যা করেছেন তুনামূলকভাবে বড় এবং সামাজিক দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাবের বহুলোকের একটি স্থায়ী বসতি হিসাবে। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ লুইস ওয়ার্থ (Louis Wrrth : 1938) নগরায়ণকে 'জীবনের এক পদ্ধতি' হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং 'আরবানিজম' (urbanism) বা নগরায়ণের চারটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন, যেমন (১) শহরবাসী ব্যক্তির একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয় না, কারণ প্রতিবেশীর সঙ্গে তার সম্পর্কে আত্মিক টান থাকে না। (২) শহরে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক মানুষ যেহেতু বিভিন্ন জায়গা থেকে পরিযান নিয়ে শহরে আসে, তাই তারা ভিন্ন ভিন্ন মনোভাবাসম্পন্ন হয়। (৩) শহুরে মানুষ ব্যক্তিসত্তাকে বেশি প্রাধান্য দেয়। ফলে শহরবাসী মানুষের মধ্যে এক ধরনের প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দেখা যায়। এবং (৪) বিপুল সংখ্যক শহরবাসীর ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মানসিকতার জন্য শহরের মানুষের আচার-আচরণের মধ্যেও ভিন্নতা দেখা দেয়, কাজের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণও (specialisation) দেখা যায় এবং এর ফলে শহুরে বিভিন্ন পেশার মানুষজন বসবাস করতে থাকে। ভিন্ন মানসিকতা ও ভিন্ন ভিন্ন পেশা অবলম্বন করার জন্য শহুরে মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

ওপরের আলোচনা থেকে তাই এই বিষয়টি নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে "আরবানাইজেশান" (urbanisation) এবং "আরবানিজম" (urbanism)—এই দুটি ইংরেজি শব্দ দ্বারা একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় তা হল "নগরায়ণ"। তবে প্রক্রিয়া এক হলেও "আরবানাইজেশান" এবং "আরবানিজম"—এই শব্দ দুটির ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে সামান্য ফারাক আছে, তা হয়তো আপনাদের বোঝাতে পেরেছি। এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। এই এককে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নগরায়ণের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করব। যদি লুইস ওয়ার্থের ধারণা অনুসারী নগরায়ণ হচ্ছে জীবনের একটি বিশেষ পদ্ধতি—এই নিরিখে আমরা ভাবি, তাহলে বিভিন্ন দেশের নগরায়ণ সম্পর্কে কোনো তথ্যই পরিবেশন করা সম্ভব হবে না। আগে এককেও আমরা 'আধুনিক শহরের বিকাশ' সম্পর্কে বলেছি। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে নগরায়ণের সমাজতত্ত্বগত ব্যাখ্যা বা ওয়ার্থীয় (Lowis Wirth'concept) ধারণায় আধুনিক শহরের উদ্ভব কিংবা ক্রমবিকাশ বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। এই এককেও বিভিন্ন পর্যালোচনা, সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য কিংবা প্রামাণ্য গ্রন্থের ভিত্তিতে 'তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণ' সম্পর্কে আপনাদের বলব এবং পরে নগরায়ণের সামাজিক প্রভাব বিষয়ে আপনারা জানতে পারবেন।

৬৮.৪ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নগরায়ণের গতিপ্রকৃতি

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নগরায়ণের একটি সুদীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে দেখলে আমরা তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণের গতিপ্রকৃতিতে তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি—(১) প্রাক্-

ঔপনিবেশিক শহর, (২) ঔপনিবেশিক শহর এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক শহর। এই ধরনের আলোচনায়, কেউ হয়তো মনে করতে পারেন—নগরায়ণের এই কাঠামোর মধ্যে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ভৌগোলিক পরিবর্তন ঠিকমতো ধরা পড়ছে না। এই সংশয় অমূলক নয়। কারণ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত তিনটি মহাদেশের অসংখ্য, অঞ্চলে নানা ধরনের সমাজ আছে, আছে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট—নানা ধরনের ভাষা, বিভিন্ন মূল্যবোধ, মানসিকতা ও আচার-আচরণ বিশিষ্ট মানুষজন। এত ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের সমারোহকে 'নগরায়ণের' একটি সাধারণ চালচিত্রের মধ্যে বদ্ধ করে আলোচনা করলে একটা সাধারণীকরণের (generalisation) সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিন্তু আবার এটাও সত্যি যে ইতিহাসগতভাবে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব—সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে একটা মিল আছে, তা হল তাদের ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে থাকার অভিজ্ঞতা (colonial experience)। ঔপনিবেশিক শাসকদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাত্রা তৃতীয় বিশ্বের এক দেশ থেকে অন্য দেশে আলাদা হলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন—তা হল নিজেদের প্রয়োজনে এইসব দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদকে শোষণ করা।

তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণের ব্যাপ্তির প্রথম অধ্যায়ে ছিল প্রাক্-ঔপনিবেশিক শহর (Pre-colonial city) এবং এর সময়কাল ছিল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাক্-ঔপনিবেশিক শহরগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্তবাদী বা প্রাক্-ধনতান্ত্রিক আর্থসামাজিক কাঠামো। এইসব শহরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে মূলত দুটি গোষ্ঠী ছিল। ভি. গর্ডন চাইল্ডের (১৯৬০) [V. Gordon Child] মতে, প্রথম গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল পূর্ণ সময়ের অনুৎপাদনকারী বিশেষজ্ঞ (non-productive specialists working full time)। এঁরা ছিলেন ধর্মীয় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রের কিছু অভিজাত ব্যক্তি যাঁরা সাংস্কৃতিক কাজকর্মে যেমন শিল্প, সাহিত্য বা সমাজনীতি উদ্ভাবনে দক্ষ। দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা ছিল বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা অতীতে ছিল কৃষি-নির্ভর, কিন্তু পরে তারা-ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছিল ঔপনিবেশিক শহর (colonial city)—এগুলি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দূত হিসাবে কাজ করত। কারণ শহরগুলি থেকে কাঁচামাল যেত ইউরোপের বাজারে এবং বিদেশের বাজার থেকে নির্মিত দ্রব্য (manufactured goods) ঔপনিবেশিক শহরে আমদানি করা হত। এই পর্বে নগরায়ণ প্রক্রিয়া মসৃণ ছিল না বলে এই অধ্যায়ে নগরায়ণের 'distorted urbansiation' বা 'বিকৃত নগরায়ণ' বলা হয়।

তৃতীয় বা শেষ অধ্যায়ে ছিল উত্তর-ঔপনিবেশিক শহর। সত্যি বলতে গেলে, ঔপনিবেশিক শহর ও উত্তর-ঔপনিবেশিক শহর (post-colonial city)-এর মধ্যে তেমন ফারাক ছিল না। অবস্থানের ক্ষেত্রে যে সামান্য পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তা হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ করা। যাই হোক, উত্তর-ঔপনিবেশিক তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলিতে একটি বিষয় লক্ষিত হত—নিজস্ব দেশীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি তাদের ওপরে আরোপিত মূল্যবোধের স্পষ্ট সহাবস্থান। সামাজিক ক্ষেত্রের এই বৈপরীত্য প্রতিফলিত হয়েছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, যেমন—'সংগঠিত ক্ষেত্র' (formal sector) ও 'অসংগঠিত ক্ষেত্র' (informal sector)-এর অস্তিত্ব। উত্তর-ঔপনিবেশিক শহরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রায় সব তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত দেশে উন্নয়নের বিষয়টি কেন্দ্রীভূত হয়েছে হয়েছে শহরকে ঘিরে, যাকে এম. লিপটন (১৯৭৭) [M. Lipton] বলেছেন—"শহরমুখী ঝোঁক বা প্রবণতা (urban bias)। এইজন্যই গ্রাম থেকে পরিযান

(migration) নিয়ে মানুষ কাজের খোঁজে শহরে এসে ভিড় জমায় এবং শহরের লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। এইসব দেশে শহরগুলিতে শিল্পোন্নয়ন তেমনভাবে না হওয়ার দরুন পরিযায়ী মানুষের কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগও সৃষ্টি হয় না, কিন্তু গ্রাম থেকে শহরে ঘটে যাওয়া "সচলতার বিপ্লবের" (mobility revolution) জন্য শহরগুলিতে চাকরির চাহিদা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ম্যানুয়েল ক্যাসটেলস্ (১৯৮০) [Manuel Castells] তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণের এই প্রবণতাকে বলেছেন "নির্ভরশীল নগরায়ণ" (dependent urbanization) এবং ক্যাসটেলস্ তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণকে চিহ্নিত করেছেন এইভাবে—পরিষেবা এবং কর্মসংস্থানের অভাব দেখা যায় শহরের নতুন জনসমাজের জন্য। তারই সঙ্গে সামাজিক শ্রেণির মধ্যে একটা বিভাজন ঘটে যায় এবং সমাজে স্তরবিন্যাসের ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একটা মেরুকরণ (polarization) তৈরি হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশগুলি ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত প্রায় পাঁচশো বছরের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সাক্ষ্য বহন করছে। এই সময়কালকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, তা হল যথাক্রমে ১৪৫০ থেকে ১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত এবং ১৮০০ থেকে ১৯৪৫ খ্রীঃ পর্যন্ত। তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণের সাম্প্রতিক রূপ ও কর্মধারাকে বুঝতে হলে কতকগুলি বিষয় বোঝা দরকার। যেমন—ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, প্রাক্-ঔপনিবেশিক নাগরিক ঐতিহ্য, নতুন উন্নত প্রযুক্তি এবং দেশজ সমাজব্যবস্থাকে। যদিও একথা ঠিক যে তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণের সাম্প্রতিক প্রকৃতি এবং নগর-উন্নয়নের বর্তমান বিন্যাস অনেকটাই স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সময়, তাই তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণের ইতিহাসে এই সময়কাল অতযন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তবু এর পাশাপাশি এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উন্নতিশীল দেশগুলির নগর-উন্নয়নের শিকড়কে খুঁজতে হবে আরও পূর্ববর্তী সময়কালে। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অংশের একটি দৃঢ় প্রাক্-ঔপনিবেশিক নাগরিক ঐতিহ্য ছিল, ছিল উন্নত প্রযুক্তি-কৌশল এবং দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গৌরব। এইসব দেশের কয়েকটি অঞ্চলকে কে. এম. বুচানন (K.M. Buchanan : 1967) বলেছেন "Pre-developed" বা 'প্রাক্-উন্নত' অঞ্চল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক নগরায়ণের এই ছবি এখনও ধরা আছে অনেক তৃতীয় বিশ্বের দেশে—তার সাম্প্রতিক নগরায়িত কাঠামোর মধ্যে। ডি. জে. ডিউযার (D.J. Dewyer) তাঁর "The City in the Third World" গ্রন্থে এই তথ্য আমাদের জানিয়েছেন। তাই এই এককের আলোচ্য পরিচ্ছেদের পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সময়ে যদিও তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন শহর ও নগর স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু এইসব দেশে নগরায়ণের স্রোত শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনের আগে থেকেই। উদাহরণ হিসাবে আমরা নাম করতে পারি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত ভারতবর্ষে পল্লব, চালুক্য, চোল, বাহমনী সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বিভিন্ন উন্নত নগরগুলির কথা, পরবর্তী সময়ে উত্তরে মোগল সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণে বিজয়নগরের রাজ্যগুলি ভারতবর্ষে নগরায়ণ প্রক্রিয়াকে নতুন নতুন শহর পত্তনের মাধ্যমে ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু উত্তরকালে এই সমস্ত প্রাচীন শহর অতীত গৌরব হারিয়েছিল এবং আশ্চর্যের বিষয়, এইসব অঞ্চলে নগরায়ণের গতিও রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশে দেখা গেছে যে নগরায়ণ ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না, ফলে একই দেশে একটি অঞ্চলে উন্নত নগরায়ণে গতি সেই দেশেরই অন্য অঞ্চলকে প্রভাবিত করেনি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এইসব দেশে নগরায়ণের মাত্রা ছিল বার্ষিক ৫ থেকে ৮ শতাংশ এবং শহরের জনসংখ্যা প্রতি ১০ থেকে ১৫ বছর অন্তর প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছিল। ১৯৮১ সাল ও ১৯৯১ সালের আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দেশের

'শহরের জনসংখ্যা' ছিল সুদানে ২৬ শতাংশ ইথিওপিয়ায় ১৪ শতাংশ, ভেনেজুয়েলায় ৮৪ শতাংশ, ব্রাজিলে ৬৮ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৩০ শতাংশ, তানজানিয়ায় ১৩ শতাংশ এবং ভারতবর্ষে ২৫ শতাংশ। যদিও কোনো কোনো দেশে শহরের জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হিসাবে বড় বড় শহরে বেশিমাত্রায় লোক বাস করার প্রবণতাকে নির্দেশ করা হয়, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণের গতি-প্রকৃতির সামগ্রিক চেহারার দিকে তাকে বোঝা যাবে যে এশিয়া এবং আফ্রিকার তুলনায় লাতিন আমেরিকা হচ্ছে অনেক বেশিমাত্রায় নগরায়িত (urbanized)। তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত বিভিন্ন মহাদেশে নগরায়ণ সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে গেলে আমাদের প্রতিটি মহাদেশের নগরায়ণ নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা দরকার। পরবর্তী পরিচ্ছেদে তাই আমরা লাতিন আমেরিকার নগরায়ণ নিয়ে কথা বলব, তারপর আপনারা জানবেন আফ্রিকা মহাদেশের নগরায়ণ ও এশিয়া মহাদেশের নগরায়ণ সম্বন্ধে। এই আলোচনার মাধ্যমে হয়তো তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণের একটা সামগ্রিক রূপরেখা আপনারা পাবেন।

৬৮.৪.১ লাতিন আমেরিকায় নগরায়ণ

লাতিন আমেরিকার নগরায়ণ নিয়ে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় এখানে শহর গড়ে তোলার ধারণাটির প্রচলন করেছিল ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি, বিশেষ করে স্পেনীয় এবং পোর্তুগিজরা। প্রথম দিকে এই নগরায়ণের মাত্রা ছিল অত্যন্ত ধীর, তারপর ক্রমশ তা উন্নত হয়ে বিংশ শতাব্দীতে এই মাত্রা উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। নগরায়ণের ব্যাপ্তির প্রাথমিক পর্যায়ে লাতিন আমেরিকায় পৌর বসতি (urban settlements) গড়ে ওঠে সামুদ্রিক বন্দর সংলগ্ন এলাকায়। পরে আর্থসামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে বাণিজ্যিক এবং নির্মাণ শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে বহু শহর। পরে পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে নগরায়ণের গতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। লাতিন আমেরিকায় নগরায়ণের অতীত ইতিহাসকে সরিয়ে রেখে এখন এই কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গা থেকে গড়ের হিসাবে এই মহাদেশে অনেক বেশি নগরায়িত (urbanized)। আগেই আপনারা জেনেছেন, লাতিন আমেরিকায় নগরায়ণের গতি এশিয়া বা আফ্রিকার থেকে অনেক বেশি, এমনকি এই গতি দক্ষিণ ইউরোপের চেয়ে বেশি। তবে শিল্পায়ন কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরিখে লাতিন আমেরিকা দক্ষিণ ইউরোপ থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তবে লাতিন আমেরিকার মধ্যে যেসব জায়গাগুলোতে অনেক বেশি সংখ্যায় শহরে বসবাসকারী লোক থাকে, সেগুলো হল আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, কিউবা এবং ভেনেজুয়েলা।

লাতিন আমেরিকার অন্তর্গত বেশিরভাগ দেশে নগরায়ণ হয়েছে প্রধান প্রধান শহরকে ঘিরে—যার কাছাকাছি কোনো ছোট ছোট শহর নেই। দেখা গেছে যে ২২টি দেশের মধ্যে অন্তত ১৬টি দেশে জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশ ভিড় করেছে এইরকম প্রধান শহরকে ঘিরে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'megalocephalic city'। অন্যদিকে দেখা গেছে যে জামাইকা, গুয়াতেমালা এবং হাইতিতে শহরবাসী লোকসংখ্যায় প্রায় ৮০ শতাংশ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তাদের রাজধানী শহরে। লাতিন আমেরিকার সাম্প্রতিক জনবিন্যাসের কাঠামের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বড় বড় শহরগুলির বিকাশ, যাকে বিশেষিত করা বলা হয় 'মাশরুমিং গ্রোথ' (mushrooming growth) বা 'ব্যাঙের ছাতার মতো বৃদ্ধি'। ১৯৫০-৬০ সাল পর্যন্ত দশকওয়ারি হিসাবে প্রকাশ পায় যে বার্ষিক জনসংখ্যা যেখানে ২.৭ শতাংশ বেড়েছে, সেখানে ২০,০০ বা তার তুলনায় বেশি লোকসংখ্যা অধ্যুষিত শহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা ৫ শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ লাতিন আমেরিকায় শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং এই বৃদ্দির জন্য গ্রাম থেকে শহরে পরিযান নেওয়ার প্রবণতাকেই কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়।

লাতিন আমেরিকার শহরগুলির দ্রুত বিকাশ, বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলির, শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এবং তখন থেকেই এই ধারণাও তৈরি হয়েছিল এই মহাদেশে যে মহানগরগুলির তুলনায় বড় বড় শহরগুলির বিকাশ সাধন বেশি জরুরি। "লাতিন আমেরিকার আধুনিকীকরণে বড় বড় শহরের ভূমিকা"—এই বিষয়ে অনুষ্ঠিত কর্নেল অধিবেশনে (Cornell conference)। 'সাধারণ নাগরিক সমস্যার' থেকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শহরের সদর্থক ভূমিকার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

দেখা গেছে ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে যখন সারা বিশ্বব্যাপী নগরায়ণের হার বর্ধিত, তখন শহরের জনসংখ্যার দিক থেকে লাতিন আমেরিকা অন্য সব মহাদেশকে ছাপিয়ে গেছে। আবার এর পাশাপাশি আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে অন্য অনেক উন্নতশীল দেশের মতো লাতিন আমেরিকার এই বর্ধিত নগরায়ণ কিন্তু শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চলতে পারেনি। তাছাড়া, গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে উন্নয়ন হয়েছিল তা ছিল অ-সম। পশ্চিম ইউরোপের শহরগুলোর মতো লাতিন আমেরিকার শহরগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল একটি সাধারণ সমস্যা, সেই সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল গ্রাম ও শহরের বিভাজনের থেকে (rural-urban dichotomy)। এছাড়াও, লাতিন আমেরিকায় নগরায়ণজনিত আরও নানা সমস্যা ছিল, যেমন দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বাসস্থানের সমস্যা। এইসব সমস্যার কারণ ছিল গ্রাম থেকে শহরে উচ্চহারে পরিযান গ্রহণ, যার ফলে লাতিন আমেরিকার বহু বড় বড় শহরে পরিকল্পনাহীন জবরদখল বসতি (spuatters) গড়ে উঠেছিল।

৬৮.৪.২ আফ্রিকায় নগরায়ণ

পৃথিবীতে যেসব প্রাচীন শহর ছিল, যেমন দেখা গিয়েছিল নীলনদের উপত্যকায়—সেরকম কয়েকটি প্রাচীন শহর ছিল আফ্রিকা মহাদেশে। কায়রোর কাছে অবস্থিত এই প্রাচীন শহরের নাম ছিল আফ্রোডিটোপোলিস, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় উত্তর আফ্রিকা এবং আফ্রিকার অন্যান্য অংশে নগরায়ণের গতি উন্নত ছিল না। খুব সম্প্রতি আফ্রিকা মহাদেশে যে দ্রুত নগরায়ণ দেখা দিয়েছে তা প্রধানত ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এবং তারপর এর প্রভাবই কার্যকরী হয়েছে। ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে এই সময়ে শহরের বিকাশের জন্য দায়ী ছিল সুদূর অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবণতা।

জে.পি.ডিকিনসনের (Dickinson J.P.) মতে, বিংশ শতাব্দীর আগের আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে ঔপনিবেশিক শাসন গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে, সেইসব অঞ্চলে যেখানে তারা কাঁচামাল (raw meterials) সংগ্রহণ করতে পারবে এবং নির্মিত দ্রব্যের জন্য বাজার গড়ে তুলতে পারবে, যদিও সেই সময় এইসব খ্রীষ্টান ঔপনিবেশিকরা আফ্রিকাকে 'অজানা স্থান' এবং 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' (dark continent) বলত। বর্তমান শতাব্দীর আগে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, পোর্তুগাল, বেলজিয়াম, স্পেন এবং ইতালির মধ্যে আফ্রিকা বিভক্ত ছিল। নিজেদের প্রয়োজনই আফ্রিকা মহাদেশে তারা শহর এবং পৌর বসতি গড়ে তুলেছিল। বিংশ শতাব্দীতে "প্রাইমেট শহর" (Primate city) হিসাবে পরিগণিত বহু অঞ্চলই গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয় শক্তির দ্বারা; যেমন—জোহানেসবার্গ (১৮৮১), আবিদ্‌জান (১৯০৩), নাইরোবি (১৮৯৯), জিঞ্জা (১৮৯৩)। ব্রিটিশরা প্রতিষ্ঠা করেছিল নাইরোবি শহর, যেমন ফরাসীরা গড়ে তুলেছিল আবিদ্‌জান। অনুরূপভাবে, লুসাকাও গড়ে উঠেছিল একটি পরিকল্পিত শহররূপে ব্রিটিশদের দ্বারা।

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য তুলনায় আফ্রিকা মহাদেশকে সবচেয়ে কম নগরায়িত (urbanized) মহাদেশ বলা হয়, কিন্তু দেখা গেলা যে ১৯৮১-১৯৯১ এই দশকে নগরায়ণের গতি ছিল খুব দ্রুত এই মহাদেশে। সামগ্রিকভাবে,

এই মহাদেশে পূর্ব, মধ্য আফ্রিকার তুলনায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার তুলনায় উত্তর আফ্রিকা ছিল অনেক বেশি নগরায়িত। বরং নগরায়ণের নিরিখে উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সমতা ছিল। ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আফ্রিকা মহাদেশে সবচেয়ে বেশিমাত্রায় নগরায়িত দেশগুলি হল লিবিয়া (৫৪ শতাংশ নগরায়ণের মাত্রা), দক্ষিণ আফ্রিকা (৫০ শতাংশ), আইভরি কোস্ট (৪১ শতাংশ) এবং কঙ্গো (৪৬ শতাংশ)। অপরদিকে সবচেয়ে কম নগরায়িত অঞ্চলগুলি হল উগাণ্ডা (৯ শতাংশ), রিওয়াণ্ডা (৪ শতাংশ) প্রভৃতি।

সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক কালের আফ্রিকাতে নগরায়ণের মাত্রা খুবই দ্রুত, কিন্তু এই মহাদেশে এখনও অনেক অঞ্চল আছে যেখানে নগরায়ণের মাত্রা ভীষণ ধীর এবং কম। তাই পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় আফ্রিকা এখনও অনেক কম নগরায়িত (urbanized)।

৬৮.৪.৩ এশিয়া মহাদেশের নগরায়ণ

এশিয়া মহাদেশে নগরায়ণের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে যে বিষয়টি প্রথমেই আপনাদের জানা প্রয়োজন তা হল নগরায়ণের বীজ সর্বপ্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল সিন্ধু-সভ্যতার যুগে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সালে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর মতো উন্নত নগরী স্থাপনের সময়। পরবর্তীকালে মৌর্যযুগে গড়ে উঠেছিল পাটলিপুত্রের মতো রাজধানী শহর, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, বৈশালী ও সুবর্ণগিরির মতো অভিজাত শহর এবং সুরাট, কারাকল এবং তাম্রলিপ্তর মতো বাণিজ্য শহর। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় শক্তি অনুপ্রবেশের আগে তুর্কী ও আফগানরা এবং কুষাণ, গুপ্ত, পল্লব, চালুক্য, চোল ও বাহমনীয় মতো আঞ্চলিক রাজশক্তি ও আরও পরে উত্তরে মোগল সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য এই মহাদেশে শহরের বিকাশ ও নগরায়ণের গতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

ভারতবর্ষের কথা বাদ দিয়ে যদি আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে তাকাই, তাহলে দেখব উপকূলের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ এবং চীনদেশের প্রভাবের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনেক শহর গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ-শাসনের সময় এশিয়া মহাদেশের এই অংশে গড়ে উঠেছিল সিঙ্গাপুর (১৮১৯), কুয়ালালামপুর (১৮৫৯), পেলাং প্রভলতি বড় শহর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শক্তি যেমন ওলন্দাজ, ব্রিটিশ, স্পেন এবং ফরাসীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং থাইল্যান্ড-ই একমাত্রা দেশ যেখানে কোনো ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে থাকার ফলে দেখা গেছে, এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন শহরের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের প্রভাব পড়েছিল। সাধারণত ইউরোপীয়রা শহর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এমন জায়গা পছন্দ করত, যেখানে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সুবিধাজনক ছিল। তারা নিজেদের সুবিধার্থে অনেক বন্দর-শহরও গড়ে তুলেছিল, যেগুলোর নির্মাণে পশ্চিমী ও ঔপনিবেশিক ছাপ স্পষ্ট ছিল। শহরে বড় বড় অট্টালিকার নির্মাণ-কৌশলেও ছিল পশ্চিমী প্রভাব। কিন্তু এই পর্যায়ে এশিয়া মহাদেশে নগরায়ণের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর।

বিংশ শতাব্দীতে দেখা গেছে, মহাদেশে নগরায়ণের গতিতে এসেছে অনেক দ্রুততা, বিশেষ করে ১৯৪৫ সালের পর। এশিয়া মহাদেশের নগরায়ণ নিয়ে কিছু বলতে গেলেই প্রথমে বলতে হয় জাপানের কথা। শুধুমাত্র এশিয়া মহাদেশের মধ্যে শিল্পোন্নত প্রথম সারির দেশ বলে জাপানের খ্যাতি নয়, শিল্পোন্নয়নের নিরিখে

জাপান পৃথিবীর হাতে-গোনা কয়েকটি দেশের সমকক্ষ। এই দেশে শহর-নিবাসী লোকসংখ্যার ঘনত্ব উল্লেখ করার মতো। ১৯৪৫ সালের পর এশিয়া মহাদেশে নগরায়ণের গতি দ্রুত হলেও এই মহাদেশের অন্তর্গত সব দেশে সমানভাবে নগরায়ণ ঘটেনি। তাই বিভিন্ন দেশের নগরায়ণের মাত্রাতেও ভিন্নতা চোখে পড়ে; যেমন—শ্রীলঙ্কায় নগরায়ণের হার ২৭ শতাংশ, নেপালে ৬ শতাংশ, ভুটানের ৪ শতাংশ, ইয়েমেনে ১১ শতাংশ, মায়ানমারে ২৮ শতাংশ আবার বাংলাদেশে ১২ শতাংশ। এই মহাদেশে এই সময়ে নগরায়ণের মাত্রা ছিল জাপানে ৭৮ শতাংশ, কুয়েতে ৮৯ শতাংশ, সিঙ্গাপুরে ১০০ শতাংশ এবং হঙকঙে ৯০ শতাংশ। এশিয়াতে, ১৯৪৫ সালের পরে শহরের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সেই তুলনায় ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায় শহরের জনসংখ্যার (urban population) বৃদ্ধি তত হয়নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৯৪৫ সালের পর কয়েক দশক ধরে এশিয়া মহাদেশে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক বেশি। তবে এখানে একটা বিষয়ে আপনাদের খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে এশিয়ার জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ গ্রামে বাস করলেও শহরের জনসংখ্যা একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ভিড় জমিয়েছে বৃহত্তর শহরগুলিতে (larger cities)। উদাহরণ হিসেবে আমরা ভারতবর্ষের কথা বলতে পারি। ভারতবর্ষে গ্রামীণ লোকসংখ্যা ছিল ৭৪ শতাংশ এবং শহরের লোকসংখ্যা ছিল ২৬ শতাংশ (১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। এই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দেশগুলিতে। তবে এই অংশের কোনো কোনো বড় শহরেও দেখা যায় লোকসংখ্যার ঘনত্ব অনেক কম, যেমন ব্যাঙ্কক এবং ম্যানিলাতে। লোকসংখ্যা হ্রাসের কারণ হিসেবে বলা হয় শহরের ভিড়ের জন্য প্রচুর লোক শহর ছেড়ে শহরের উপকণ্ঠে বা অন্যত্র চলে গিয়েছিল। শহর থেকে পরিযান নিয়ে শহরে মানুষের অন্যত্র বসতি স্থাপন করার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় উপ-নগরায়ণ বা sub-urbanisation।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হিসাব অনুযায়ী, এশিয়া মহাদেশের নগর-ভবিষ্যৎ (urban futre) খুব একটা উজ্জ্বল নয়, কারণ শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক এবং সেই তুলনায় শহরে কর্মের সুযোগও তেমন বিস্তৃত নয়। আগেই আপনারা জেনেছেন যে এশিয়া মহাদেশে ১৯৪৫ সালের পর শহরের সংখ্যাও বেড়েছে নগরায়ণের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তাই ১৯৫০ সালে এশিয়াতে মহানগরের সংখ্যা ছিল ১৯টি, ১৯৭০ সালে ৪৯টি, ১৯৯০ সালে ৮৬টি। ১৯৯১ সালে চীন দেশে মহানগরের সংখ্যা ছিল ৩৮টি এবং ভারতবর্ষে ছিল ২৭টি। ১৯৯১ সালের হিসাবে এশিয়াতে শহরের মোট লোকসংখ্যা ছিল ৪৬৫ মিলিয়ন। এই বিপুল জনভার যে-কোনো শহরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুখকর নয় তা বলাই বাহুল্য। ফলে তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণের সামগ্রিক চিত্রের মধ্যে এশিয়া মহাদেশ বেশি পরিমাণে নগরায়ণ-জনিত সমস্যার শিকার। কর্মহীনতা, দারিদ্র্য, জবরদখল বসতি ও বস্তি স্থাপন, পরিবেশ দূষণ এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম—এগুলিই হল নগরায়ণের ফলে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যা এবং এশিয়া মহাদেশে এই সমস্যাগুলি প্রবল মাত্রাতে পরিলক্ষিত হয়েছে।

৬৮.৫ তৃতীয় বিশ্বের দুটি শহর : দিল্লী ও মেক্সিকো

আপনাদের আগেই বলেছি, শুধু এশিয়া মহাদেশে নয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নগরায়ণের গতি অত্যন্ত দ্রুত এবং এই নগরায়ণের প্রকৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলির নগরায়ণের প্রকৃতি থেকে আলাদা। তৃতীয়

বিশ্বের দেশগুলিতে দেখা যায় যে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে যে পরিযান নিচ্ছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে চিরাচরিত গ্রামীণ উৎপাদন-ব্যবস্থা অত বেশি আশাব্যঞ্জক নয় এবং মানুষের ধারণা, শহরে কাজের সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি। এই ধারণাতেই তৃতীয় বিশ্বের মানুষ শহরে ভিড় করে এবং শহরে কাজের মাধ্যমে উপার্জন করে আবার তারা গ্রামে ফিরে আসবে—এমন আশাও পোষণ করে। এটা সত্যি যে অনেকে ফিরে যায় তবে তাদের সংখ্যা নেহাতই নগণ্য, এবং বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী (migrated) মানুষ আর নিজের গ্রামে ফিরে যেতে পারে না কোনো কারণে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিযায়ী মানুষ নিজের জায়গায় তার আগের আর্থসামাজিক অবস্থান হারিয়ে ফেলে, তখন তারা বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহরে বাসস্থানের জায়গা পায় না। ফলে শহরের উপকণ্ঠে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বসতি এইসব মানুষের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশগুলিতে এই একই ছবি দেখা যায়। এর বিপরীত ছবি পাওয়া যায় পশ্চিমের নগরায়িত এলাকাগুলিতে; সেখানে শহরগুলিতে যারা নতুন আসে, তারা শহরের উপকণ্ঠে নয়, বাসস্থানের জন্য বেছে নেয় শহরের কেন্দ্র (central parts) এবং আপনারা বুঝতে পারছেন যে পশ্চিমী দেশগুলিতে বড় বড় শহরে যেহেতু বাসস্থলের তেমন অভাব নেই, তাই সেখানে পরিযায়ী মানুষকে বাসস্থানের জন্য শহরের উপকণ্ঠে দখল করা স্থানে বসতি গড়তে হয় না। তবে তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলিতে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয় তারা বসতি গড়তেও পারে না, তারা বস্তি এলাকায় (slumareas) এমনভাবে এবং এমন পরিবেশে থাকে, যা পশ্চিমী দেশে বসবাসকারী মানুষের ধারণাও অযোগ্য। এখানে উদাহরণ হিসাবে আমরা এশিয়া মহাদেশের একটি শহর দিল্লী এবং লাতিন আমেরিকার একটি শহর মেক্সিকো শহরের কথা উল্লেখ করতে পারি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত এবং ক্রমবর্ধমান এই জনসংখ্যার দরুন বাড়ছে গ্রাম থেকে শহরে পরিযান ও শহরের লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই শহরের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এশিয়া মহাদেশের এই শহরগুলিতে মানুষের ভিড় এত বেশি যে অনেক মানুষেরই থাকার জায়গা নেই, তারা দিনে ও রাতে শহরের রাজপথগুলির পাশে বাস করে ও রাত্রিযাপনের করে। এবার জানা যাক্ দিল্লী শহর সম্পর্কে।

দিল্লী—ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী হচ্ছে ইতিহাসগতভাবে একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। দিল্লী নগর-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ 'পুরোনো দিল্লী' ও 'নতুন দিল্লী'কে সমগ্র দিল্লী শহরের নগরায়িত এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দিল্লীর পুরোনো শহরে দেখা যায় সংকীর্ণ রাস্তাঘাট, প্রচুর মানুষ রাস্তায় বসে তাদের ব্যবসার সামগ্রী বিক্রিয় করছে, ছোট ছোট দোকান রয়েছে রাস্তার ধারে ধারে। অর্থাৎ পশ্চিমের উন্নত শহরগুলির মতো এখানে কোনো কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা (Central Business District) নেই। পুরোনো দিল্লী শহরে ব্যাঙ্ক-অফিস ইত্যাদি প্রায় সবই কেন্দ্রীয় স্থানের বাইরে। মানুষ শহরের মধ্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যায় পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেলে চেপে, অন্যান্য যানবাহনের ব্যবহার বেশ কম।

অপরদিকে, নতুন দিল্লী শহরের পরিবেশ অনেকটাই আলাদা। শহরের উপকণ্ঠ থেকে বেশ খানিকটা দূরে অভিজাত এলাকায় বাস করে অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন মানুষজন। শহরের কেন্দ্রীয় স্থানে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কর্মদপ্তর ও প্রশাসনিক কাজকর্মের নানা অফিস-কাছারি। নতুন দিল্লীর মতো অভিজাত শহরেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যে-কোনো বড় শহরে যেমন দেখা যায়, তেমন জবরদখল বসতি ও বস্তির সমাবেশ দেখা যায়। মাঝে মাঝে নগর-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এইসব জবরদখল বসতিগুলিকে উচ্ছেদ করেন,

কিন্তু আবার কিছুদিন পরেই গৃহহীন মানুষ খোলা জায়গা বা শহরে পরিত্যক্ত পার্ক দেখলেই, সেখানে অস্থায়ী আবাসস্থল গড়ে তোলে।

মেক্সিকো শহর—আগেই আপনারা জেনেছেন, তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ শহরই বস্তি অঞ্চল দিয়ে ঘেরা। বস্তির অধিবাসীরা হচ্ছে গ্রাম থেকে আসা পরিযায়ী। মানুষ কিংবা শহরের উন্নয়ন ও পরিচ্ছন্নতার জন্য কোনো শহরের অঞ্চল থেকে উৎখাত পরিবার। লাতিন আমেরিকার মেক্সিকো শহরও এই বৈশিষ্ট্য থেকে ব্যতিক্রম নয়। মেক্সিকো শহরের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বাস করে শহুরে জীবনে প্রাপ্ত নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে, যেমন পানীয় জলের অভাব ও আবর্জনা নিষ্কাশনের অভাব নিয়ে। এই শহরে আছে একটি প্রাচীন বাণিজ্য ও বিনোদন এলাকা (business & entertainment district) এবং একাধিক অভিজাত আবাসিক এলাকা। শহরের উপকণ্ঠগুলি দখল করে আছে বস্তির অধিবাসীরা। কম ভাড়ার সরকারি আবাস আছে মেক্সিকো শহরে বিপুল সংখ্যায়, কিন্তু সেই বাড়ির ভাড়া দেওয়া বা কেনার ক্ষমতা আছে শহরের মাত্র ৪০ শতাংশ লোকের। আর মাত্র ১০ শতাংশ লোক বেসরকারি আবাসিক এলাকার বাড়ি ভাড়া করতে বা কিনতে পারে। বিশিষ্ট নগরবিজ্ঞানী ম্যানুয়েল ক্যাসটেলস্ (Manuel Castells) তাই মন্তব্য করেছেন, শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাসস্থানের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে তারা শহরের যে-কোনো স্থান দখল করেও গৃহনির্মাণ করে বাস করতে থাকে। এই আবাসিক বসতির বেশিরভাগ হচ্ছে বেআইনি, তবু নগর কর্তৃপক্ষ এদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়।

মেক্সিকো শহরে তিন ধরনের 'জনপ্রিয় আবাসস্থল' দেখা যায়। প্রথমটি হচ্ছে 'স্ব-নির্মিত আবাসগৃহ' বা 'কলোনিয়াস প্রলেটারিয়াস' (Colonias Proletarias)—যেগুলির নির্মাণ হচ্ছে বেআইনী এবং এগুলি গড়ে ওঠে শহরের উপকণ্ঠে।

দ্বিতীয় ধরনের আবাসস্থল হচ্ছে 'বস্তি' বা 'ভেসিনদাদাস' (Vecindadas)। এই বস্তিগুলি শহরের পুরোনো এলাকায় গড়ে ওঠে এবং এগুলির বাসিন্দা হচ্ছে এমন সব পরিবার, যারা নানা ধরনের নিয়োজিত। এই ধরনের বস্তিতে প্রায় ২০ লক্ষেরও বেশি লোক বাস করে এবং তাদের বাসস্থানের পরিবেশের সঙ্গে আমাদের দেশের জবরদখল বসতির পরিবেশের তুলনা করা যায়।

তৃতীয় ধরনের আবাসস্থলের নাম হচ্ছে 'সিউদাদেস পারদিদাস' (Ciudades Perdidas)—যারা তুলনা করা যায় প্রথম ধরনের আবাসস্থলের সঙ্গে অর্থাৎ স্ব-নির্মিত আবাসগৃহের সঙ্গে। তবে এগুলি শহরের উপকণ্ঠে নয়, গড়ে ওঠে শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। সম্প্রতি নগর-কর্তৃপক্ষ এদের আবাসস্থলগুলির বেশিরভাগটাই উঠিয়ে দেওয়ার ফলে এর বাসিন্দারা শহরের মধ্যাঞ্চল ছেড়ে শহরের উপকণ্ঠে সরে গেছে।

মেক্সিকো শহরের ৯৪ শতাংশ অঞ্চলে নির্মিত অট্টালিকা ও বাসগৃহ দেখা যায়, কেবল ৬ শতাংশ অঞ্চল হচ্ছে মুক্ত। পার্ক, সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ প্রায় দুর্লভ এই শহরে। অথচ উত্তর আমেরিকায় বা ইউরোপের শহরগুলিতে বিপুর সংখ্যায় লোকজন বাস করলেও মাঠ বা পার্ক কিন্তু দেখা যায় এখানে। মেক্সিকো শহরে একটি বড় সমস্যা হচ্ছে দূষণ, কারণ হচ্ছে বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ি থেকে আগর ধোঁয়া এবং কলকারখানা থেকে উদ্‌গত ধোঁয়া। এই ধোঁয়াশাকে উত্তর আমেরিকার লস্ অ্যাঞ্জেলেস্ বেসিনের সাংঘাতিক ধোঁয়াশার থেকেও মারাত্মক, বলা হয়। আরও বলা হয়, মেক্সিকো শহরে বাস করার অর্থ হচ্ছে প্রতিদিন ৪০টি সিগারেটের ধোঁয়া পান করার মতো অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতা অর্জন।

৬৮.৫.১ নগরায়ণের ফলে তৃতীয় বিশ্বে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যা

আগেই আপনাদের বলেছি নগরায়ণের ফলে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত বিভিন্ন নানাধরনের নগরকেন্দ্রিক সামাজিক সমস্যা (urban social problems) দেখা দেয়। তার মধ্যে প্রধান সমস্যা শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব, গ্রাম থেকে শহরে পরিযান ও হহরে বস্তি স্থাপন (slum dwelling) ও জবরদখল বসতি (squatter settlement) স্থাপনের চেষ্টা। এগুলির কথা অন্য পরিচ্ছেদে আপনাদের বলা হয়েছে। শহরে বাসস্থানের সমস্যার (housing problem) কথাও আপনারা জেনেছেন। শহরে বাসস্থান-সংক্রান্ত সমস্যা ছাড়াও আরও নানারকম ও নানামুখী সমস্যা থাকে যা তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলিতে বসবাসকারী মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত। অধুনা অপহরণ, শিশু-অপরাধের ঘটনা প্রায়ই সংবাদপত্রের শিরোনামে স্থান পেয়ে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতির ফলে শহরে সংঘটিত অপরাধও প্রায় আন্তর্জাতিক চেহারা পেয়ে গেছে। শহরের নামকরা ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও তারপর মোটা টাকা মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া। অপহরণ নিয়ে এরকম নাটক ঘটেছে ভারতবর্ষেই একটা মহানগরে—কলকাতায়। শিশু-অপরাধের ঘটনা অবশ্য এখন শুধু উন্নতিশীল দেশগুলিতেই ঘটে না, পশ্চিমের অভিজাত সমাজেও শিশু-অপরাধ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের অপরাধের উৎসভূমি অবশ্যই শহর। এছাড়াও আছে শহরবাসী মানুষের একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতার সমস্যা। শহরের ব্যস্ত জীবন, টাকা রোজগার, সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়ার হাতছানি মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। এর জন্যে বন্ধুত্বের বন্ধন, আত্মীয়তার বন্ধন বা প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক সবকিছুই শহরে শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে মানুষ একাকী ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা শেষপর্যন্ত মানুষকে ঠেলে দেয় মানষিক অবসাদের চোরাস্রোতে। একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে শহরে মানুষ অনেকসময়ই মাদক ওষুধ সেবনে (drug addict) অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, আবার কোনো মানুষ বেছে নেয় আত্মহননের পথ। আধুনিক শহরের আরেকটি সামাজিক সমস্যা হল বৃদ্ধ ও বয়স্ক মানুষের আশ্রয় ও বাসস্থানের। আধুনিকীকরণ ও নগরায়ণের দ্বৈত স্রোতে চিরাচরিত যৌথ পরিবারগুলিতে ভাঙন ধরেছিল। যৌথ পরিবার ভেঙে আধুনিক কালে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট একক পরিবার কর্মরতা স্বামী-স্ত্রী এই একক পরিবারে সন্তান প্রতিপালন করতেই ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়, যেখানে বয়স্ক বাবা-মায়ের স্থান নেই। এই প্রয়োজন থেকেই শহরগুলিতে গড়ে উঠেছে বৃদ্ধাশ্রম বা বৃদ্ধ-আবাস। শেষ বয়সে এই বৃদ্ধ-আবার (old age home) গুলিই শহরের বাসিন্দা বয়স্ক মানুষদের কাছে আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের উষ্ণ আন্তরিকতা ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে এদের জীবন কি খুব নিরাপদভাবে কাটে?—আধুনিককালে সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে এই প্রশ্ন খুব বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আরেকটি সমস্যাও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে—শহরে নারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে। বড় বড় শহরে যেহেতু জীবিকার প্রয়োজনে বাইরে যেতে হয়, তাই নিরাপত্তার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া আছে, কর্মরতা নারীর ঘরে ও বাইরে দ্বৈত জীবন বাঁচিয়ে রাখার নানাবিধ সমস্যা। এছাড়াও আছে কন্যাশিশুর নিরাপত্তার বিষয়। কারণ বড় বড় শহরগুলিতেও কন্যাশিশু অপহরণকারী ও পাচারচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠার ফলে শহরবাসী মানুষ কন্যাসন্তানের বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তিত। এগুলি কমবেশি তৃতীয় বিশ্বের অনেকগুলি দেখে দেখা যায়।

পরিশেষে, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শহরে দু'ধরনের মানুষের সহাবস্থান আমরা লক্ষ্য করে থাকি। অভিজাত ও আর্থিক-সম্পন্ন মানুষ এবং দরিদ্র। তাই বড় বড়

শহরে দেখা যায়, আকাশচুম্বী বাড়ির পাশে নোংরা ঘিঞ্জি বস্তিবাড়ি কিংবা সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটবাড়ির সামনের ফুটপাথের বাসিন্দা অনেক মানুষ। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশগুলি এই বৈপরীত্যে-ভরা ছবি আমাদের উপহার দেয়। শহরে প্রাচুর্যের পাশে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও বেকারত্ব তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশে একধরনের শ্রমিকশ্রেণির জন্ম দেয়—এরা হল অসংগঠিত শ্রমিক (informal workers) বা প্রান্তিক শ্রমিক (marginal workers)। শহরে শিল্পের অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিপুল-সংখ্যক পুরুষ, নারী, এমনকি শিশুরাও দিন-মজুরির ভিত্তিতে নানা ধরনের কাজে নিয়োজিত হয়। তবে বলা বাহুল্য, এই ধরনের কাজে পরিশ্রমের তুলনায় মজুরি কম এবং এই কাজে সবচেয়ে বেশি শোষিত হয় নারী-শ্রমিক ও শিশু-শ্রমিক। পুরুষ-শ্রমিকরা ন্যায্য দাবির মাধ্যমে তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক চাইতে পারে এবং প্রয়োজন হলে সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু নারী ও শিশু শ্রমিকরা তা পারে না, তাই দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সময় ধরে কাজ করে তারা কম মজুরি পায়। অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কাজ করার দরুন নারী ও শিশু-শ্রমিকরা অনেকরকম কর্মজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় (Occupational health hazard) ভোগে। এছাড়া দারিদ্র্যের জন্যে অর্ধাহার, অনাহার বা অপুষ্টি এসব সমস্যা তো আছেই তৃতীয় বিশ্বের বড় বড় শহরে দারিদ্র্য যত বাড়ছে, বাড়ছে শহরের লোকসংখ্যা (informal sector) আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে (infornal sector) নারী-পুরুষ ও শিশু-শ্রমিকের ভিড়।

৬৮.৬ সারাংশ

এই এককে এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম তা থেকে নিশ্চয়ই তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণের সূচনা, গতিপ্রকৃতি ও তার প্রভাব বিষয়ে আপনাদের একটি সাধারণ ধারণা তৈরি হয়েছে। আলোচনার শুরুতেই আপনাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি 'নগরায়ণ' এই শব্দটি সম্পর্কে। 'নগরায়ণ' বোঝাতে ইংরেজিতে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয় 'আরবানাইজেশান' (urbanization) এবং 'আরবানিজম্' (urbanism)। আলোচ্য শব্দদুটির ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে সামান্য ফারাক আছে, কারণ 'আরবাইজেশান' বলতে বোঝাতে হয় একটি প্রক্রিয়াকে; অন্যদিকে, 'আরবানিজম্' হল জীবনের এক পদ্ধতি (as a way of life)। কিন্তু নগরায়ণের বিকাশ বা গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করলে 'নগরায়ণের' এই দ্বিতীয় অর্থ 'আরবানিজম্' (urbanism) গ্রহণ করা সম্ভব নয়, যদিও লুইস ওয়ার্থের (Louis Wirth) মতো সমাজতাত্ত্বিক 'আরবানিজম্' এই কথাটি 'নগরায়ণ' বোঝাতে ব্যবহার করেছিলেন। এরপর আপনাদের জানিয়েছি যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নগরায়ণের একটি সমৃদ্ধ এবং দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ইতিহাসগতভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণের গতিপ্রকৃতিকে নিতভাবে ভাগ করতে পারি। যেমন—প্রাক্-ঔপনিবেশিক শহর, ঔপনিবেশিক শহর এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক শহর। তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে একটি স্থানে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় এবং এই সাদৃশ্য হল তাদের ঔপনিবেশিক শাসনাধীন (colonial administration) থাকার অভিজ্ঞতা। আধিপত্য স্থাপনকারী শক্তিগুলির আধিপত্য বিস্তারের মাত্রা ও সময়কাল এক দেশ থেকে অন্য দেশে আলাদা হলেও, এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এক—এইসব দেশের উন্নত প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা ও শোষণ করা। এরপর পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আপনারা জেনেছেন লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের নগরায়ণের গতি-প্রকৃতি ও নগরায়ণের মাত্রা। জেনেছেন, এশিয়া ও আফ্রিকার তুলনায় লাতিন আমেরিকা হচ্ছে অনেক বেশিমাত্রায় নগরায়িত (urbanized) এবং কম নগরায়িত মহাদেশ

হল আফ্রিকা। কিন্তু এক দশক আগে অর্থাৎ ১৯৮১-১৯৯১-এর দশকে তুলনামূলকভাবে নগরায়ণের গতি দ্রুত হয়েছিল এবং সাম্প্রতিককালেও এই প্রবণতা বজায় আছে, যদিও পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় এই মহাদেশে এখনও অনেক অঞ্চল আছে যেখানে নগরায়ণের মাত্রা খুবই কম। অপরদিকে, এশিয়া মহাদেশে নগরায়ণের গতি, সন্দেহ নেই, দ্রুত। এই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানে বেড়েছে শহরের লোকসংখ্যা, কিন্তু সেই তুলনায় বাড়েনি কাজের সুযোগ। বর্ধিত লোকসংখ্যার ফলে এশিয়া মহাদেশের বড় বড় শহরগুলিতে সৃষ্টি হয়েছে বাসস্থানের সমস্যা। এছাড়াও নগরায়ণের ফলে উদ্ভূত অনেক সমস্যা, যেমন—দারিদ্র্য, অপরাধমূলক কাজকর্ম, পরিবেশ দূষণ, অসংগঠিত শ্রমিক—এগুলি প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বড় বড় শহরে।

৬৮.৭ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

নগরায়িত এলাকা	—	Urban area
পারস্পরিক নির্ভরশীলতা	—	Interdependence
অ-ব্যক্তিক সম্পর্ক	—	Impersonality
পরিযান	—	Migration
বিশেষীকরণ	—	Specialisation
সাধারণীকরণ	—	Generalization
বিকৃত নগরায়ণ	—	Distorted urbanisation
সংগঠিত ক্ষেত্র	—	Formal Sector
অসংগঠিত ক্ষেত্র	—	Informal Sector
শহরমুখী ঝোঁক বা প্রবণতা	—	Urban bias
সচলতার বিপ্লব	—	Mobility revolution
নির্ভরশীল জনসংখ্যা	—	Dependent urbanisation
শহরের জনসংখ্যা	—	Urban Future
নগর ভবিষ্যৎ	—	Urban Future
উপ-নগরায়ণ	—	Sub-urbanisation
নগরকেন্দ্রিক সামাজিক সমস্যা	—	Urban social problem
প্রান্তিক শ্রমিক	—	Marginal worker
কর্মজনিত স্বাস্থ্যসমস্যা	—	Occupational health hazard
ঔপনিবেশিক	—	Colonial administration

৬৮.৮ অনুশীলনী

(১) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য আর কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।

(ক) 'নগরায়ণ হল জীবনের এক পদ্ধতি'—এই অভিমত হল জর্জ সিমেলের।

(খ) 'নগরায়ণ কখনোই একমুখী প্রক্রিয়া নয়'—এই কথা বলেছেন লুইস ওয়ার্থ।

(গ) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নগরায়ণের একটি সুদীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে।

(ঘ) তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণের ব্যাপ্তির প্রথম অধ্যায়ে ছিল প্রাক্-ঔপনিবেশিক শহর।

(ঙ) তৃতীয় বিশ্বে 'নির্ভরশীল নগরায়ণ'—কথাটির প্রবক্তা হচ্ছেন ম্যানুয়েল ক্যাসটেলস্।

(চ) এশিয়া এবং আফ্রিকার তুলনায় লাতিন আমেরিকা হচ্ছে অনেক বেশিমাত্রায় নগরায়িত।

(ছ) মেক্সিকো শহরে প্রথম ধরনের জনপ্রিয় আবাসস্থল হচ্ছে বস্তি বা 'ভেসিনদাদাস' (Vecindadas)

(জ) তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম নগরকেন্দ্রিক সমস্যা হল দারিদ্র্য ও বেকারত্ব

(২) ৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন :

(ক) তৃতীয় বিশ্বের নগরকেন্দ্রিক সামাজিক সমস্যা।

(খ) তৃতীয় বিশ্বের একটি শহর সম্পর্কে।

(৩) ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন :

(ক) তৃতীয় বিশ্বে নগরায়ণের গতিপ্রকৃতি;

(খ) লাতিন আমেরিকায় নগরায়ণ।

(গ) আফ্রিকায় নগরায়ণ

(ঘ) এশিয়া মহাদেশে নগরায়ণ।

৬৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) গুগলার, জোসেফ—(*এডিটেড*) *দ্য আরবানাইজেশন অব দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮।

(২) গিলবার্ট, এ. অ্যান্ড যুগলার, জে.—*সিটিস, পভার্টি ডেভেলপমেন্ট আরবানাইজেশান ইন দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড*, লন্ডন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৮২।

(৩) দিব্দে, জয়মালা অ্যান্ড রঙ্গস্বামী, বিমলা—(*এডিটেড*) *আরবানাইজেশান, ট্রেন্ডস, পার্সপেকটিভস্ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস*, রাওয়াত পাবলিকিশেনস্, নিউ দিল্লী, ১৯৯৩।

(৪) মণ্ডল, আর. বি.—*আরবান জিওগ্রাফি—এ টেক্স বুক*, কনসেপ্ট পাবলিশিং, নিউ দিল্লী ২০০০।

(৫) রাও.এম.এস.ভাট, সি., কাদেকার, এল. এন.—(*এডিটেড*) *আ রীডার ইন আরবান সোশিওলজি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯১১।

একক ৬৯ ❑ নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন

গঠন

৬৯.১ উদ্দেশ্য
৬৯.২ প্রস্তাবনা
৬৯.৩ নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের সংজ্ঞা
    ৬৯.৩.১ এই আন্দোলনের প্রবক্তা ও তাঁর মতামত
৬৯.৪ এই আন্দোলন সম্পর্কে অন্য সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত
৬৯.৫ তৃতীয় বিশ্বে নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন মহিলাদের ভূমিকা
    ৬৯.৫.১ নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন : ভারতীয় প্রেক্ষাপট
৬৯.৬ সারাংশ
৬৯.৭ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী
৬৯.৮ অনুশীলনী
৬৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করব। এই একক অধ্যয়নের পর আশা করা যায় যে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন এবং ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হবেন। যেমন—

- নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন বলতে কী বোঝায়।
- অন্য সামাজিক আন্দোলনের থেকে নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের পার্থক্য।
- নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে বিশিষ্ট নগরবিজ্ঞানীর ধারণা।

৬৯.২ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককগুলিতে গ্রাম এবং শহরের রৈখিক পারম্পর্য, আধুনিক শহরের বিকাশ এবং তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান এককে নগরভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন নিয়ে আলোকপাত করা হবে।

নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝানো হয়, এই আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা কে এবং তাঁর অভিমত কী—এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে প্রথম অংশে।

পরবর্তী অংশে এই আন্দোলন সম্পর্কে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত অভিমত আপনার সামনে তুলে ধরা হবে।

তৃতীয় বিশ্বে নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে অন্তিম পর্যায়ে। এই অংশেই ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে।

৬৯.৩ নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের সংজ্ঞা

তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে শহর-নিবাসী দরিদ্র শ্রেণির (urban poor) মধ্যে নানা ধরনের তৃণমূল স্তরের সংঘবদ্ধ সংগঠন দেখা যায়। এই সংগঠনের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে একটিমাত্র বিষয়-নির্ভর স্বার্থগোষ্ঠী (interest group) থেকে গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়-নির্ভর নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন। এখন জানা প্রয়োজন কাকে বলব সামাজিক আন্দোলন? শহর বা বড় নগরে স্থানীয় ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সমষ্টিগতভাবে ভোগ্যবস্তুর ব্যবহার (collective consumption) ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যে আন্দোলন সংঘটিত হয়, তাকেই নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন বলা হয়। তবে এই ধরনের আন্দোলনের পেছনে থাকে শহরের মানুষের নানা অভাব-অভিযোগ ও অপূর্ণ দাবি। আগেই আপনারা জেনেছেন, উন্নত দেশে নয়, এই ধরনের সামাজিক আন্দোলন তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত নানা দেশে বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে। উদাহরণ হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত মেক্সিকো শহরের ভূমি ও স্বাধীনতার জন্য (Land and Liberty) সংগঠিত নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের নাম করা যায়। মেক্সিকো শহরে তৎকালীন রাজনৈতিক চাপের মধ্যে শহরের দরিদ্রশ্রেণির মানুষেরা তাদের আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল সফলতার সঙ্গে এবং অনেক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, এই আন্দোলনের ছত্রছায়ায় সংগ্রামী দরিদ্রশ্রেণির মানুষেরা নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় এবং ঐক্য রক্ষা করতে পেরেছিল। এর ফলশ্রুতিতে ১,৫০০ পরিবারের জন্য ১৯৭৩ সালে জমি দখলের মাধ্যমে 'Colonia Tierra Libertad' নামক কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে এখান থেকেই জমিদখলকারীদের কার্যবিধি পরিচালনা করা হত। এই আন্দোলনের ফলে অনেকগুলি ইতিবাচক দিক দরিদ্র মানুষের সামনে খুলে যায়; যেমন—শিল্পের অসংগঠিত ক্ষেত্রে একধরনের কাজ করার প্রবণতা ও নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা, অবিরত উচ্ছেদের ভয় নিয়ে বাসস্থানের জন্য লড়াই করে বেঁচে থাকা, শহরের নানারকমের সুযোগ-সুবিধা; যেমন—শিক্ষা, যানবাহন, চিকিৎসা-ব্যবস্থা ইত্যাদি পাওয়ার জন্য আকাঙক্ষা এবং সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল গ্রাম, পরিবার কিংবা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে উদ্ভবগত মিল। ই আন্দোলনকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল যে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত নানা স্তরের সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে এবং সংঘবদ্ধভাবে বাইরে থেকে বাধাদান করলে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। মেক্সিকো শহরে সংঘটিত এই Tierra Y Libertad (Movement for land and liberty) বা 'ভূমি ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন' শুধু দরিদ্রশ্রেণির মানুষের অভাব-অবিযোগেরই প্রতিফলন ছিল না, সেই সময়ে এই আন্দোলন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (social control) একটি অত্যন্ত কার্যকরী উপায় হিসাবেও কাজ করেছিল।

৬৯.৩.১ এই আন্দোলনের প্রবক্তা ও তাঁর মতামত

সত্যি কথা বলতে গেলে 'আরবান সোশ্যাল মুভমেন্ট' বা 'নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন' সম্পর্কিত ধারণা কিন্তু নগর-সমাজতত্ত্বের আলোচনায় খুব পুরোনো ধারণা নয়। বরং বলা ভালো এই ধারণাটি নেওয়া

হয়েছে সাম্প্রতিক মার্ক্সীয় নগর-সমাজতত্ত্ব থেকে এবং নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের প্রত্যয়কে (concept) সমাজতত্ত্বের পাঠ্যক্রম বা গবেষণার ক্ষেত্রে পরিচিত করার জন্য যাঁর কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করতে হয়, তিনি বিখ্যাত নগর-সমাজতত্ত্ববিদ (urban scociologist) ম্যানুয়েল ক্যাসটেলস (Manuel Castells : 1977)। ক্যাসটেলস শহরকে কখনোই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা নগরায়িত এলাকা (urban area) হিসাবে দেখেননি, তাঁর কাছে 'শহর' হচ্ছে শিল্পনির্ভর ধনতন্ত্রের (industrial capitalism) একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, সমষ্টিগত ভোগ্যবস্তু (collective consumption) ব্যবহার প্রক্রিয়ার একটি আবশ্যিক অংশ। বাড়িঘর, বিদ্যালয়, যানবাহন-ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হচ্ছে বিভিন্ন উপায় যার দ্বারা শহরের মানুষ আধুনিক শিল্পের বহুবিধ উৎপাদনকে ভোগ করছে। অন্যদিকে, সরকারি সংস্থাগুলি সরকারি আবাসন ও রাস্তাঘাট, পার্ক ইত্যাদি তৈরি করে প্রত্যক্ষভাবে শহর-জীবনের নানাদিককে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। আবার অনেক বেসরকারি সংস্থাও শহরের মানুষকে ঋণদান করে নানা ধরনের প্রকল্প নির্মাণে সাহায্য করছে। তাই শহরের বাহ্যিক রূপের পেছনে কার্যকরী থাকে সরকারি ক্ষমতা তথা বেসরকারি সংস্থার অবদান (contribution)।

ক্যাসটেলস বলেছেন, শহরের যে পরিবেশ তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, শহরের পরিবেশ হচ্ছে নির্মিত পরিবেশ (created environment)। কিন্তু শহরের এই নির্মিত পরিবেশ কখনোই ক্ষমতাশালী ও ধনী লোকেদের কার্যকলাপের ফলশ্রুতি মাত্র নয়; এর পেছনে রয়েছে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত শহরের নানা গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তনের জন্য সংঘটিত লড়াই ও সংগ্রাম। শহরের নানা সমস্যার জন্যই নানা ধরনের সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং এইসব আন্দোলনের পেছনে সক্রিয় থাকে যেসব বিষয়, তাহল— বাসস্থানের অবস্থার উন্নতি, পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সবুজ গাছপালা ও পার্ক প্রভৃতি গড়ে তোলা।

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য নগর বা শহরভিত্তিক যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে, ক্যাসটেলস্ (১৯৮৩) তাঁর নিজস্ব মতানুসারে এই আন্দোলনের একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, যা নগর সমাজতত্ত্বে 'নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের ক্যাসটেলীয় সংজ্ঞা' (Castellsian definition of urban social movement) নামে পরিচিত। ক্যাসটেলের মতে, তৃণমূলস্তরের শহরভিত্তিক কোনো সংগঠনের লড়াইকে 'সামাজিক আন্দোলন' বলা যায় যদি তার লক্ষ্য হয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোগত স্থিতাবস্থার মধ্যে বা শহরের ধরাবাঁধা কাঠামোর মধ্যে কোনো মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করা। এই ধরনের সামাজিক আন্দোলন অবশ্যই উদ্দেশ্যভিত্তিক হবে, যার মধ্যে থাকবে গোষ্ঠীর সংস্কৃতি রক্ষা, রাজনৈতিক স্ব-পরিচালনক্ষমতা অর্জন করা এবং যৌথ ভোগ্যবস্তু ব্যবহারের অধিকার অর্জন করা। শহরে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী যারা সমাজের কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন আনতে চায় না, তারা সামাজিক আন্দোলনকারী নয়, তারা শুধুমাত্র স্বার্থগোষ্ঠী (interest groups)। এই স্বার্থগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা যৌথ প্রচেষ্টায় শহরের দরিদ্রশ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না এবং তৃতীয় বিশ্বের নানা শহরে সংঘটিত নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের (urban social movement) লক্ষ্যগুলিও এরা ঠিকমতো তুলে ধরতে পারে না।

সংক্ষেপে, তৃণমূলস্তরের সংগঠনের ক্ষেত্রে ''আরবান সোশ্যাল মুভমেন্ট'' হচ্ছে একটি আদর্শ রূপ (ideal form)। ক্যাসটেলসকে অনুসরণ করে বলা যায়, আধিপত্যস্থাপনকারী আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যে তৃণমূল স্তরের সংগঠন শহরভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চায় তার কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকেন্দ্রিক পরিচিতি থাকবে এবং তা যৌথ কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজের মুক্তির বা স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করবে।

এক্ষেত্রে অস্বীকার করার উপায় নেই শহরভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনের ফলে কাঠামোগত সামাজিক সংস্কার (structral social reform) সাধন হতে পারে। কিংবা অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় শহরের দরিদ্রশ্রেণির মানুষের উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করতে কাঠামোগত সংস্কারই একমাত্র উপায় হিসাবে চিহ্নিত হয়। তবে এই সংস্কার তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক সংগঠনগুলির যৌথ ভোগ্যবস্তুর দাবিতে রাষ্ট্রের নিরন্তর সংগ্রামের প্রচেষ্টাকে দূরে সরিয়ে দিতে বা এড়িয়ে যেতে পারে না।

৬৯.৪ এই আন্দোলন সম্পর্কে অন্য সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত

ওপরের আলোচনায় তাহলে একটা কথা আপনাদের নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হল যে নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাছে সক্রিয় ভূমিকা নেন শহরের দরিদ্রশ্রেণির মানুষেরা (urban poor)। আগেই বলেছি, এই ধরনের আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের নানা শহরে। বিভিন্ন পর্যালোচনায় দেখা গেছে তৃতীয় বিশ্বে বস্তিবাসী মানুষেরা এই আন্দোলনে নিজেদের অপূর্ণ দাবিদাওয়া আদায়ে জন্য বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই নিয়ে বিস্তর তর্কবিতর্ক আছে যে বড় বড় শহরে বস্তির অস্তিত্ব অনস্বীকার্য এবং বস্তিবাসী মানুষদের সঙ্গী হল দারিদ্র্য এবং একটি বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা, যাকে অস্কার লুইস (Oscar Lewis/1966) বলেছেন 'দারিদ্র্যের সংস্কৃতি' (Culture of Poverty)। এই বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রার জন্যে দায়ী কেবল বঞ্চনা বা না-পাওয়ার কষ্ট নয়, বরং বস্তিবাসী মানুষের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন শিকড়হীনতা, বিচ্ছিন্নতা, কম মাইনের মজুরি, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের অভাব, বেকারত্ব প্রভৃতি। লাতিন আমেরিকা ও নিউ ইয়র্কের শহরাঞ্চলে অনুসন্ধানের কাজ চালাতে গিয়ে লুইস "কালচার অফ পভার্টি" বা "দারিদ্র্যের সংস্কৃতি" বিষয়ক ধারণা গড়ে তোলেন। লুইস এইসব শহরের ওপরে করা তাঁর পর্যালোচনায় দেখিয়েছে কীভাবে শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে এই দারিদ্র্যের সংস্কৃতি একটি 'উপ-সংস্কৃতি' হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। লুইসের (১৯৬৬) ভাষায়, 'বৃহৎ সমাজের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলিতে কার্যকরী অংশগ্রহণ এবং সংহতির অভাবকেই বস্তিনিবাসী মানুষের দারিদ্র্যের সংস্কৃতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।' তবে এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় বস্তিবাসীর দারিদ্র্যের সংস্কৃতি নয়, নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনে এরা কেমনভাবে জড়িয়ে পড়ে, সেটাই আমাদের বিবেচ্য। এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের আলোচনায় 'দারিদ্র্যের সংস্কৃতি' যা বস্তিবাসীর জীবনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে তার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? এর উত্তরে বলা যায়, বস্তিবাসী মানুষের জীবনযাপনের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বিচ্ছিন্নতা, শিকড়হীনতা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও যন্ত্রণার ফলশ্রুতিতে তাদের মানসিকতায় যে ক্ষোভ দানা বাঁধে, তার সংঘবদ্ধ প্রকাশ পায় আন্দোলন সংগঠিত করার মাধ্যমে। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন সময়ে নানা শহরে যে শহরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন হয়েছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, শহরের দরিদ্রশ্রেণির মানুষেরাই (urban poor) এই আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই বিষয়ে আপনাদের আগেই বলেছি। এই বিষয়ে বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক যোসেফ গুগলারের (Joseph Guglar : 1988) বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যায়। গুগলারের মতে, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির জন্য তৃতীয় বিশ্বে যত যুদ্ধ ও সংগ্রাম হয়েছে—তার মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষজন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে এই ধরনের যত সংগ্রাম হয়েছে তার ভিত্তি হচ্ছে শহরকেন্দ্রিক বিদ্রোহ এবং গুগলারের মতে, শহরকে কেন্দ্র করে যেসব, বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার পেছনে সক্রিয় ছিল অনেকগুলি কারণ। তিনি বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত চারটি বিপ্লবের

(revolution) উল্লেখ করেছেন, ইরান, বলিভিয়া, নিকারাগুয়া এবং কিউবা এবং এই চারটি বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন যে শহরবাসী মানুষজনের এই বিপ্লবে একটি দৃঢ় ভূমিকা ছিল। বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল শহরের শ্রমিকগণ, বস্তিবাসী মানুষজন, ছাত্রগণ ও অন্যরা। গুগলারের মতে তাই "সাম্প্রতিককালের বিপ্লবগুলি ছিল মূলত শহরভিত্তিক" (Contemporary revolutions are mainley of an urban nature)।

পিভেন এবং ক্লোয়ার্ড (Piven and Cloward) এই দুজন সমাজবিজ্ঞানী অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত দেশের সামাজিক আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেননি। এঁরা আধুনিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত চারটি সামাজিক আন্দোলন নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, এই সব আন্দোলনের মূলে ছিল শহরবাসী দরিদ্র-মানুষের ক্ষোভ ও যন্ত্রণা এবং তাঁদের প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছিল এমন একটা পর্যায়ে, যখন দৈনন্দিন জীবনযাপন হয়ে পড়েছিল সমস্যাকীর্ণ। পিভেন এবং ক্লোয়ার্ড (১৯৭৯) বলেছেন, পশ্চিমে এইসব আন্দোলন গড়ে ওঠার জন্য যেসব কারণ দায়ী ছিল তা হল দ্রুতগতির নগরায়ণ, শিল্পায়নের অগ্রগতি এবং আরও কতকগুলি কারণ।

সুসেন থরবেক (১৯৮৪) বলেছেন, নগরায়ণ প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষকে দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। প্রথমত, একদিকে নিজস্ব বাসভূমি থেকে উৎখাত হয়ে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ছন্দ থেকে পরিযান (migration) নিয়ে মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছিল বড় বড় শহরে এবং অন্যদিকে, শহরে এসে পছন্দমতো বাসস্থান না পেয়ে মানুষ ভৌগোলিকভাবে কোনো কোনো জায়গায় বেশি সংখ্যায় নানা অসুবিধা সত্ত্বেও থাকতে আরম্ভ করেছিল। কর্মসংস্থানের লোভে নিজেদের গ্রামীণ আশ্রয় ছেড়ে শহরে ভিড় করলেও এদের আশানুরূপ কাজ জোটেনি, জোটেনি মাথা গোঁজায় সুস্থ আশ্রয়। শিকড় হারানো এইসব মানুষ শহরে অপরিচিত মানুষের মধ্যে খুঁজে পায়নি আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব কিংবা হৃদরাবেগ। ফলে শহরের কেন্দ্রে কিংবা উপকণ্ঠে সামান্য বাসস্থানের জোগাড় করে নিলেও তারা শিকার হয়ে পদে পদে হতাশা, ক্ষোভ আর যন্ত্রণার। এইসব না-পাওয়ার কষ্ট হয়তো শেষ পর্যন্ত রূপ পায় সামাজিক আন্দোলনে।

পিভেন এবং ক্লোয়ার্ড (Piven and Cloward) বলেছেন, শহরভিত্তিক নানা ধরনের সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠার জন্য শুধু শহরে আসা পরিযায়ী মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাই একমাত্র কারণ ছিল না। এর পেছনে আরও অনেক কারণ ছিল, যেমন—সেইসময় শহরে প্রচলিত সাংস্কৃতিক বাতাবরণকে এসব মানুষ মন থেকে মেনে নিতে পারেনি, তারা হয়তো বিকল্প সংস্কৃতি (cultural alternative) অনুসন্ধান করেছিল। পিভেন এবং ক্লোয়ার্ডের এই মতামতকে খণ্ডন করতে হবসবম্ (Hobsbawm : 1979) বলেছেন, এসব প্রতিবাদী সামাজিক আন্দোলনের সাংস্কৃতিক উৎসভূমি ছিল পূর্ববর্তী সংঘটিত প্রতিবাদী আন্দোলন, যেগুলো পশ্চিম ইউরোপে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পেয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নাম করা যায়।

নগরায়ণ প্রক্রিয়ার নেতিবাচক দিকগুলি যে আগেও অনেক প্রতিবাদী আন্দোলন (protest movement) সংঘটিত হতে সাহায্য করেছে, এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন পিভেন এবং ক্লোয়ার্ড। ১৯৬০ এবং ৭০-এর দশকে "ব্ল্যাক মিলিট্যান্ট মুভমেন্ট" ঘটার পেছনে একটি অপরিহার্য কারণ ছিল কালো মানুষদের শহরে পরিযান, যার ফলশ্রুতিতে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে গ্রামের কৃষকরা নিজেদের জীবিকা ছেড়ে শহরে এসে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের শিকার হয়ে পড়েছিল। পিভেন এবং ক্লোয়ার্ড আরও উল্লেখ করেছেন যে মার্টিন লুথার কিং-এর হত্যাকাণ্ডের পর আমেরিকার শহরগুলির বস্তি অঞ্চলগুলিতে যে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা হল ghetto revolt (সংখ্যালঘুদের আন্দোলন)। এই প্রতিবাদী আন্দোলন ছিল জনকল্যাণকর

আন্দোলন ও এর কৌশলের (Welfare movement and its strategy) গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। ইভানস্ (Evans : 1979) তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন, SDS (Students of a Democratic Society), ERAP (Economic Research and Action Projects) এবং গরিব মানুষদের সংঘবদ্ধ করার আরও নানা প্রকল্প—এগুলিও প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার সঠিক পদক্ষেপ ছিল, যা ছিল অবশ্যই শহরভিত্তিক (urban in nature)।

ম্যানুয়েল ক্যাসটেলস্ (১৯৮৮) তাঁর লাতিন আমেরিকায় কৃত পর্যালোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন মেক্সিকো, চিলি আর পেরু শহরের অভিজ্ঞতা। চিলির ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন, যে বস্তি আন্দোলন (slum movement) শেষপর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় এসে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যা ক্যাসটেলসের মতে দুর্ভাগ্যজনক।

ক্যাসটেলস আরও বলেছেন তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশে সংঘটিত সমষ্টিগত আন্দোলন ও সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তি ছিল শহর। শহরে বাস করলে যেসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত (যেমন পানীয় জল, জল নিস্কাশন, যানবাহন ইত্যাদি) তা সরকারি তরফ থেকে যখন যথাযথভাবে দেওয়া হয় না, তখন শহরবাসী মানুষ প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে সমষ্টিগত সংগঠনের মাধ্যমে এবং তা শেষপর্যন্ত রূপ পায় শহরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনে। এই বিষয়ে ক্যাসটেলসের উক্তিটি উদ্ধৃত করার যোগ্য—"সামাজিক প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শহরগুলি মনে হয় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে" (Cities seem to create a basis for social protest movement)

৬৯.৫ তৃতীয় বিশ্বে নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা

নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকাও যে নগণ্য ছিল না, তা জানা যায় তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন শহরে সংঘটিত আন্দোলনের ইতিহাস থেকে। যেমন—বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে ব্রাজিলে যত সামাজিক আন্দোলন হয়েছে তাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গড়ে ৮০ শতাংশ ছিলেন মহিলা। এঁরা সক্রিয়ভাবে সংগঠন গড়ে তোলা ও আন্দোলন পরিচালনা করার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হল মহিলাদের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকাগ্রহণ সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নে তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল ভীষণ কম। শিল্পে উন্নতিশীল দেশগুলিতে, দেখা গেছে, নগরকেন্দ্রি সামাজিক আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের (sexual division of labour) সঙ্গে। তৃতীয় বিশ্বের শহরে বাসকারী দরিদ্রশ্রেণির মহিলাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক মহিলা বেতনহীন গৃহকর্মে (unpaid domestic work) নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন, কারণ বেশিসংখ্যক মহিলাদের জীবিকানির্বাহের জন্য শিল্পের অসংগঠিত ক্ষেত্রে (informal sector) নানারকম কাজ করতে হত। জীবিকার জন্য তাদের কাজের প্রকৃতি ও তার সঙ্গে ঘরের দায়দায়িত্বের জন্য তারা প্রথাগত রাজনৈতিক সংগঠনে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারেননি। এই সীমাবদ্ধতার দরুন স্থানিক সমস্যার প্রতি মহিলারা বেশি করে সংবেদনশীল হয়ে পড়েছিল এবং এইসব সমস্যা ও অসুবিধা দূর করার জন্য তারা সংঘবদ্ধ কার্যকলাপের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিল। স্বাস্থ্য, আবাসন এবং চাকরির সমস্যাই ছিল সামাজিক বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান।

মূলত এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য তারা শহরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

উদাহরণ হিসেবে, আপনাদের কাছে, ১৯৭০-এর দশকে ব্রাজিলের সাও পাওলোতে (Sao Paulo) সংঘটিত আন্দোলনের কথা তুলে ধরতে পারি। এই দশকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং তীব্র শিল্পায়নের চাপ শহরে-বাসকারী বস্তিবাসী মানুষের জীবনে নানা সমস্যা নিয়ে আসে, কারণ দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য দরকারী সুযোগ-সুবিধা দরিদ্রশ্রেণির মানুষের কাছে সীমিত হয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে মহিলারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁরা নিজস্ব সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে জনসংযোগ বাড়িয়ে নানা সংগঠন (যেমন মাদারস্ ক্লাব বা চার্চ গ্রুপ) গড়ে তোলেন। এসব সংগঠনের নানা কার্যাবলীর মধ্যে ছিল—

(১) গৃহে আয়োজিত সভা (House Meeting) : সংগঠনের সদস্যদের বাড়িতে এই ধরনের ঘরোয়া সভা আয়োজিত হত। এসব সভা চলত অনেক সময় ধরে। সভা-আয়োজনের সময়কাল ছিল এমন, যখন সব সদস্যরা সুবিধাজনকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারত। এইসব সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে উঁচু-নীচু পদের ব্যবস্থা না থাকায় সব সদস্যকেই তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হত। স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে মজবুত করে গড়ে তোলা এবং ঐক্যসাধনের কাজে এই ধরনের "হাউস মিটিং" খুব কার্যকরী ছিল, সন্দেহ নেই।

(২) স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ (Spontaneous Political Activities) : সাও পাওলাতে যখন একাধিক প্রতিবাদী আন্দোলন চলতে থাকত, তখন দেখা গেছে একটি আন্দোলন অন্য আন্দোলন থেকে (রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালু রাখার জন্য) সমর্থন আদায় করার প্রচেষ্টা করত। যেমন, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যখন শিশুদের জন্যে গুঁড়োদুধ প্রায়ই পাওয়া যেত না, তখন স্বাস্থ্যবিষয়ক আন্দোলন (Health Movement) স্থানীয় বেকারদের সমিতি (Local Unemployment Committee) থেকে সদস্যদের নিজস্ব সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করত এবং শহরের কেন্দ্রে এইভাবে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলত। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে ছিল ক্ষুধার্ত গরিব মানুষদের দ্বারা বড় বড় বাজার ও দোকান থেকে খাদ্যের বস্তা লুঠ ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও দেখা গেছে, মহিলারা এমন ধরনের কাজে অংশ নিয়েছেন। ১৯৮৩-এর ১৫ সেপ্টেম্বরে রিও-ডি-জেনেরোতে (Rio de Janerio) একদল মহিলা সুপারমার্কেট থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য লুঠ করেন এবং শহরের নানাস্থানে পরবর্তী দশ দিনে এরকম প্রায় ৫০টি ঘটনা ঘটেছিল। তবে এসব ঘটনার কোনো হিংসাত্মক আচরণ প্রকাশ পায়নি। সমস্ত ঘটনাগুলিই ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত এবং লুঠ করা খাদ্যশস্যের মধ্যে ছিল চাল, তেল, ধানের মতো প্রধান খাদ্য। প্রতিটি ঘটনাতেই দেখা গেছে মহিলাদের ছোট ছোট দল সংঘবদ্ধ হয়ে স্থানীয় দোকানে বা বড় বাজারে এই ধরনের খাদ্যভর্তি বস্তা লুঠ করেছে।

(৩) জনসংযোগ ও প্রচার (Mass Commnication & Publicity) : স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং মৌখিক সংযোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সামাজিক প্রতিবাদী আন্দোলন বিষয়ে অবহিত করানো হত এবং এইধরনের কাজে মহিলারা ভূমিকা পালন করতেন। আন্দোলন পরিচালনা করা বা গড়ে তোলার বিষয়ে যাঁদের পূর্ব অবিজ্ঞতা ছিল সেইসব ব্যক্তিকে প্রতিবেশী, বন্ধু বা আত্মীয় মারফত আমন্ত্রণ জানানো হত। মহিলারা সহজাত দক্ষতায় এইসব কাজও ভালোই করতে পারতেন।

পরিশেষে তাই বলা যায়, নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনগুলি কেবলমাত্র দ্বারা বা মহিলাদের জন্য (only by women or for women) পরিচালিত হয়নি। কিন্তু নগরায়ণ প্রক্রিয়ার নেতিবাচক প্রভাবকে মোকাবিলা করার জন্য এবং শহরে বাস করার ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করার কাজে তৃতীয় বিশ্বের

দেশগুলিতে বহু আন্দোলনে মহিলারা যে কার্যকরী শক্তি (effective force) হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী যেমন ক্যাসটেলস্ (১৯৮৮) ইভানস্ (১৯৭৯), ম্যাসন (১৯৭৬), ম্যুনিয়ের (১৯৭৬) তাঁদের সমীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমেও সামাজিক আন্দোলনের মহিলাদের ভূমিকা ও অবদানের কথা স্বীকার করেছেন।

৬৯.৫.১ নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন : ভারতীয় প্রেক্ষাপট

ওপরের আলোচনায় আপনারা জানলেন তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষত লাতিন আমেরিকায় শহরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়ে। এবার আমরা আলোচনা করব তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত এশিয়া মহাদেশের একটি দেশ সম্পর্কে। ভারতবর্ষের মহানগরী কলকাতায় বস্তিবাসীদের আন্দোলন ছিল কলকাতাভিত্তিক একটি সংগঠিত সামাজিক আন্দোলন। যে-কোনো আন্দোলন গড়ে ওঠার পেছনে যেমন সক্রিয় থাকে কতকগুলি কারণ, কলকাতায় বস্তিবাসীদের আন্দোলনের (Slum-Dweller's Movement in Calcutta) পেছনেও তেমন কতকগুলি কারণ ছিল। ভারতবর্ষে দেখা গেছে নগরায়ণ এবং বস্তি অঞ্চল গড়ে ওঠা—দুটি প্রক্রিয়াই পাশাপাশি চলেছিল। অন্যভাবে বলা যায়, বস্তিঅঞ্চল (যেখানে বাস করত শহরের দরিদ্রশ্রেণির মানুষ (urban poor) সেগুলো ছিল পৌর সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং অবশ্যই নগরায়ণের অনিবার্য পরিণতি। দারিদ্র্যের তাড়নায় ও বেকারত্বের জন্য গ্রাম থেকে আসা মানুষদের শহরের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে (যেখানে খুব কম ভাড়ায় বাসস্থান সুলভ ছিল) ভিড় জমাতে হয়েছিল। এইসব বস্তিবাসী মানুষ কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে কিংবা অসংগঠিত ক্ষেত্রে দিন-মজুর (wage labour) হিসাবে কাজ করত। এইসব দরিদ্রশ্রেণির মানুষেরা, যারা বেশিরভাগ ছিল বস্তিবাসী বা জবরদখল (squatter settlers)—শহরের জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে অপরিহার্য হলেও, এদের সামাজিক অবস্থান সম্মানজনক ছিল না মোটেই।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫১ সালে বস্তি উচ্ছেদ নীতি (Policy of Slum Clearence) গ্রহণ করে, যার উদ্দেশ্য ছিল—(১) ভারতবর্ষের শহরগুলোকে সুন্দর ও আধুনিক করে তোলা এবং (২) উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে বিকল্প আবাসন গড়ে তোলার জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করা। কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারও ১৯৫৭ সালে বস্তি উচ্ছেদ নীতি গ্রহণের পরিকল্পনা করে। এর আগে ১৯৪৯ সালে গৃহীত কলকাতা ঠিকা টেনান্সি বিল (Calcutta Thika Tenancy Bill) বস্তিবাসীদের মনে ক্ষোভ সঞ্চার করেছিল, কারণ এই বিল ছিল অসংগতিতে ভরা। গণসমর্থন লাভের জন্য এই বিলের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু ব্যাপক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগঠিত হতে থাকে ১৯৫৪ সালে ''ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট বিল'' গৃহীত হবার পর, কারণ বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হবার ভয় বস্তিবাসীদের আশঙ্কিত করে তোলে। এইসময় বিরোধী দল 'কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (CPI) বস্তিবাদীদের সংগঠনকে সহযোগিতা দিলে এই আন্দোলন শক্তিশালী হয়। ধর্ম-বয়স-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবশ্রেণির মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালে ''অল ইন্ডিয়া বস্তি ফেডারেশন'' (AIBF) গড়ে ওঠে এবং বস্তি আন্দোলনকে একটা সুষ্ঠু চেহারা দেবার জন্য এতে নেতৃত্ব দান করে কমিউনিস্ট দল। সর্বভারতীয় বস্তি ফেডারেশনের (All India Basti Federation) উদ্দেশ্য ছিল বস্তি অঞ্চলে বস্তিবাসীদের প্রতিষ্ঠ, ঠিকা টেনান্সি আইনের (Thika Tenancy Act) সংশোধন এবং বস্তি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা ও পানীয় জল ব্যবস্থার উন্নতি।

বস্তিবাসীদের আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় ১৯৫৭ সালের রাজ্য বিধানসভায় ''বস্তি সাফাই সংক্রান্ত বিল'' (Slum Clearence Bill) পেশ হবার পর। ব্যাপক প্রতিবাদ ও মতানৈক্যের ঝড় ওঠে বিরোধীদের মধ্যে। তৃতীয় পর্যায়ের আলাপ-আলোচনার পর ১৯৫৮ সালে ৫ই জুলাই বিলটি পাশ হয়। সর্বভারতীয় বস্তি ফেডারেশন বিলটির বিরোধিতা করে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে। ১০,০০০ বস্তিবাসী মানুষ এই মিছিলে যোগদান করে; যার মধ্যে অনেক মহিলাও ছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলনে বিচ্ছিন্ন আন্দোলন ছিল না, গরিব ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের অন্যান্য আন্দোলনও এর সঙ্গে যুক্ত করে দেবার চেষ্টা হয়। যেমন—সেইসময় পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যবস্তুর চরম সংকট চলছিল বলে কম্যুনিস্ট দল খাদ্য আন্দোলনকে এর সঙ্গে যোগ করে যুগ্ম আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেয়।

বস্তি সাফাই সংক্রান্ত বিল আইনে পরিণত হবার সময় এই আন্দোলনের জন্য রাজ্য সরকার বিলে কতকগুলি পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন। প্রথমত, পুনর্বাসনের বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে বিলটি পরিবর্তন করে আইনের নতুন নাম হয়—''কলকাতা স্লাম ক্লিয়ারেন্স অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফ স্লাম ডুয়েলার্স'' (CSCRSD) এবং দ্বিতীয়ত, বস্তির কাছাকাছি বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তবেই উচ্ছেদ করতে হবে—এই ব্যাপারেও জোর দেওয়া হয়।

কলকাতায় বস্তিবাসীর আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় ১৯৬০-এর শেষদিকে বা তারও পরে স্তিমিত হয়ে আসে, শহরের এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত কিছু প্রতিবাদী ঘটনা ছাড়া।

কিন্তু পরিশেষে এটা স্বীকার করতেই হবে যে কলকাতায় বস্তিবাসীদের দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফলেই বর্তমানে বস্তিনিবাসী মানুষকেও শহরে সমাজের একটি আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের নানা সমস্যা ও অভাব-অভিযোগের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের আলোচনা আমরা কলকাতায় সংঘটিত বস্তিবাসীর আন্দোলনের কথা জানালাম। সাম্প্রতিককালে পরিবেশ নিয়ে যে আন্দোলন চলছে তাকেও এই ধরনের প্রতিবাদী সামাজিক আন্দোলন বলা যায়। এই ধরনের আন্দোলন আগে কলকাতা শহরেই হয়েছে, যেমন 'গ্রীন ক্যালকাটা মুভমেন্ট।' এছাড়া, মেধা পাটেকার এবং সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে সংঘটির 'সর্দার সরোবর প্রকল্প' ও 'তেহরি হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রকল্পের' কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সরকারি নীতির প্রবল বিরোধিতা করে। সরকারি নীতির নেতিবাচক দিক সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে পাটেকার ও বহুগুণার সুযোগ্য নেতৃত্বে ''পরিবেশ আন্দোলন'' মানুষের মধ্যে সাড়া জায়গা এবং প্রতিবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়।

৬৯.৬ সারাংশ

এতক্ষণের আলোচনায় আপনাদের হয়তো বোঝাতে পেরেছি যে নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয় শহরের দরিদ্রশ্রেণিভুক্ত মানুষের দ্বারা এবং এই অন্দোলন গড়ে তোলার মুল উদ্দেশ্য হল এইসব মানুষের অপূর্ণ দাবিদাওয়া, অভিযোগ ইত্যাদি পূরণ করা এবং নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা (to develop the quality of life) এটি। অবশ্যই সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা। তবে 'আরবান সোশ্যাল মুভমেন্ট' বা 'নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন' সম্পর্কিত ধারণাকে ব্যাপকভাবে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় পরিচিত করেছেন নগরসমাজতত্ত্ববিদ্ ম্যানুয়েল ক্যাসটেলস্। ক্যাসটেলস্-প্রদত্ত সংজ্ঞাকে, তাই নগর-

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় 'নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের ক্যাসটেলীয় সংজ্ঞা' বলা হয়। তৃণমূলস্তরের শহরভিত্তিক কোনো সংগঠনের লড়াই, যার লক্ষ্য হচ্ছে আর্থ-রাজনৈতিক স্থায়ী কাঠামোর মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করা, তাকেই ক্যাসটেলস 'আরবান সোশ্যাল মুভমেন্টস' বলে অভিহিত করেছেন। ক্যাসটেলসের মতে, শহরে দরিদ্রশ্রেণির তৃণমুল স্তরের সংগঠনের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন হচ্ছে একটি আদর্শ রূপ (ideal type)। এবং এই আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত বহু শহরে। সমাজবিজ্ঞানীরা বড় বড় শহরে বস্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং নানা সমীক্ষায় লক্ষ্য করেছেন, বস্তিবাসী মানুষের মনে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও বঞ্চনার কারণে যে ক্ষোভ দানা বাঁধে, তার সংঘবদ্ধ প্রকাশ পায় নানা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই বস্তিবাসী মানুষ ও জবরদখলকারী (Squatter settlers) নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা ৫০-এর দশকে আমাদের শহর খাস কলকাতাতে সংঘটিত বস্তিবাসীদের আন্দোলনের (Slum Dweller's Movement in Calcutta) কথা উল্লেখ করতে পারি। নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের মহিলাদের কার্যকরী ভূমিকার কথা আমরা জানতে পারি তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন শহরের আন্দোলনের ইতিহাস থেকে। ৭০-এর দশকে ব্রাজিলের সাও পাওলাতে (Sao Paulo) সংঘটিত প্রতিবাদী আন্দোলনে মহিলারা প্রভূত সহযোগিতা করেছিলেন এবং নিজস্ব সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে জনসংযোগ বাড়িয়ে নানা ধরনের সংগঠন গড়ে তোলেন। তৃতীয় বিশ্বে যে সমস্ত সামাজিক সমস্যার জন্য আন্দোলন গড়ে উঠত তার মধ্যে প্রধান ছিল স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং জীবিকা অর্জনের জন্য চাকরির সমস্যা।

৬৯.৭ পরিভাষা ও শব্দপঞ্জী

স্বার্থগোষ্ঠী	—	Interest group
শহরবাসী দরিদ্রশ্রেণির মানুষ	—	Urban Poor
সমষ্টিগত ভোগ্যবস্তুর ব্যবহার	—	Collective Consumption
সামাজিক নিয়ন্ত্রণ	—	Social control
শিল্পনির্ভর ধরতন্ত্র	—	Industrial capitalism
অবদান	—	Contribution
নির্মিত পরিবেশ	—	Created environment
কাঠামোগত সামাজিক সংস্কার	—	Structural Social Reform
আদর্শরূপ	—	Ideal type
বিপ্লব	—	Revolution
পরিযান	—	Migration
বিকল্প সংস্কৃতি	—	Cultural alternatives
প্রতিবাদী আন্দোলন	—	Protest Movement
বস্তি আন্দোলন	—	Slum Movement
লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন	—	Sexual division of labour
অসংগঠিত ক্ষেত্র	—	Informal sector
জবরদখলকারী	—	Squtter settlers
দিনমজুর	—	Wage Labour

৬৯.৮ অনুশীলনী

(১) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য আর কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।

(ক) ভূমি ও স্বাধীনতার জন নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয় সাও পাওলো শহরে।

(খ) ম্যানুয়েল ক্যাসটেলস ছিলেন নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা।

(গ) তৃণমূল স্তরের সংগঠনের ক্ষেত্রে 'আরবান সোশ্যাল মুভমেন্ট' হচ্ছে একটি আদর্শ রূপ।

(ঘ) 'দারিদ্র্যের সংস্কৃতি'—কথাটি ব্যবহার করেন যোসেফ গুগলার।

(ঙ) পিভেন এবং ক্লোয়ার্ড তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত দেশের সামাজিক আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেছেন।

(চ) নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের সঙ্গে।

(ছ) নগরকেন্দ্রিক সাামজিক আন্দোলনগুলি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য পরিচালিত হয়।

(জ) কলকাতায় বস্তিবাসীদের আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় ১৯৬০-এর শেষদিকে বা তারও পরে স্তিমিত হয়ে আসে।

(২) ৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন :

(ক) ক্যাসটেলস প্রদত্ত নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনে সংজ্ঞা।

(খ) নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে পিভেন ও ক্লেয়ার্ডের অভিমত।

(৩) ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন :

(ক) তৃতীয় বিশ্বে নগরকেন্দ্রিক সামাজিক আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা।

(খ) কলকাতায় সংঘটিত বস্তিবাসীদের আন্দোলন।

৬৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) ক্যাসটেলস্, এম.—*দ্য আরবানা কোয়েশ্চান*, আর্নল্ড, লন্ডন ১৯৭৭।

(২) থরবেক সুসেন—*জেন্ডার অ্যান্ড স্লাম কালচার ইন আরবান এশিয়া*।

(৩) চৌরে, এস. কে., অ্যান্ড চক্রবর্তী, বি,—*সোশ্যাল মুভমেন্টস ইন কনটেমপোরারি ইন্ডিয়া*, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৯।

(৪) পিক্‌ভান্স. সি. জে.—*আরবান সোশিওলজি, ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস, ট্যাভিস্টক*, লন্ডন, ১৯৭৬।

(৫) স্কুরম্যান, এফ. অ্যান্ড নেরসেন, টি. ভ্যান—*আরবান সোশ্যাল মুভমেন্টস ইন দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড*, রুটলেজ, লন্ডন, ১৯৮৯।

ই. এস. ও.—৫

পর্যায় ২০

একক ৭০ ❑ গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো

গঠন

৭০.১ উদ্দেশ্য

৭০.২ প্রস্তাবনা

৭০.৩ গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর প্রকৃতি

    ৭০.৩.১ সামাজিক কাঠামো

    ৭০.৩.২ ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজ কাঠামো

৭০.৪ পরিবার

    ৭০.৪.১ গ্রামীণ ভারতীয় সমাজে পরিবার ব্যবস্থা

    ৭০.৪.২ পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন

৭০.৫ জ্ঞাতিত্ব

৭০.৬ জাতিগোষ্ঠী

    ৭০.৬.১ জাতি

    ৭০.৬.২ উপজাতি

    ৭০.৬.৩ জাতিব্যবস্থায় পরিবর্তন

৭০.৭ ভূমিসম্বন্ধীয় শ্রেণি কাঠামো

৭০.৮ গ্রাম

    ৭০.৮.১ গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত বিতর্ক

    ৭০.৮.২ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো এবং নেতৃত্বের পরিবর্তন

৭০.৯ সারাংশ

৭০.১০ অনুশীলনী

৭০.১১ উত্তরমালা

৭০.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৭০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবেন :

- সামাজিক কাঠামো সংক্রান্ত ধারণা;
- ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর প্রকৃতি;
- গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন এককসমূহ, যথা—পরিবার, জ্ঞাতিত্ব, জাতিগোষ্ঠী, ভূমিসম্বন্ধীয় শ্রেণি কাঠামো, গ্রাম ইত্যাদি।

৭০.২ প্রস্তাবনা

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সামাজিক কাঠামো খুবই প্রাসঙ্গিক। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়গুলি সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। পরিবার, জ্ঞাতিত্ব, জাতি, শ্রেণি এবং সর্বোপরি গ্রাম নিয়ে গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। এইগুলিকে সমাজ কাঠামোর এক-একটি স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। গ্রামে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা এই সমস্ত উপাদান বা এককগুলির দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তবে কালের বিবর্তনে পরিবার, জাতিব্যবস্থা, শ্রেণি এবং গ্রামের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু ঐ সমস্ত এককগুলি তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, বর্তমান এককে আমরা গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর স্তম্ভস্বরূপ এই সমস্ত এককগুলি নিয়েই আলোচনা করব।

৭০.৩ গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর প্রকৃতি

গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা শুরু করার পূর্বে সামাজিক কাঠামো (social structure) বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পরে গ্রামীণ সমাজ কাঠামো নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হবে।

৭০.৩.১ সামাজিক কাঠামো

সমাজ গঠিত হয় ব্যক্তিসমষ্টি নিয়ে। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গ নিজ চাহিদা পূরণের জন্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় (Social Interaction) লিপ্ত হয়ে থাকে। এই সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট মর্যাদায় (status) ভূষিত হয় এবং মর্যাদা অনুসারে নিজ নিজ ভূমিকা (roles) পালন করে। মর্যাদা এবং ভূমিকার সঙ্গে অধিকার (rights) এবং নীতিগত বাধ্যবাধকতাসমূহ (obligations) বিশেষভাবে সংযুক্ত থাকে। সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ (social behaviour) কতকগুলি নির্দিষ্ট আদর্শমান (norms) এবং মূল্যমান (values)-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই গোষ্ঠী (groups), জনসম্প্রদায় (community), সংঘ (associations), প্রতিষ্ঠান (Institutions) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক একক (social units)-এর উৎপত্তি হয়ে থাকে।

'সামাজিক কাঠামো' (social structure) শব্দটির একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই শব্দটির অবতারণা করেছেন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর আলোচনা করেছেন। কার্ল ম্যান্‌হেইম মনে করেন যে, কাঠামো হল 'মিথস্ক্রিয়াকারী শক্তিসমূহের জাল' (the web of interacting social forces), যার থেকে পর্যবেক্ষণ এবং চিন্তনের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহের আবির্ভাব হয়েছে। র‍্যাডক্লিফ্ ব্রাউনের মতে, সামাজিক কাঠামো হল প্রাতিষ্ঠানিক রূপে সংজ্ঞায়িত ও নিয়ন্ত্রিত সম্পর্কের মধ্যে কিছু মানুষের একটা ব্যবস্থা (an arrangement of persons in relationship institutionally defined and regulated)। ট্যলকট্ পারসন্স 'সামাজিক কাঠামো' পদটিকে (term) পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, এজেন্সিসমূহ এবং সামাজিক ধাঁচ তথা মর্যাদা ও ভূমিকা যা প্রত্যেক ব্যক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে ধারণা করে থাকে—এসবের এক বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা (arrangement) বা বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

৭০.৩.২ ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজ কাঠামো

ভারতীয় সভ্যতা অত্যন্ত সুপ্রাচীন, এই সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে আমাদের খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে উদ্ভূত সিন্ধু সভ্যতার যুগে ফিরে যেতে হয়। সেই সময় থেকে মাঝের কয়েকটি ব্যতিক্রমী যুগের কথা বাদ দিলে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত গ্রাম এবং শহরের পাশাপাশি অবস্থান ভারতীয় সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রাচীনকাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়। শহরে বসবাসকারী মানুষের যেমন খাদ্যসামগ্রী, শিল্পে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (raw materials) ইত্যাদি কারণে গ্রামের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়, ঠিক তেমনই গ্রামের অধিবাসীরা তৈরি দ্রব্য এবং তারা বাজার (manufactured goods) সংক্রান্ত ব্যাপারে শহরের ওপর বিশেষবাবে নির্ভর করে। তবে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে যতই পরনির্ভরশীলতা থাকুক না কেন, কতকগুলি ক্ষেত্রে যেমন—আকার, জনঘনত্ব, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

শহরের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে গ্রামের জনসংখ্যা শহরের থেকে কম এবং শহরের জনঘনত্ব গ্রামের থেকে অনেক বেশি, সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষে গ্রামের সংখ্যা শহরের থেকে অনেক বেশি। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে আমাদের দেশে শহরের সংখ্যা হল ৩:৬০৯টি এবং গ্রামের সংখ্যা ৫:৫৭,১৩৭টি। এছাড়াও ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ শতাংশের ওপর গ্রামে বসবাস করে। গ্রামের অধিবাসীদের সাথে প্রকৃতির বিশেষত জমি, উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক (Direct relaionship) গড়ে ওঠে। কৃষিকাজ হল গ্রামবাসীদের প্রধান জীবিকা। ভারতবর্ষের মোট শ্রমজীবী মানুষের অন্তত শতকরা ৬০ শতাংশ কৃষিকাজের সাথে কোনো না কোনোভাবে সংযুক্ত থাকে।

পরিবার (family), জ্ঞাতিত্ব (kinship), জাতি (caste), শ্রেণি (class) এবং গ্রাম (village) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি অতি প্রাচীন এবং দীর্ঘস্থায়ী। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার সাথে বিশেষভাবে সংযুক্ত। সামাজিক আদর্শমান (norms) মূল্যমান (values) মর্যাদা (status) এবং ভূমিকা (roles), অধিকার (rights), নীতিগত বাধ্যবাধকতাসমূহ (obligations) ঐ সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলীর মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

এখন, গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো প্রসঙ্গে এই সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা এককগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আপনি গ্রামীণ সমাজ কাঠামো সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারবেন।

৭০.৪ পরিবার

যে-কোনো ধরনের সমাজেই পরিবার (family) একটি গুরুত্বপূর্ণ একক। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এটি বিশেষভাবে সত্য কারণ এই সমাজব্যবস্থায় একজন ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তার পরিবার এবং পরিবারের সামাজিক মর্যাদার (social status) ওপর।

৭০.৪.১ গ্রামীণ ভারতীয় সমাজে পরিবার ব্যবস্থা

গ্রামীণ সমাজে পরিবার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social institution)। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রজনন (reproduction), উৎপাদন (production), সামাজিকীকরণ (socialisation) ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের চাহিদাপূরণের মাধ্যমে সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থাটিকে বজায় রাখে।

এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিক বিচারে কৃষিপ্রধান। ভারতবর্ষও এই বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম নয়। এ দেশের অর্থনীতিও মূলত কৃষিনির্ভর। ফলে, ভারতের অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক অভিন্ন ধরনের পারিবারিক সংগঠনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক সমাজের সাবেকী পরিবার ব্যবস্থাও পৃথিবীর বিভিন্ন কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজের পারিবারিক সংগঠনের সমরূপ। এই ধরনের পরিবার ব্যবস্থাকে বলা হয় একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবার (joint family)। অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, ভারতবর্ষকে অনেক সময়ই 'যৌথ পরিবারের' দেশ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সমাজতত্ত্বে 'যৌথ পরিবার' কথাটি খুব কমই ব্যবহৃত হয়। এখানে সাধারণত একক পরিবার (Nuclear family) এবং বর্ধিত পরিবারের (extended family) মধ্যে প্রভেদ করা হয়। সাধারণত একক পরিবার বলতে সেই পরিবারকে বোঝানো হয় যেটি স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত (unmarried) সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে গড়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের যৌথ পরিবার সম্পর্কে কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা পাওয়া খুবই দুষ্কর। অনেকেই এই পরিবারকে ভারতের সাবেকী পরিবার-ব্যবস্থা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কোনো পরিবার যখন রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত, বাবা মা ভাই বোন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, শুধুমাত্র দম্পতিকেন্দ্রিক নয়, তখন তাকে যৌথ পরিবার বলা হয়। ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবারের প্রচলন তুলনামূলকভাবে বেশি লক্ষ্য করা যায়। অনেকের অভিমত অনুসারে বলা যায় যে, যৌথ পরিবার রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিকে গড়ে ওঠা কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টি। আই. পি. দেশাই যৌথ পরিবার বলতে সেই ধরনের পরিবারকেই বুঝিয়েছেন যার বংশানুক্রমিক গভীরতা একক পরিবারের থেকে বেশি এবং যার সদস্যরা সম্পত্তি, আয়, অধিকার এবং দায়দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ডঃ ইরাবতী কার্ভে মনে করেন যে, ভারতীয় যৌথ পরিবার বলতে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের এমন এক গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় যারা একই ছাদের নীচে বসবাস করে, একই হাড়ির অন্ন খায়, যৌথভাবে পারিবারিক সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে, পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একসাথে অংশ নেয় এবং যাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক বর্তমান।

কৃষিনির্ভর গ্রাম সমাজের স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা ছিল যৌথ পরিবারের অনুকূল। এই পরিবারগুলি সাধারণভাবে এক-একটি স্বনির্ভর আর্থিক সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মূলত কৃষি এবং হস্তশিল্পকে ভিত্তি করেই অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়। পুরো পরিবার একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক একক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ও'ম্যালির মতে সেই সময় একটি তিন বা ততধিক প্রজন্ম সংযুক্ত বৃহৎ পরিবারের পক্ষে একক স্থানে বসবাস করার কোনো অসুবিধা ছিল না। পরিবারের যারা উপার্জনে সক্ষম তারা সকলেই বংশানুক্রমিকভাবে একই জীবিকা গ্রহণ করত। পি. এন. প্রভু মনে করেন যে বাসগৃহের স্বত্বাধিকার থাকে পিতৃপুরুষদের মধ্যে। যৌথ পরিবার সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক এবং পিতৃবাসস্থানিক হয়। ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক সনাতন সমাজে যৌথ পরিবারগুলি কতকগুলি বদ্ধমূল ধর্মীয় বিশ্বাস, পিতৃ-কর্তৃকের অনুশাসন, জাতপাতের বাধানিষেদ এবং গোষ্ঠীগত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালিত হত। যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ অবরুদ্ধ ছিল।

৭০.৪.২ পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন

সময়ের সাথে সাথে সনাতনী কৃষিভিত্তিক যৌথ পরিবার কাঠামো এবং কার্যাবলীর পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের পিছনে মুখ্য কারণ হল কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার শিল্পভিত্তিক এবং নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় রূপান্তর। শিল্পায়নের ফলে যৌথ পরিবারগুলির পক্ষে নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজে পরিবার উৎপাদনের একক হিসাবে ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। জীবনধারণের প্রয়োজনে গ্রাম থেকে শহরে পরিযান (migration) বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলস্বরূপ, সনাতন কৃষিভিত্তিক পরিবার কাঠামোতে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে।

আধুনিক সমাজব্যবস্থায় যৌথ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় একক পরিবারের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আয়ের উৎস এক হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃহৎ পারিবারিক গোষ্ঠীভুক্ত ছোট পরিবারগুলি নিজেদের আলাদা গার্হস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করে। পোশাক-পরিচ্ছদ, আমোদ-প্রমোদ, লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয়ে তাদের পৃথক ব্যয় করতে দেখা যায়। ক্রমশই তারা পৃথগন্ন হয়ে যায়।

অধ্যাপক এ. আর দেশাইয়ের অভিমত অনুসারে পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক অবধি ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক গবেষণায় এটাই প্রমাণিত হয় যে পুরনো ধরনের যৌথ পরিবার বিরল। এর প্রকৃতিতে পরিবর্তন হয়েছে। এ. এম. শাহ্ ১৯৫৫-৫৮ সালে গুজরাটের রাধাভঞ্জে তাঁর নিজের সমীক্ষার ভিত্তিতে পরিবারকে 'সরল' এবং 'জটিল' এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। সাধারণ অর্থে, সরল পরিবার বলতে একক পরিবার এবং জটিল পরিবার বলতে যৌথ পরিবারকে বোঝায়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে ৬৮ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার সরল এবং ৩২ শতাংশ জটিল। অধ্যাপক শাহ্-র প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে গ্রামীণ এলাকাতেও যৌথ পরিবারের থেকে একক পরিবারের সংখ্যা বেশি। কাপাডিয়া গুজরাটের সুরাটে গ্রাম এবং শহর-দুই জায়গায় সমীক্ষা করেন। গ্রামীণ অঞ্চলের সমীক্ষায় দেখা যায় ৪৯.৭ শতাংশ যৌথ পরিবার এবং ৫০.৩ শতাংশ যৌথ এবং ৪৩.৫ শতাংশ একক পরিবার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কাপাডিয়ার সমীক্ষালব্ধ ফল—শহরীকরণ যৌথ পরিবারের ভাঙনের কারণ—এই সাধারণ ধারণার বিরোধী।

এস. এস. গোরে তাঁর সমীক্ষায় দিল্লী এবং হরিয়ানার শহর এবং গ্রামে মূলত দুই ধরনের পরিবারের সংখ্যাধিক্য দেখেছেন—স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁদের অবিবাহিত সন্তানদের পরিবার (৩৮.৬ শতাংশ) এবং স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁদের বিবাহিত ও অবিবাহিত সন্তানদের পরিবার (৩৪.৩ শতাংশ)। অধ্যাপক রাম আহুজা রাজস্থানের শহরে (১৯৭৬ সালে) এবং গ্রামে (১৯৮৮ সালে) দুটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও যৌথ পরিবার একেবারে লোপ পায়নি। কাপাডিয়া এবং আই. পি. দেশাইয়ের মতে, শহরে দীর্ঘসময় বসবাস করলেই যৌথ পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। নব-বাসস্থানিক (Neo-local) পরিবারের সংখ্যা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেলেও ভারতীয় সংস্কৃতির পারম্পর্য রক্ষা করে একক পরিবার তার মূল পরিবারের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখে। সবসময়ই যে তা শুধু দায়িত্ববোধ থেকে করে তা নয়, 'আমরা-বোধ' (we-feeling) এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে এবং তার ফলে যৌথ পারিবারিক মানসিকতা অনেকাংশে বজায় থাকে।

আমাদের দেশে পরিবারের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আধুনিক ভারতে পারিবারিক সংগঠনের পরিবর্তনের একটি নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে। কিন্তু এই পর্যায়েও যৌথ পরিবার ব্যবস্থা মানুষকে আকর্ষণ করে। এই কারণে ভারতে একক পরিবারগুলির মধ্যে এখনও যৌথ পরিবারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকতে দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলের যৌথ পরিবারের অনেক সদস্য বা দম্পতি জীবন এবং জীবিকার জন্য অন্যত্র বিচ্ছিন্নভাবে বাসবাস করেন, কিন্তু দোল-দুর্গোৎসবে বা বাড়ির পরম্পরাগত উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁরা দেশের বাড়িতে মিলিত হন। এখনও বিবাহ, শ্রাদ্ধবাসর ইত্যাদি জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যৌথ পরিবারের সত্তাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। আবার যৌথ পরিবারের বহু এবং বিভিন্ন ঐতিহ্যগত অনুষ্ঠান থাকে এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠানের আর্থিক দায়দায়িত্ব বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া একক পরিবারে সদস্যরা সকলে মিলেমিশে বহন করে থাকেন। তাই সমাজতত্ত্ববিদ্ ডঃ বেলা দত্তগুপ্তা ভারতের বর্তমান পরিবার ব্যবস্থায় যৌথ পরিবার এবং একক পরিবারের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক সংগঠনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন।

৭০.৫ জ্ঞাতিত্ব

জ্ঞাতিত্ব (kinship) গ্রামীণ সমাজে একটি উল্লেখযোগ্য একক হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। জ্ঞাতিত্ব এমন এক সম্পর্ক যা রক্তের বন্ধন এবং বৈবাহিক বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ। সগোত্রীয় (kindred) ব্যক্তিবর্গও জ্ঞাতিত্বের আওতাভুক্ত হয়। রক্তের বন্ধনই হল মূল তন্তু যা বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততিই নয়, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ পুরুষ ও নারীর পরিবারকেও জ্ঞাতিত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। রক্তের সূত্রে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকেই 'রক্ত-সম্পর্কের জ্ঞাতিত্ব' (consanguineous kinship) অথবা 'রক্ত-বন্ধনজনিত জ্ঞাতিত্ব' বলে। যেমন—পিতা-মাতা এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক, একই পিতা-মাতার সন্তানদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি। সুতরাং, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, কাকা, জ্যেঠা প্রভৃতিরা হল রক্ত-সম্পর্কের জ্ঞাতি (consanguineous kin)।

বিবাহের কারণে আরেক ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যখন কোনো একটি ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তখন বিবাহিত ছেলেটি যে শুধু বিবাহিতা মেয়েটির সম্পর্ক স্থাপন করে, তা কিন্তু নয়। এই বিবাহের ফলে উভয়ের পরিবারের সদস্যরাও পারস্পরিক সম্পর্কজালে জড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের সম্পর্ককেই বলা হয় 'বিবাহ সম্বন্ধীয় জ্ঞাতিত্ব' (affinal kinship)। এভাবেই একজন পুরুষ বিবাহসূত্রে স্বামী, জামাইবাবু, জামাতা (son-in-law), এমনকি পিসেমশাই বা মেসোমশাইও হতে পারে। সদ্য বিবাহিত কন্যাটির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে।

জ্ঞাতিত্ব সাধারণত সগোত্র (agnate), সমোদ্ভব (cognate) এবং বন্ধুদ্‌ভব (bandhus) হতে পারে। সগোত্র বলতে সপিণ্ড, সকুল্য এবং গোত্রীয় বোঝায়। একই পূর্বপুরুষদের বংশধররূপে উদ্ভূত হলেই সগোত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। প্রায়শই মাথার দিক দিয়ে যারা জ্ঞাতি, তাদেরকেই সমোদ্ভব বলা চলে, আর বন্ধুদ্‌ভব বলতে পিতৃবন্ধু, মাতৃবন্ধু, আত্মবন্ধু ইত্যাদিকে বোঝানো হয়।

গ্রামীণ সমাজে এই বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও, গ্রামীণ সমাজ কিছু জ্ঞাতিত্ব বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিধিগুলি সমস্ত সমাজেই বর্তমান। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—আড়াল (avoidance), বক্রোক্তি (teknonymy), মাতুল-বিধি (avancular), সৌহার্দ্য-বিধি (amiate), অথর্ব-বিধি (couvade) এবং রঙ্গরসের সম্পর্ক-বিধি (joking relation)।

জ্ঞাতিত্বের পর্যায়ভুক্ত কিছু সদস্যের মধ্যে পরস্পরকে আড়াল করার কথা প্রচলিত আছে। শ্বশুর এবং পুত্রবধূর মধ্যে কোনোপ্রকার ঘনিষ্ঠতা স্থাপন না করা আড়াল-বিধি (avoidance) বলে গণ্য হয়। শ্বশুর যে শুধুমাত্র পুত্রবধূর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে না, তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত নিষিদ্ধ। আবার শ্বশুড়ি এবং জামাতার ক্ষেত্রেও এরূপ আড়াল-বিধি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। উত্তর ভারতের গ্রামীণ সমাজে হিন্দু গৃহবধূদের মধ্যে এই কারণে পর্দা প্রথা প্রচলিত আছে।

জ্ঞাতিত্বের ক্ষেত্রে প্রচলিত আরেকটি বিধি হল বক্রোক্তি (telnonymy) যার অর্থ হল কোনো একজন সদস্য অপর কোনো সদস্যকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করে না বা অপরের কাছে তার নাম উচ্চারণ করে না, কতকটা বক্রভাবে পরিচিতি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। হিন্দু পরিবারে স্ত্রী কখনোই স্বামীর নাম উল্লেখ করে না। নিজের পুত্র বা কন্যার পিতা হিসাবে স্বামীর কথা উল্লেখ করে থাকে।

গ্রামীণ সমাজে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে মাতুলবিধি (avancular) লক্ষ্য করা যায় যায় মাধ্যমে মাতুলকে (মা-এর ভাই) বোনের সন্তানদের ওপর বিশেষ কর্তৃত্বের অধিকার এবং তাদের প্রতি কিছু দায়দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভাগিনেয় এবং মামার সম্পর্কে অধিকার এবং কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সৌদার্য্য-বিধির (amiate) অর্থ হল পিতার ভগিনী অর্থাৎ মায়ের তুলনায় অধিকতর সম্মান প্রদান করা। এই বিধি অনুসারে পিসিকে বিশেষ ভূমিকা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঘাসি এবং টোডা আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামীণ সমাজে অথর্ব (couvade) প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায় স্ত্রী সন্তানের জন্ম দিলে স্বামীকেও পিতা হিসাবে প্রসূতি মায়ের মতোই অসুস্থতার ভান করতে হয়। প্রসূতি যেভাবে থাকে, যেভাবে আচরণ করে এবং যেসব পথ্যগ্রহণ করে পিতাকেও ঠিক সেই পন্থাই অনুসরণ করতে হয়। এ সময়ে পিতা কোনো বাইরের কাজকর্ম করে না। প্রসূতি যেসব নিষেধ বিধি (taboos) পালন করে তাঁর স্বামীকেও তার পালন করতে হয়।

বিভিন্ন গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মান অনুযায়ী দেওর এবং বৌদি অথবা শ্যালিকা ও জামাতার মধ্যে রঙ্গরসের সম্পর্ক বিধি (joking relation) লক্ষ্য করা যায়।

বিবাহ, পরিবার, জ্ঞাতিত্ব পরস্পর পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবদ্ধ। ডেভিড ম্যান্ডেলবাম্ তাঁর 'Society in India' (1972) গ্রন্থে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ কাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতে বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতিত্বকে কেন্দ্র করে দুটি ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতের পরিবারগুলি নিজ সদস্যদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জ্ঞাতিত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার ওপর জোর দেয়। কিন্তু উত্তর ভারতের পরিবারগুলি নিজ সদস্যভুক্ত নয় এমন বাইরের পরিবারে ব্যক্তিদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। উত্তর ভারতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তিই নিয়ে গোত্রভুক্ত এবং নিজ গ্রামের মধ্যে অন্য কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে এই ধরনের কোনো বিধিনিষেধ দেখা যায় না। সুতরাং, উত্তর ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে বিবাহকে কেন্দ্র করে একটি কেন্দ্রাতিগ প্রবণতা (centripetal tendency) লক্ষ্য করা যায়, কারণ এখানে বৈবাহিক সম্পর্ক নিজ গোষ্ঠীর বাইরে স্থাপিত হচ্ছে। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে বিবাহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রতিগ প্রবণতা (centripetal tendency) পরিলক্ষিত হয় কারণ এখানে বিবাহ নিজ গোষ্ঠীর আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই ঘটে থাকে।

৭০.৬ জাতিগোষ্ঠী

আমরা এতক্ষণ পরিবার এবং জ্ঞাতিত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম। এই অংশে গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ একক হিসাবে জাতি (caste) এবং উপজাতি (sub-caste) নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৭০.৬.১ জাতি

গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হল জাতি। জাতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'caste'। ইংরেজি 'caste' শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ শব্দ 'caste' থেকে। 'caste' শব্দটির অর্থ হল জাতি, কুল ইত্যাদি। তবে পোর্তুগিজরাই ভারতবর্ষের জনগোষ্ঠী প্রসঙ্গে 'জাতি' শব্দটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন।

জাতি জন্মভিত্তিক এবং এই কারণেই অপরিবর্তনীয়। ডি. এন. মজুমদার এবং টি. এন. মদন-এর মতানুযায়ী, জালি হল একটি বদ্ধ গোষ্ঠী, একটি বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী। পি. এইচ. কুলীর মতে, জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা উৎপত্তি সূত্রে অভিন্ন এবং সমজাতীয়। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা চিরাচরিত এবং অভিন্ন বৃত্তির অনুযায়ী হয়ে থাকে। সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের কতকগুলি বিশেষ বিধিনিষেধ বা আচার-বিচার মান্য করে চলতে হয়। এম. এন. শ্রীনিবাস-এর বক্তব্য হল, জাতিপ্রথা নিঃসন্দেহে এক বিশেষ সর্বভারতীয় ব্যবস্থা এই অর্থে যে এর মধ্যে সকলেরই স্থান জন্মসূত্রে নির্ধারিত।

বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিপ্রথার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল—

(ক) জাতিব্যবস্থা জন্মভিত্তিক, জাতির সদস্যপদ জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয়। তাকে আজীবন সেই জাতির পরিচয়ই বহন করতে হয়। গুণগত যোগ্যতার নিরিখে জাতি পরিবর্তন করা যায় না।

(খ) অধ্যাপক এস. পি. দূবের মতে, অন্তর্বিবাহ মেনে চলে এমন জনগোষ্ঠীই জাতি। প্রত্যেক জাতিভুক্ত পাত্র-পাত্রীকে সেই জাতির মধ্যেই বিবাহ করতে হয়। অন্য কোনো জাতির সাথে বৈবাহির সম্পর্ককে লোকনীতি বিরুদ্ধ মনে করা হয়।

(গ) প্রত্যেক জাতিরই একটি পেশা বা বৃত্তি থাকে। জাতির অনুসারেক জাতিভুক্ত সকলকেই সেই জাতির পেশাই গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত এক জাতির পেশায় অন্য জাতিভুক্তরা নিযুক্ত হতে পারে না।

(ঘ) সামাজিক স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল ভারতবর্ষের জাতিব্যবস্থা। অধ্যাপক দূবের মতে, জাতিগুলি সামাজিক পদমর্যাদার দিক থেকে উঁচু-নীচু অবস্থানের তারতম্যের সাথে জাতিগত পেশার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সাধারণ নিয়মানুযায়ী 'শুদ্ধ' এবং 'মহৎ' পেশার সাথে যুক্ত জাতি সমাজে উঁচু মর্যাদার আসন লাভ করবে এবং 'অশুচি' ও 'কলুষিত' পেশার জাতি সামাজিক স্তরবিন্যাস নীচের দিকে থাকবে।

(ঙ) সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক জি. এস. ঘুরের মতে বৃহত্তর সমাজের অংশ হয়েও ক্ষুদ্র জাতিগুলি তাদের নিজস্ব সামাজিক জগতের মধ্যে অনেকটাই সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি জাতির জীবনধারাগত স্বতন্ত্রতা বর্তমান।

(চ) জাতিপ্রথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলা। জাতিগুলির আত্মসম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, কোনো জাতি কতটা 'শুদ্ধ' বা 'অশুদ্ধ' তার ওপর জাতিগুলির মধ্যে সামাজিক আদানপ্রদানের বিষয়টা নির্ভর করে। তাঁর মতে, যে জাতির অবস্থান সমাজে যত উঁচুতে, 'শুদ্ধতা' বজায় রাখার লক্ষ্যে তাদের আচার-সংস্কার তত জটিল।

(ছ) জাতিপ্রথায় সামাজিক সচলতার অভাব দেখা যায়। এই প্রথা স্থিতিশীল হওয়ার কারণ হিসাবে অনেকে সনাতন ভারতীয় সমাজে ধ্যানধারণার প্রভাবের কথা বলেছেন। অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে কর্মের ধারণা একজন হিন্দুকে এই শিক্ষাই দেয় যে সে একটি বিশেষ জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছে কেননা ঐ জাতিতে জন্মগ্রহণের মতোই তার যোগ্যতা ছিল এবং তার কৃতকর্মের ফলস্বরূপই সে তা অর্জন করেছে।

কোনো বিশেষ জাতিভুক্ত ব্যক্তি যদি তার জাতিনির্দিষ্ট পেশা পরিবর্তন করতে চায় তবে সে অন্য জাতি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, নিজ জাতির সদস্যরাও তাকে বাধা দেয়।

৭০.৬.২ উপজাতি

উপজাতি (sub-caste) বলতে জাতির একটি ক্ষুদ্রতম একককে বোঝানো হয়। কোনো কোনো গ্রামে জাতির প্রতিভূ হিসাবে উপজাতিকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। কোনো একটি বৃহৎ অঞ্চলে একসঙ্গে অনেকগুলি উপজাতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসাবে, মহারাষ্ট্রে কুমোর (potters) জাতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই জাতির মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বর্তমান। যেমন—কোনো গোষ্ঠী উপযুক্ত মাটি তৈরি করছে (tap the clay), মাটির কাজে কোন গোষ্ঠী ছোট চাকার ব্যবহার করছে, আবার কোনো গোষ্ঠী বড় চাকার ব্যবহার করছে ইত্যাদি। কিন্তু এই তিনটি গোষ্ঠী একই জাতিভুক্ত। জি. এস. ঘুরিয়ে এদের উপজাতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আবার ডঃ ইরাবতী কার্ভে এদের জাতি হিসাবে অভিহিত করাই পক্ষপাতী, ঘুরিয়ের অভিমত হল যেহেতু একই জাতিভুক্ত কুমোরদের তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে, তাই এদের উপজাতি বলা হয়। কিন্তু ডঃ কার্ভে তা মনে করেন না।

উপজাতিগুলি গ্রামীণ সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপজাতি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সনাতন গ্রামীণ সমাজে নিজ জাতিগোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করত। তবে আধুনিক-সমাজব্যবস্থায় জাতিব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। পরবর্তী অংশে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

৭০.৬.৩ জাতিব্যবস্থায় পরিবর্তন

রোমিলা থাপার, বার্টন স্টেইন, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এ. আর. দেশাই, এম. এন. শ্রীনিবাস প্রমুখ ঐতিহাসিক এবং সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁদের নিজ নিজ আলোচনার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। সামাজিক সচলতার (social mobility) গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে হিসাবে সংস্কৃতায়ণ (sanskritization), পরিযান (migration), ধর্মান্তরণ (religious conversion) প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

হিন্দু বা আদিবাসী এবং অন্যান্য গোষ্ঠী নিজ নিজ আদর্শ, আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবনধারার পরিবর্তন করে সংস্কৃতায়ণের মাধ্যমে উঁচু জাতির সমকক্ষ হতে সচেষ্ট হয়। এই সংস্কৃতায়ণ তত্ত্বের প্রবর্তক হলেন এম. এন. শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাসের সংস্কৃতায়ণ তত্ত্ব সম্পর্কে পরবর্তী এককে (গ্রামীণ অর্থনীতি : জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক স্বরূপ) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আধুনিক সমাজে শিল্পায়ন (industrialisation), নগরায়ণ (urbanisation), আধুনিক শিক্ষা এবং আইন ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার (land reform), বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী (development programmes) সংরক্ষণ নতি (reservation policy) ইত্যাদির প্রভাবে গ্রামীণ সমাজে জাতিব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে।

সনাতন গ্রামীণ সমাজে যে জাতিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্তমান ছিল, তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এখনও গ্রামাঞ্চলে জমির অধিকারভোগী আধিপত্যকারী জাতি (dominant castes) সামাজিক স্তরবিন্যাসে উঁচু জাতিভুক্ত। অন্যদিকে, নীচু জাতির মানুষদের জমি ভোগদখলের অধিকার নেই এবং তারা মজুরির বিনিময়ে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী এককে (গ্রামীণ অর্থনীতি : জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক স্বরূপ) পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

অসবর্ণ বিবাহ (Inter-caste marriage) গ্রামীণ সমাজে এখন দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে। জাতিব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে 'শুদ্ধ' (pure) এবং 'অশুদ্ধ' (impure)-এর ধারণার প্রাবল্য আগের থেকে কমলেও এখনও বর্তমান। অস্পৃশ্যতার (untouchability) প্রভাব এখন অনেকটাই ক্ষয়িষ্ণু। প্রাচীন ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে যারা উঁচু জাতিভুক্ত (upper castes) ছিল, তারা উঁচু শ্রেণিভুক্তও (upper class) ছিল। কিন্তু এখন এটি নিশ্চিতভাবে কখনোই বলা যায় না যে উঁচু জাতিভুক্ত ব্যক্তিই উঁচু শ্রেণিভুক্ত হবে। কারণ বর্তমানে পেশাগত নানা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম থেকে শহরে যাচ্ছে এবং অর্থোপার্জন করে নিজ গ্রামেই প্রত্যাবর্তন করেছে। ফলে তথাকথিত নীচু জাতিভুক্ত ব্যক্তিরাও আর্থিক বলে বলীয়ান হয়ে উঁচু শ্রেণিভুক্ত হচ্ছে এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় রাজনীতির (representative parliamentary politics) উদ্ভবের ফলে জাতিব্যবস্থা এখন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে। এই অভিমত পোষণ করেন এম. এন. শ্রীনিবাস, রুডলফ্ এবং রুডলফ্, পল ব্রাশ প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীগণ। নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য জাতিগুলির মধ্যে একটি সংঘ (association) গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমর্থনে জাতিকেন্দ্রিক দলাদলিও (factions) গ্রামীণ সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর (rural power structure) যে পরিবর্তন এসেছে তা জাতিব্যবস্থাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছে। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্যগত আধিপত্য (traditional dominance) অনেকটাই খর্ব হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে কাম্মা (Kamma) এবং রেড্ডি (Reddi), কর্ণাটকে লিঙ্গায়েত (Lingayat) এবং ওককালিগা (Okkaliga) এবং উত্তর ভারতে আহির (Ahir), কুর্মী (Kurmi) ইত্যাদি জাতিগুলি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক ক্ষেত্রে নতুন আধিপত্যকারী জাতিতে (new dominant castes) পরিণত হয়েছে। এমনকি তামিলনাড়ুতে নাদার (Nadar) এবং মহারাষ্ট্রে মাহার (Mahar)-এর মতো ঐতিহ্যগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির সামাজিক মর্যাদাও আগের থেকে উন্নত হয়েছে।

সুতরাং এই অংশের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক সমাজে জাতিব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও গ্রামাঞ্চলে এখনও বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জাতিব্যবস্থার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তবুও কয়েকটি অঞ্চলে মধ্যম এবং নীচু জাতিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে তাদের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। উঁচু জাতিভুক্ত ব্যক্তিমাত্রই উঁচু শ্রেণিভুক্ত হবে এবং বেশি ক্ষমতা ভোগ করবে—এই সাধারণ ধারণা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

৭০.৭ ভূমিসম্বন্ধীয় শ্রেণি কাঠামো

গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হিসাবে শ্রেণি (class) বিবেচিত হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্ববিদ্ কে. এল. শর্মার মতে গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনায় জাতি (caste) এবং শ্রেণি (class)—অতি প্রাসঙ্গিক। জাতি এবং শ্রেণি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

বাস্তবিক অর্থে, সামাজিক শ্রেণির (social class) উদ্ভব হয় ব্রিটিশ আমলে। ব্রিটিশদের সৃষ্ট ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা (land revenue system) মূলত তিনটি প্রধান সামাজিক শ্রেণির জন্ম দেয়, সেগুলি হল—(১) জমিদার শ্রেণি (Zamindars), (২) জমিদার এবং অনুপস্থিত ভূস্বামীদের অধীনে প্রজাগণ (Tenants) এবং (৩) কৃষিমজুর শ্রেণি (Agricultural labourer class)।

জমিদার সম্প্রদায় ছিল ব্রিটিশ আমলে প্রকৃত অর্থেই জমির মালিক। প্রাক্-ব্রিটিশ আমলেও জমিদার থাকলেও তাদের কাজ খাজনা আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃত অর্থে জমির মালিক তারা ছিল না। ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার তাগিদেই ব্রিটিশ জমিদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। জমিদাররা কৃষি অর্থনীতিতে কোনোরকম উৎপাদনশীল ভূমিকা পালন করেনি, আর্থসামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই তাদের কাম্য ছিল। এরা সমাজে উঁচু জাতিভুক্ত ছিল।

জমিদারি ব্যবস্থা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে প্রজাশ্রেণির (Tenant class) সৃষ্টি হল। জামিদারি এলাকার প্রজা ছাড়াও রায়তওয়ারী এলাকাতেও এক নতুন ধরনের প্রজাশ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল। জমি ইজারা দেওয়ার অধিকারের স্বীকৃতির ফলেই প্রজাশ্রেণির উদ্ভব হয়। নির্বিচারে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হত। খাজনার বোঝায় ভারগ্রস্ত প্রজাদের জীবন ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠতে থাকে। এছাড়াও অন্যান্য নানাধরনের শোষণে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়তে থাকে। উত্তরোত্তর তাদের দারিদ্র্য এবং ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি পায়।

ব্রিটিশ আমলে ভূ-সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা, মজুর ভাড়া এবং নিযুক্ত করার অধিকার জমির মালিককে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে একদিকে অনুপস্থিত ভূস্বামী শ্রেণির (absence landlord class) সৃষ্টি হয়, আবার অন্যদিকে কৃষিমজুর শ্রেণির Agricultural labourer class সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে মধ্য এবং নিম্ন পর্যায়ের স্বত্ববান কৃষকের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। কৃষিজমি মহাজন

এবং ব্যবসায়ী শ্রেণির কুক্ষিগত হতে থাকে। অধিকাংশ স্বত্ববান কৃষক কৃষিমজুরে পরিণত হয়। মহাজন শ্রেণির চড়া সুদের হার কৃষিমজুরদের দারিদ্র্য ত্বরান্বিত করে। ফলে দরিদ্র কৃষক মহাজনের কাছে ফসল এবং জমি উভয়ই দ্রুত হারাতে শুরু করে। জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদের এই প্রক্রিয়া সর্বহারা খেতমজুর শ্রেণির বিস্তার ঘটায়।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ভূমিসংস্কার (Land reform) এবং গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি (Rural development) গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। ভূমিসংস্কারের ফলে প্রচুর সংখ্যায় ক্ষুদ্র প্রজাদের (smaller tanants) আইন বলে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু মধ্য পর্যায়ভুক্ত কৃষকরা ভূমিসংস্কারের ফলে বিশেষভাবে লাভবান হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের আহির (Ahir) এবং কুর্মী (Kurmi) জাতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্বে যে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলি জমির ভোগদখল উপভোগ করত তাদের ভোগদখলের ক্ষমতা এমন কমতে শুরু করে। তাছাড়াও ৬০-এর দশকে সবুজ বিপ্লবের (Green Revolution) সূচনায় উঁচু এবং মধ্যম জাতিভুক্ত চাষিরা সম্পদশালী হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু ভূমিসংস্কার, সবুজ বিপ্লব এবং অন্যান্য গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রামীণ সমাজে দরিদ্র ক্ষুদ্র কৃষক এবং কৃষিমজুর শ্রেণির অবস্থান তেমন কোনো উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। এই সমস্ত দরিদ্র কৃষক এবং কৃষিমজুর শ্রেণি দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে শেষে ধীরে ধীরে সর্বহারা শ্রেণিতে (Proletariat class) পরিণত হয়।

পি. সি. যোশী মনে করেন যে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজে ভূমিসম্বন্ধীয় শ্রেণি কাঠামোয় (Agrarian class structure) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক এবং প্রথাগত (customary) প্রজাস্বত্ব (tenancy) ব্যবস্থার অবক্ষয় ঘটতে শুরু করে। এর পরিবর্তে অধিক শোষণমূলক এবং নিরাপত্তাহীন ইজারা অথবা পাট্টা (lease) ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে এক নতুন ধনী কৃষক (rich peasant) শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে যারা ব্যবসায়িক (commercial) মানসিকতাসম্পন্ন ছিল। এই নতুন শ্রেণি একদিকে যেমন আংশিকভাবে জমির ভোগদখলের অধিকার ভোগ করত, আবার অন্যদিক থেকে তারা প্রজাও ছিল। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃষিকার্য পরিচালনার মতো প্রয়োজনীয় সংগতি (resource) এবং উদ্যোগ (enterprise) ধনী কৃষকদের ছিল। ধনী কৃষকরা কৃষিব্যবস্থাকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে শুরু করেছিল।

কে. এল. শর্মা ভারতীয় গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় ভূমিসম্বন্ধীয় শ্রেণি কাঠামোকে কেন্দ্র করে মূলত দুই ধরনের সামাজিক সচলতার (social mobility) ধারা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি রাজস্থানের ছয়টি গ্রামের ওপর সমীক্ষা করে দেখান যে, কোনো কোনো গ্রামে কৃষিমজুর শ্রেণির সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন ভূস্বামীরাও তাদের চিরাচরিত শ্রেণিগত মর্যাদা হারিয়ে সর্বহারা (Proletariat) শ্রেণিভুক্ত হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে নতুন ধনী কৃষক সম্প্রদায় আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে ঐ সমস্ত ভূস্বামীদের পরিবর্তে গ্রামীণ সমাজে নতুন পুঁজিপতি শ্রেণি (New capotalist class) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'Dynamics of Rural Society' নামক গ্রন্থে ভূমিসম্বন্ধীয় শ্রেণি কাঠামোয় পরিবর্তন প্রসঙ্গে আলোচনায় মন্তব্য করেছেন যে, গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতাশালী শ্রেণিগুলি পূর্বের শ্রেণিগত মর্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং ক্ষুদ্র চাষিরা (small cultivators) ও ভূমিহীন মজুরে পরিণত হয়। কটোভস্কি গ্রামীণ সমাজে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, কৃষিকাজে পুঁজির বিনিয়োগ যতই বাড়তে আরম্ভ করে, ততই সাধারণ কৃষকদের অসহায়তা, দারিদ্র্য, দুঃখ-দুর্দশা বাড়তে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে গ্রামীণ সমাজে ভূমিসম্বন্ধীয় শ্রেণি কাঠামোয় দুই ধরনের সামাজিক সচলতা প্রত্যক্ষগোচর হয়। একদিকে যেমন মধ্যবর্তী কৃষক শ্রেণি (intermediate class peasantry) ঊর্ধ্বাভিমুখী সামাজিক সচলতার (upward social mobility) মধ্যে দিয়ে নতুন ভূস্বামী শ্রেণিভুক্ত হয়, অন্যদিকে তেমনই ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক (small and marginal peasants) ও কতিপয় প্রাক্তন ভূস্বামী নিম্নাভিমুখী সামাজিক সচলতার (downward social mobility) মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষিমজুরে পরিণত হয়।

৭০.৮ গ্রাম

আলোচনার অন্তিম লগ্নে আমরা গ্রামীণ সমাজ কাঠামো হিসাবে গ্রামের বিচার-বিশ্লেষণ করব। এই অংশে গ্রামের প্রকৃতি এবং গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর (village power structure) গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হবে।

৭০.৮.১ গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত বিতর্ক

হেনরী মেইন, চার্লস মেটকাফ্ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ভারতবর্ষের গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতার তত্ত্বকে বিশেষভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য বিষয় ছিল এই যে, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতবর্ষের গ্রামগুলি ছিল 'আবদ্ধ' (closed) এবং পরস্পর পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন (isolated)। ভারতের এক দক্ষ ব্রিটিশ প্রশাসক হিসাবে চার্লস মেটকাফ্ গ্রামকে একটি অপরিবর্তনীয় সত্তা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন যে, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতবর্ষের গ্রামগুলি ছিল একদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ (self-sufficient)। গ্রামগুলি তাদের নিজস্ব চাহিদা এবং প্রয়োজনগুলি নিজ নিজ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই পূরণ করত। প্রয়োজনে পূরণের জন্য একটি গ্রামকে অন্য গ্রামের ওপর নির্ভর করতে হত না। অর্থাৎ গ্রামগুলির মধ্যে পরিবর্তনশীলতার ব্যাপারটাই অনুপস্থিত ছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণতার আলোচনা প্রসঙ্গে অতি প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ে যজমানি ব্যবস্থার (Jajmani system) কথা। যজমানি ব্যবস্থা বলতে কোনো একটি গ্রামে বসবাসকারী জাতি এবং পরিবারের সদস্য হিসাবে বংশপরম্পরায় ব্যক্তির বৃত্তিগত বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থাকেই বোঝানো হয়। যজমানি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই কোনো একটি ভৌগোলিক পরিমণ্ডল অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করে। ফলে গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা বজায় থাকে। গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং যজমানি ব্যবস্থা নিয়ে পরবর্তী এককে (গ্রামীণ অর্থনীতি : জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক স্বরূপ) বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আধুনিককালের ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ (Anthropologists) এবং সমাজতত্ত্ববিদরা গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতার তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মত অনুযায়ী, ভারতবর্ষের গ্রামগুলি কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। বাইরের জগতের সাথে ছিল এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অভিবাসন (migration), ব্যবসা-বাণিজ্য, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে একটি গ্রাম তার প্রতিবেশী গ্রাম এবং সর্বোপরি বৃহত্তর সমাজের সাথে বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিল। আধুনিক আমলে আধুনিকীকরণ (Modernisation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামগুলির মধ্যে যেমন আন্তঃসম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে, তেমনই গ্রাম এবং শহরের মধ্যে যোগাযোগসূত্র নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে উঠছে।

বহির্জগতের সাথে সংযোগসূত্র বৃদ্ধি পেলেও গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় গ্রাম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক একক। গ্রামকে কেন্দ্র করেই ঐ গ্রামে বসবাসকারী মানুষের সাধারণ পরিচিতি (common identity) গড়ে ওঠে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে পরিবারগত,

জাতিগত এবং শ্রেণিগত পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই সম্পর্ক যেমন সহযোগিতার (co-ooeration) তেমনই আধিপত্য (dominance) এবং প্রতিযোগিতার (competition) ও হতে পারে।

৭০.৮.২ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো এবং নেতৃত্বের পরিবর্তন

স্বাধীনতার পূর্বে গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা (power)-কে কেন্দ্র করে উঁচু জাতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হত। তারা নানাভাবে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করত। তারা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভূমিসংস্কার (Land reforms), পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা (Panchayati raj system) সংসদীয় রাজনীতি (Parliamentary politics), উন্নয়নমূলক কর্মসূচি (Development programmes) এবং ভূমিসম্বন্ধীয় আন্দোলন (Agrarian movements)-এর প্রভাবে গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের (leadersship) কিছু পরিবর্তন ঘটে। গ্রামীণ পরিবেশে কর্মসংস্থামূলক বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হওয়ার অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাশালী শ্রেণিও ক্ষমতালাভের জন্য উচ্চাকাঙক্ষী হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি না ঘটায় ক্ষমতালাভের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সনাতন গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোরও খুব একটা আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন ঘটেনি। বি. এস. কন্ ভারতবর্ষের বারোটি গ্রামের একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন যে জমি ভোগদখল (land ownership) এবং গোষ্ঠী আধিপত্যের (group dominance) মধ্যে সামঞ্জস্য বর্তমান। অর্থাৎ জমির ভোগদখলের অধিকার যে সমস্ত গোষ্ঠী উপভোগ করছে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় তাদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। নেতৃত্ব সংক্রান্ত বিষয়েও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পূর্বে সমাজের অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক ব্যক্তিবর্গই নেতৃত্বের একমাত্র দাবিদার ছিলেন। কিন্তু এখন নব্যশিক্ষিত, বয়সে তরুণ ব্যক্তিরাও নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। তবে এটি আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় পরিবর্তনের প্রকৃতি এবং ধারা অঞ্চলভেদে ভিন্ন হতে পারে।

৭০.৯ সারাংশ

'সামাজিক কাঠামো' সম্পর্কে কার্ল ম্যানহেইম, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন, ট্যালকট পারসন্স প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন। তাঁদের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সামাজিক কাঠামো বিষয়ে কোনো একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা লাভ করা সম্ভব নয়।

ভারতীয় গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো নিয়ে আলোচনার শুরুতেই পরিবার-এর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। গ্রামীণ সমাজে যৌথ এবং একক এই দুই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অনেকে আবার যৌথ পরিবারের পরিবর্তে 'বর্ধিত পরিবার' কথাটি ব্যবহার করেন। গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। কিন্তু শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ প্রক্রিয়ার ফলে গ্রামীণ পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে, যৌথ পরিবারের সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলে একক পরিবারের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে। অধ্যাপক এ. আর দেশাই, এ. এম. শাহ্, কাপাডিয়া, এম. এস. গোরের সমীক্ষালব্ধ ফল এই বক্তব্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। তা সত্ত্বেও যৌথ পরিবারের প্রাসঙ্গিকতা এখনও বর্তমান। ভারতবর্ষের একক পরিবারগুলির মধ্যে যৌথ পরিবারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

জ্ঞাতিত্ব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক একক। গ্রামীণ সমাজে 'রক্ত সম্পর্কের জ্ঞাতিত্ব' এবং 'বিবাহ সম্বন্ধীয় জ্ঞাতিত্ব'—এই দুই ধরনের জ্ঞাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়াও জ্ঞাতিত্বকে কেন্দ্র করে আড়াল, বক্রোক্তি, মাতুলবিধি, সৌহার্দ্য-বিধি, অথর্ব-বিধি, রঙ্গরসের সম্পর্ক বিধি সামাজিক আচার-আচরণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ডেভিড ম্যান্ডেলবাম্ তাঁর 'Society in India' (1972) নামক গ্রন্থে উত্তর

ভারত এবং দক্ষিণ ভারতে বিবাহ, জ্ঞাতিত্ব এবং পরিবারকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

জ্ঞাতি গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। জ্ঞাতি জন্মভিত্তিক এবং অপরিবর্তনীয়। অন্তর্বিবাহ ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট বৃত্তি বা পেশা, উঁচু-নীচু স্তরবিন্যাস, সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য, আন্তঃসম্পর্ককেন্দ্রিক সামাজিক বাধানিষেধ, সামাজিক সচলতার অভাব জাতিব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। জাতির একটি ক্ষুদ্রতম একককে বলা হয় উপজাতি। জাতি এবং উপজাতিকে কেন্দ্র করে সমাজতত্ত্ববিদ জি. এস. ঘুরিয়ে এবং ইরাবতী কার্ভে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আধুনিক শিক্ষা এবং আইনব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে জাতি কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে এলেও এখনও বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জাতিব্যবস্থার প্রভাব গ্রামাঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়।

ব্রিটিশ আমলে সর্বপ্রথম জমিদার এবং অনুপস্থিত ভূস্বামীদের অধীনে প্রজাগণ এবং কৃষিমজুর—এই তিনটি প্রধান সামাজিক শ্রেণি আত্মপ্রকাশ করে। জমিদার সম্প্রদায় প্রকৃত অর্থেই জমির মালিক ছিল। অন্যদিকে, প্রজা এবং কৃষিমজু শ্রেণি খাজনা এবং ঋণের বোঝায় ছিল জর্জরিত। জমির ভোগদখলের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষে ভূমিসংস্কারক, সবুজ বিপ্লব এবং অন্যান্য গ্রামীণ উন্নয়মূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলির জমি ভোগদখলের অধিকার অনেকটাই খর্ব হয়েছিল। উঁচু এবং মধ্যম জাতিভুক্ত চাষিদের অবস্থার উন্নয়ন হয়েছিল। কিন্তু সার্বিকভাবে গ্রামীণ সমাজে দরিদ্র ক্ষুদ্র কৃষক এবং কৃষি-মজুর শ্রেণির অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। এই বক্তব্যকে পি. সি. যোশী, কে. এল. শর্মা, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কটোভস্কি প্রমুখরা সমর্থন করেন।

গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোয় 'গ্রাম' একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হিসাবে বিবেচিত হয়। হেনরী, মেন্টন, চার্লস মেটকাফ্ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতবর্ষের গ্রামগুলিকে 'আবদ্ধ', 'বিচ্ছিন্ন' এবং 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক নৃতত্ত্ববিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের অভিমতকে অস্বীকার করেন। এনাদের মতে প্রাচীনকালেও অভিবাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং তীর্থযাত্রাকে কেন্দ্র করে গ্রামগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল। বর্তমান যুগে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে গ্রামগুলির পারস্পরিক বন্ধন আরও নিবিড় হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয়ও পরিবর্তন ঘটেছে। অভিজ্ঞ, বয়স্ক, উঁচু জাতিভুক্ত ব্যক্তিবর্গের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত বয়সে তরুন, শিক্ষিত, নীচু জাতিভুক্ত যুবক সম্প্রদায় নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। তবে নীচু জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশানুরূপ না হওয়ায় সনাতন গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয়ও আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন হয়নি।

৭০.১০ অনুশীলনী

(১) নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান :

	ঠিক	ভুল
(ক) ট্যালকট্ পারসন্সের মতে, কাঠামো হল 'মিথস্ক্রিয়াকারী শক্তিসমূহের জাল'।	☐	☐
(খ) ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতবর্ষে গ্রামের সংখ্যা হল ৩,৯৪৯টি।	☐	☐
(গ) এস. সি. দুবের মতে, ভারতবর্ষকে 'যৌথ পরিবারের দেশ' বলা হয়।	☐	☐
(ঘ) কৃষিভিত্তিক প্রাচীন ভারতীয় সমাজে যৌথ পরিবারগুলি ব্যক্তিত্বের বিকাশের অনুকূল ছিল।	☐	☐

(ঙ) শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ যৌথ পরিবারের পরিবর্তনের জন দায়ী। ☐ ☐

(চ) পিতা-মাতা এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ককে বলা হয় রক্ত-বন্ধনজনিত জ্ঞাতিত্ব। ☐ ☐

(ছ) অথর্ব প্রথার প্রচলন রয়েছে খাসি এবং টোডাদের মধ্যে। ☐ ☐

(জ) জাতিপ্রথায় সামাজিক সচলতা বর্তমান। ☐ ☐

(ঝ) উপজাতি জাতির একটি ক্ষুদ্রতম একক। ☐ ☐

(ঞ) ব্রিটিশ আমলে প্রজাগণ প্রকৃত অর্থেই ছিল জমির মালিক। ☐ ☐

(ট) সবুজ বিপ্লব-এর ফলে দরিদ্র কৃষক এবং কৃষিমজুর শ্রেণির জীবনযাত্রায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছিল। ☐ ☐

(ঠ) গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে সমর্থন করেন চার্লস মেটকাফ। ☐ ☐

(২) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর লিখুন :

(ক) সামাজিক কাঠামো বলতে কী বোঝেন? গ্রামীণ সমাজ কাঠামো হিসাবে পরিবার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(খ) জ্ঞাতিত্ব কাকে বলে? গ্রামীণ সমাজে কী কী ধরনের জ্ঞাতিত্ব লক্ষ্য করা যায় জ্ঞাতিত্ব বিধি কীভাবে সামাজিক আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে?

(গ) গ্রামীণ সামাজিক কাঠামো হিসাবে জাতিগোষ্ঠীর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(ঘ) ভূমিসম্বন্ধীয় শ্রেণি কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করুন। আপনি কী মনে করেন যে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে ভূমিকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষক এবং কৃষিমজুর শ্রেণির অবস্থার উন্নতি ঘটেছে?

(ঙ) গ্রামীণ সমাজ কাঠামো নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

৭০.১১ উত্তরমালা

(১) (ক) ভুল; (খ) ভুল; (গ) ঠিক; (ঘ) ভুল; (ঙ) ঠিক; (চ) ঠিক; (ছ) ঠিক; (জ) ভুল; (ঝ) ঠিক; (ঞ) ভুল; (ট) ভুল; (ঠ) ঠিক।

৭০.১২ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Andre Beteille : *Studies in Agrairan Social Structure*, Oxford University Press, Delhi, 1986.

(২) David G. Mandelbaum : *Society in India*; Popular Prakashan, Bombay. 1996.

(৩) M. N. Srinivas (Ed.) : *India's Villages*; Media Promoters, Bombay, 1978.

(৪) S. C. Dude : *Indian Village*; Cornell University Press, New York, 1995.

(৫) ডঃ অনিরুদ্ধ চৌধুরী : *ভারতের সমাজ প্রসঙ্গে*; চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০।

একক ৭১ ❑ গ্রামীণ অর্থনীতি : জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক স্বরূপ

গঠন

৭১.১ উদ্দেশ্য

৭১.২ প্রস্তাবনা

৭১.৩ গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

৭১.৪ জাতিব্যবস্থার অভ্যুত্থানের পূর্বে গ্রামীণ অর্থনৈতিক পটভূমি

৭১.৫ জাতিব্যবস্থা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি

৭১.৫.১ 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' গ্রাম সমাজ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি

৭১.৫.২ যজমানি ব্যবস্থা

৭১.৫.৩ ব্রিটিশ আমলে জাতিব্যবস্থা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি

৭১.৫.৪ স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি

৭১.৬ জাতিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির সামগ্রিক মূল্যায়ন

৭১.৭ সারাংশ

৭১.৮ অনুশীলনী

৭১.৯ উত্তরমালা

৭১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৭১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবেন :

- গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা;
- জাতিব্যবস্থার উত্থানের পূর্বে গ্রামীণ অর্থনীতির ইতিহাস;
- প্রাক্-ব্রিটিশ, ব্রিটিশ এবং স্বাধীনতা-উত্তর আধুনিক ভারতবর্ষে জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক স্বরূপের চিত্র।

৭১.২ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে গ্রামীণ সমাজ কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসাবে জাতিব্যবস্থা (caste system) নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনা রয়েছে। বর্তমান এককে আমরা জাতিব্যবস্থাকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করব।

জাতিব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর সক্রিয় ভূমিকাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে জাতিব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। কিন্তু শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং আধুনিক অর্থব্যবস্থার প্রভাবে ব্রিটিশ এবং আধুনিক ভারতবর্ষে জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে

পড়তে শুরু করে। তদ্‌সত্ত্বেও বর্তমান গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর জাতিব্যবস্থার প্রভাব অপরিসীম। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে বর্তমান এককে আলোচনা করা হবে।

৭১.৩ গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

সাধারণ অর্থে, অর্থনীতি (Economy) বলতে বিভিন্ন ধরনের পার্থিব বা বস্তুগত দ্রব্য এবং সেবাসামগ্রীর (Material goods and services) উৎপাদন, বণ্টন এবং ভোগ করাকে বোঝানো হয়। বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী বিভিন্ন পদ্ধতি, কাঁচামালের প্রয়োজনীয় সরবরাহ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সর্বোপরি শ্রমের প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপন্ন করা হয়। উৎপাদন ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কে (social relations) আবদ্ধ হয়। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বণ্টিত হয়ে থাকে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের বিভিন্ন পরিষেবা লাভের প্রয়োজনীয় চাহিদা সহজেই পূর্ণ করে থাকে। প্রকৃত অর্থে সমাজ এবং অর্থনীতি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন নিয়ে আসে।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জমি (land) উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। মানুষ (বিশেষত কৃষক) নিজ শ্রম প্রয়োগের মাধ্যমে জমিকে উর্বর (fertile) করে তোলে। সে নানাবিধ প্রযুক্তি এবং শ্রমের সার্থক ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করে থাকে।

গ্রামীণ কুটিরশিল্প (village cottage industries) ও সনাতন গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। কুটিরশিল্প বলতে মূলত গৃহভিত্তিক শিল্প (house-based industry)-কে বোঝানো হয় যার মাধ্যমে কোনো একটি দ্রব্যের সম্পূর্ণ (finished) উৎপাদন সম্ভব হয়।

কোনো সমাজের পার্থিব বা বস্তুগত উন্নয়ন উৎপাদনের স্তর (level of production) এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বণ্টনের পদ্ধতি (mode of distribution)-এর ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। গ্রামীণ অর্থনীতির আলোচনায় জমি এবং অন্যান্য সম্পদের ওপর ভোগদখলের অধিকার, উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি, উৎপাদন সংগঠন (organisation of production) এবং তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক।

৭১.৪ জাতিব্যবস্থার অভ্যুত্থানের পূর্বে গ্রামীণ অর্থনৈতিক পটভূমি

গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জাতিব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আমরা এখন জাতিব্যবস্থার উদ্ভবের আগে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রকৃতি কীরূপ ছিল সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতির ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে সিন্ধু সভ্যতা (খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০০-১৫০০) থেকে শুরু করা প্রয়োজন। যদিও এই সভ্যতা ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা, তবুও কৃষিকাজ ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। রাজস্থানের কালিবঙ্গান অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত তথ্য থেকে দেখা যায় যে এই সভ্যতার মানুষরা লাঙলের সাহায্যে চাষ-আবাদের কৌশল সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিল। সিন্ধু নদ এবং তার বিভিন্ন উপনদী ও শাখানদী অববাহিকায় গম, ধান, মটরশুঁটি, তুলা প্রভৃতি ফসলের চাষ

হত। গ্রামে উৎপাদিত খাদ্যশস্য শহরবাসীদের জন্য সংগ্রহ করা রাখা হত। কুমোর শ্রেণির মানুষরা মাটির বিভিন্ন জিনিসপত্রের এবং ধাতু প্রস্তুতকারকরা তামা এবং ব্রোঞ্জের নানাধরনের জিনিস তৈরি করত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মার মতে, শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী কৃষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের কর (taxes) আদায় করা হত। এই কর বাবদ আদায়ীকৃত সম্পদ হল সিন্ধু সভ্যতার নগরায়ণের (urbanization) মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি।

ঋক্‌বৈদিক যুগের (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-১০০০) সূচনালগ্ন থেকেই কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ফাটল ধরতে শুরু করে। এই যুগে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল পশুপালন ভিত্তিক (pastoral) এবং আধা-যাযাবরকেন্দ্রিক (semi-nomadic)। গবাদি পশুর লালনপালন করাই ছিল এই যুগের মানুষের প্রধান উপজীবিকা। ছাগল, ভেড়া, গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তুদের প্রতিপালন করা হত। গবাদি পশুর অবাধ বিচরণের জন্য গোচারণভূমি ছিল। তবে এই ভূমির অধিকার ছিল সর্বসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন। ঋক্‌বৈদিক যুগের একেবারে অন্তিম লগ্নে মানুষ প্রকৃত অর্থে গ্রামে বসবাস করতে শুরু করল। তারা কৃষিকাজে বলদের ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। এই যুগের বিভিন্ন কারিগরি শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চর্ম শিল্প, পশন বোনা ইত্যাদি। তখনকার দিনে সমাজ ছিল সমতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে কোনো ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাজন (hierarchy) ছিল না।

৭১.৫ জাতিব্যবস্তা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি

পরবর্তী বৈদিক যুগের (খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০-৬০০) আমল থেকেই কৃষি অর্থনীতি (Agricultural Economy) অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে আরম্ভ করেছিল। কৃষিকাজে কাঠের তৈরি লাঙলের ব্যবহার শুরু হয়। বার্লি, গম, ধান, মসুর জাতীয় ডাল প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। সমাজে বৃত্তি বা পেশার ওপর ভিত্তি করে শ্রমদান পদ্ধতির উদ্ভব হল এবং জাতি (caste) ও বর্ণ (varma) অনুসারে সমাজ নতুন করে গঠিত হল।

সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ছিল ব্রাহ্মণেরা। তাদের প্রধান কাজ ছিল যাগযজ্ঞ, পুজার্চনা, প্রার্থনা ইত্যাদি। এদের ঠিক নীচেই ছিল ক্ষত্রিয়রা। তারা দেশ শাসন, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি করত। পরবর্তী স্তরে ছিল বৈশ্য সম্প্রদায়। এদের প্রধান কাজ ছিল কৃষিকাজ। সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল শূদ্র যাদের কাজ ছিল উপরোক্ত তিনটি বর্ণের মানুষদের সেবা প্রদান করা। পরবর্তী বৈদিক যুগে ভাড়াটে শ্রমিক (hired labourer) ব্যবস্থা ছিল না। জমির অধিকার ছিল পরিবারের হাতে, কৃষিকাজ এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন ধরনের কাজ পারিবারিক শ্রমের (family labour) মাধ্যমেই করা হয়। রাজা বা সম্রাট এবং তাঁর অধীনস্থ রাজকর্মচারীরা সাধারণ কৃষকদের কাছ থেকে নানা ধরনের কর আদায় করতেন। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ব্যবহার সেই যুগে না থাকায় সাধারণ মানুষ অর্থের পরিবর্তে অন্য কোনো দ্রব্য বা সম্পদ নিয়ে কর প্রদান করত। কৃষি উৎপাদনের সাথে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সাধারণত কোনো সংযোগ থাকত না। বৌদ্ধ যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৩২২) থেকে কৃষিকাজে লোহার ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। লোহার তৈরি লাঙল, ছুরি, কাঁচি, কাস্তে এবং অন্যান্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। গম, বার্লি, জোয়ার, ডাল, আখ, তুলা প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন হতে শুরু করে। এই যুগে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা জমির একটি নির্দিষ্ট অংশ ভোগ করত। তবে জমির বৃহৎ অংশই অধিকারভুক্ত ছিল বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত 'গহপতি' (gahpati-peasant-proprietor)-এর। সাধারণ কৃষকরা রাজা বা সম্রাটকে সরাসরি কর প্রদান করত। নগরায়ণের (urbanization) ফলে যে বিভিন্ন শহর গড়ে উঠেছিল সেখানে বসবাসকারী রাজা বা সম্রাট, অভিজাতবর্গ, ব্যবসায়ী, সৈনিক এবং কারিগর শ্রেণির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সরবরাহ গ্রাম থেকেই করা হত।

মৌর্য যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২-২০০) কৃষিকাজের ওপর রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কৃষিকাজের জন্য বিভিন্ন খামার (farms) তৈরি হয় এবং সেগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণভুক্ত হয়। এই সমস্ত খামারে ক্রীতদাস (salves) এবং ভাড়াটে শ্রমিকদের কাজে লাগানো হয়। কৃষিকাজের সম্প্রসারণের জন্য রাষ্ট্র বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণজাত মানুষদের কর ছাড় এবং গবাদি পশু, বীজ প্রভৃতি সরবরাহের মাধ্যমে সাহায্য করতে শুরু করে। মৌর্য যুগে উৎপন্ন ফ়সলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজা বা সম্রাটকে রাজকর হিসাবে দেওয়ার প্রথা ছিল। তবে প্রয়োজনের সময় রাজকরের মাত্রাও বৃদ্ধি পেত। কিন্তু মৌর্য পরবর্তীযুগে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণাধীন খামার আর রইল না এবং জমির অধিকার কৃষকদের ওপর ব্যক্তিগতভাবে বর্তায়।

গুপ্ত যুগ (৩০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (Feudal social system)-এর উদ্ভব হয়। জমির অনুদানকে কেন্দ্র করে রাজা বা সম্রাট এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি মধ্যস্বত্বভোগী (Intermediaries) শ্রেণির উদ্ভব হয় যারা বেশিরভাগ ছিল রাজার অধীনস্থ সামন্তপ্রভু এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। জমি এবং গ্রামের অনুদান লাভ করত ব্রাহ্মণরা এবং দেবদেবীর বিভিন্ন মন্দিরগুলো। এই সমস্ত জমিগুলি আবার বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণভুক্ত স্থায়ী এবং অস্থায়ী প্রজাদের (tenants) দ্বারা চাষ-আবাদ করানো হত। সান্তপ্রভুদের হাতে অর্পিত হয়েছিল নিজ নিজ এলাকার প্রশাসনিক ক্ষমতা। মূলত, এই সময় থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির ধারণা বিকশিত হতে শুরু করে।

৭১.৫.১ 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' গ্রামসমাজ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে গ্রামসমাজ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' (self-sufficient) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। গুপ্তযুগ থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ এবং অর্থনীতির আভাস পাওয়া যেতে থাকে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ব্রিটিশদের ভারতে আসা আগে পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে ওঠে।

'স্বনির্ভরতা' বোঝাতে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' কথাটির ব্যবহার করা হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ বলতে এমন একটি গ্রাম সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়, যেখানে অধিবাসীদের মধ্যে সমষ্টিগত মানসিকতা (collective sentiment) বর্তমান এবং জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য তাদের গ্রামের বাইরের কারো ওপর নির্ভর করতে হয় না।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক এ. আর. দেশাইয়ের মতে, কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ ছিল প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। চাষ-আবাদ এবং হস্তচালিত শিল্পের ওপর ভিত্তি করে গ্রামসমাজগুলি টিকে ছিল। এইচ. এস. মেইনের মতে, গ্রামসমাজ হল একটি সংগঠিত এবং স্বয়ংক্রিয় পরিবারগোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ওপর যৌথ মালিকানার অধিকারী। এলফিনস্টোন, ডেনজিল ইবেটসনের মতে, প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে গ্রাম-সমাজগুলিতে ক্ষুদ্রাকার রাষ্ট্রের প্রায় সর্বধরনের বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যেত। বাইরের কারো সাহায্য ছাড়াই এই গ্রামসমাজগুলি তার সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় খাদ্য, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন গৃহস্থালী সামগ্রী নিজেরাই তৈরি করত।

অধ্যাপক এ. আর. দেশাইয়ের অভিমত অনুযায়ী, গ্রামের সমস্ত ভূমি প্রকৃতপক্ষে পঞ্চায়েতের অধিকারে ছিল। পঞ্চায়েত গ্রামসমাজের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করত এবং চাষোপযোগী জমি জায়গা পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই বিলিবন্দোবস্ত হত। গ্রামীণ সমাজে কৃষক, মুচি, তাঁতি, কামার, কুমোর প্রমুখেরা জনগণের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই উৎপাদন করত। উৎপাদনের ব্যাপারে গ্রামগুলি ছিল মোটামুটি স্বনির্ভর।

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই ধরনের গ্রাম সম্প্রদায় ব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশ বাদ দিয়ে সারা দেশ জুড়ে বিস্তারলাভ করেছিল।

সমাজবিজ্ঞানীরা প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, তৎকালীন সময়ে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা (private ownership) অনুপস্থিত ছিল। কার্লমার্ক্সের মতে, ভারতের গ্রামীণ সমাজ গড়ে উঠেছিল জমিতে যৌথ মালিকানার ওপর ভিত্তি করে। দ্বিতীয়ত, কৃষিজাত এবং হস্তচালিত শিল্পের মেলবন্ধনকে প্রাক্-ব্রিটিশ গ্রামীণ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তৃতীয়ত, গ্রামসমাজ ছিল পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন। বাইরের সমাজের সাথে কোনোরকম অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সংযোগ ছিল না। চতুর্থত, এই ধরনের গ্রামসমাজগুলিতে সামাজিক সচলতার (social mobility) খুবই অভাব ছিল।

ভূ-সম্পত্তির যৌথ মালিকানা ছাড়াও ভারতের গ্রামীণ সমাজে আরো দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া কার্ল মার্ক্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একটি হল শ্রমবিভাজনের বিকাশের অভাব যার ফলশ্রুতি হিসাবে কৃষি এবং হস্তচালিত শিল্পের মিলন দেখা যায়। অপরটি হল এমনই একটি শ্রমবিভাজনের প্রতিষ্ঠা যা ছিল মূলত অপরিবর্তনযোগ্য। এটি জাতিব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। জাতিব্যবস্থা অনুসারে গ্রামসমাজের সদস্যদের পেশা জন্মসূত্রেই আরোপিত হত। ফলে পেশা বা বৃত্তি বংশগত হয়ে উঠেছিল। কার্ল মার্ক্সের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজবিজ্ঞানী কে. এম. আসরফ প্রাক—ব্রিটিশ যুগের গ্রামসমাজ প্রসঙ্গে বলেছেন যে এখানে স্থানীয় চাহিদার কথা মাথায় রেখেই উৎপাদন করা হত। গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষরা নিজ নিজ পেশায় নিযুক্ত থেকে তাদের কাজ করত এবং এইসব কাজের জন্য মুদ্রার পরিবর্তে দ্রব্যে পারিশ্রমিক দেওয়া হত।

তবে অনেক সমাজবিজ্ঞানীই প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের গ্রামসমাজ এবং অর্থনীতির 'স্বয়ংসম্পূর্ণতার' তত্ত্বকে পুরোপুরি সমর্থন করেননি। এম. এন. শ্রীনিবাসের অভিমত হল, ভারতের গ্রামসমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতার তত্ত্বকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। এস. সি. দুবেও এই তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, অতীতেও অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতীয় গ্রামগুলিকে বাইরের জগতের ওপর নির্ভর করতে হত। অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মতে জমিতে যৌথ মালিকানা এবং গ্রামে কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন বা পুনর্বণ্টন ইত্যাদি সংক্রান্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। উৎপাদনের বাইরে এমন কিছু ক্ষেত্র ছিল যেখানে কৃষকরা প্রায়ই যৌথভাবে কাজ করত। এরা ছিল সাধারণত একই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত। এই যৌথভাবে কাজ করার জন্য তারা যে মিলিত সংস্থা গড়ে তুলেছিল অধ্যাপক হাবিবের মতে তাই হল গ্রামসমাজ। প্রথমত, তারা কাজ করত দল বেঁধে। দ্বিতীয়ত, দল বাঁধতে হত রাষ্ট্রশক্তির সাথে মোকাবিলা করার জন্য। তিনি মনে করতেন যে, মুদ্রা-অর্থনীতি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা—এই দুটি পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক উপাদানের অস্তিত্বের জন্যই একদিকে কৃষিতে ব্যক্তিগত উৎপাদন রীতির অস্তিত্বে এবং অন্যদিকে গ্রামসমাজের গঠনে সামাজিক দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল।

স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথাটা কিছুটা অতিরঞ্জন হলেও তুলনামূলকভাবে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে গ্রামসমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অনেক বেশি ছিল। তুলনামূলকভাবে মুদ্রার ব্যবহার কম থাকায় দ্রব্য বিনিময় প্রথা ব্যাপকভাবে ছিল। অর্থনীতি জাতিব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠী নিজ নিজ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে গ্রামগুলিকে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রদান করেছিল।

৭১.৫.২ যজমানি ব্যবস্থা

জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যজমানি ব্যবস্থার (Jajmani system) কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। এই ব্যবস্থা ছিল প্রাক্-ব্রিটিশ গ্রামীণ অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জাতিগোষ্ঠীর

সদস্যদের বৃত্তি বা পেশা পূর্বনির্ধারিত এবং সুনির্দিষ্ট ছিল। বংশপরম্পরায় প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের জাতি-নির্দিষ্ট পারিবারিক পেশা গ্রহণ করতে হত। জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর তাগিদে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই যজমানি ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামে সর্বপ্রথম যজমানি ব্যবস্থার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে বৃত্তি বা পেশাভিত্তিক সেবা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় হত। কাজের বিনিময়ে শস্য, বস্ত্র, পশুখাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে পাওনা মেটানো হত। সাধারণত যারা সেবা গ্রহণ করত তাদের বলা হত যজমান (Jajman) এবং যারা সেবা প্রদান করত, তাদের বলা হত কামিন (Kamin)। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রথা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় একে 'যজমানি ব্যবস্থা' বলেই উল্লেখ করা হয়।

ভারতবর্ষে যজমানি ব্যবস্থা সম্বন্ধে উইলিয়াম, এইচ, ওয়াইজারের প্রথম বিস্তারিত আলোচনায় পাওয়া যায় যে এই ব্যবস্থাই গ্রামীণ সমাজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বজায় রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁর মতে যজমানি ব্যবস্থা কিছু দায়দায়িত্ব এবং অধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যজমানদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ব্যতীত নানা ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বিপদ-আপদে কামিনরা প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভ করত। ফলে, সমাজে উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণির মধ্যে একটি সামাজিক মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল এবং গ্রামীণ অর্থনীতির নিরাপত্তার দিকটিও সুনিশ্চিত হয়েছিল।

এডমন্ড লীচ যজমানি ব্যবস্তাকে একটি সুসংগঠিত শ্রমবিভাজন ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে বলা যায় যে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলনের আগে সেই যুগের সমাজব্যবস্থায় পরস্পর নির্ভরশীল জাতিভুক্ত পরিবারগুলির কাছে যজমানি ব্যবস্থাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমবিভাজন এবং বিশেষীকরণ গুরুত্ব লাভ করলেও নিম্ন মর্যাদার পেশাদার পরিবারগুলির স্বার্থ একইভাবে রক্ষিত হত না। তবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁরা বংশপরম্পরায় জীবিকানির্বাহের সংস্থান খুঁজে পেত।

অধ্যাপক ডেভিড জি. ম্যান্তেলবাম্ যজমানি সম্পর্ককে খাদ্য উৎপাদনকারী পরিবারের সাথে দ্রব্য এবং সেবা প্রদানকারী পরিবারগুলির আন্তঃসম্পর্ক হিসাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে জাতির অন্তর্ভুক্ত থেকেও পারিবারিক সম্পর্কই এক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। উদাহরণ হিসাবে ম্যান্তেলবাম্ দেখিয়েছেন যে গ্রামের একটি কৃষক পরিবার ধাতুনির্মিত যন্ত্রপাতি পায় একটি নির্দিষ্ট কামার পরিবার থেকে। বিনিময়ে সেই কামার পরিবারটি কৃষক পরিবারের কাছ থেকে উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ লাভ করে। তাঁর মতে, যজমানি সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী (durable), সুনির্দিষ্ট (exclusive) এবং বহুমুখী (multiple)। 'দীর্ঘস্থায়ী' এই কারণে যে এই সম্পর্ক উভয় পরিবারের ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয় এবং উভয় পরবারের পূর্বপুরুষরাও এই একই সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অনুপস্থিতিতে নিজ গোত্রভুক্ত পরিবারের মাধ্যমেই শূন্যস্থান পূরণ করা হত। যজমানি ব্যবস্থা কেন 'সুনির্দিষ্ট' সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ম্যান্তেলবাম্ বলেছেন যে উভয় পরিবারের ভিতর খাদ্য, দ্রব্য এবং সেবার আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সম্পর্ক ছিল। 'বহুমুখী'-এর কারণ দর্শাতে তিনি বলেন যে উভয় পরিবারের মধ্যে আর্থিক বিনিময় ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কও প্রাধান্য লাভ করে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে যজমানি ব্যবস্থা প্রাক্-ব্রিটিশ গ্রামীণ সমাজে একটি স্থায়ী সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করেছিল।

ঈশ্বরণ মন্তব্য করেন যে যজমানি সম্পর্ক গ্রামীণ সমাজে আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিল। বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সাথেও এর সংযোগ ছিল। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ইত্যাদিতে যজমানের গৃহে বিভিন্ন যাতিভুক্ত সেবাপ্রদানকারী পরিবারের সদস্যদের নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হত। অস্কার লুইসের মতে, যেহেতু এক জাতির অন্তর্ভুক্ত পরিবার অন্য জাতির নির্দিষ্ট পেশা গ্রহণ করতে পারত না, তাই যজমানি ব্যবস্থার মাধ্যমে একে অপরকে পেশাভিত্তিক দ্রব্য এবং সেবার বিনিময়ে সাহায্য করত।

যজমানি সম্পর্ককে আবার পৃষ্ঠপোষক-গ্রাহক সম্পর্ক (patron-client relation)-ও বলা হয়। গ্রামীণ

সমাজে বিভিন্ন জাতিভুক্ত পরিবারগুলির আন্তঃসম্পর্ক পৃষ্ঠপোষক (patron) এবং সেবাপ্রদানকারী (supplier of sefvices)-এর মধ্যে উঁচু-নীচু (super-ordinate-subordinagte) সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পৃষ্ঠপোষক পরিবারগুলিকে সাধারণত 'শুদ্ধ-জাতিভুক্ত' (যজমান) এবং সেবাপ্রদানকারী পরিবারগুলিকে 'অশুদ্ধ-জাতিভুক্ত' (কামিন) বলে মনে করা হত। সামাজিক স্তরবিন্যাসের উঁচু পর্যায়ে যজমানদের এবং নীচু পর্যায়ে কামিনদের অবস্থান ছিল।

অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতাশালী উঁচু জাতিভুক্ত পরিবারগুলির জন্য অব্যাহতভাবে এবং স্থায়ী ভিত্তিতে শ্রমশক্তি সরবরাহ সুনিশ্চিত করাই ছিল যজমানি ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থায় যজমানরা হল শোষক এবং কামিনরা হল শোষিত। কামিনদের তাদের 'শ্রমের মূল্য' থেকে সর্বদাই বঞ্চিত করা হত। ফলে কামিনদের এক ধরনের দাসত্বের জীবনযাপন করতে হত বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের অভিমত অনুযায়ী বলা যায় যে যজমানি স্বত্ব অনুসারে কামিনকে যজমান পরিবারের 'সম্পত্তি' মনে করা হয় এবং এই স্বত্ব পিতা থেকে সন্তানে বর্তায়।

আবার অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ মন্তব্য করেছেন যে, যজমানি ব্যবস্থা মূলত যজমান এবং কামিন উভয়ের কাছেই কিন্তু কমবেশি সুবিধাপ্রদানকারী। যজমানরা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ সুযোগসুবিধা লাভ করে, এটি যেমন ঠিক, তেমনই কামিনরাও প্রয়োজন যজমানের বিরুদ্ধে নিজেদের 'জাতি-পরিষদ'-এ অভিযোগ জানাতে পারে। এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে জাতি পরিষদের নির্দেশে ঐ নির্দিষ্ট জাতিভুক্ত কামিনরা অভিযুক্ত যজমানের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। তাই, কামিনদের তরফ থেকে জাতিভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই যজমানদের কাজ করতে হত।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বৈচিত্র্য এবং সামাজিক গতিশীলতার প্রেক্ষাপটে যজমানি ব্যবস্থাকে কখনোই একটি অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা হিসাবে মনে করা যায় না। সমগ্র ভারতবর্ষে যজমানি ব্যবস্থার কাঠামো এবং প্রকৃতি একরকম নয়, এরা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। জাতিব্যবস্থা, জমির মালিকানা ইত্যাদির সাথে এই ব্যবস্থা সম্পর্কযুক্ত। এগুলির পরিবর্তনের ফলে যজমানি ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন হয়। পরবর্তীকালে কৃষির বাণিজ্যকীকরণ (commercialization of agriculture), শিল্পায়ন (Industrialization) শহরীকরণ (urbanization) প্রভৃতির কারণে যজমানি ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

৭১.৫.৩ ব্রিটিশ আমলে জাতিব্যবস্থা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তে জাতীয় অর্থনীতির উদ্ভব হয়। গ্রামীণ অর্থনীতি দুর্বল এবং ভেঙে পড়ায় অন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। একইরকম মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে ভারতীয় সমাজ কৃষি এবং হস্তশিল্প নির্ভর সরল সমাজব্যবস্থা থেকে ক্রমশ শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রাম থেকে শহরের অভিমুখে পরিযান (migration) শুরু হয়। অর্থাৎ, শিল্পায়নের সাথে সাথে নগরায়ণও শুরু হয়। ভারতীয় সমাজ যতই শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে, ততই গ্রামীণ সমাজের পুরোনো সম্পর্ক কাঠামো বিপর্যস্ত হতে শুরু করে এবং জাতিব্যবস্থার স্থিতিশীলতা অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। জাতি-নির্দিষ্ট পেশাগ্রহণের বাধ্যবাধকতাও আর আগের মতো থাকে না। আরোপিত মর্যাদার (Ascribed status) চেয়ে অর্জিত মর্যাদার (Achieved status) গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ সামাজিক গতিশীলতা (social mobility) তুলনায় বৃদ্ধি পায়।

৭১.৫.৪ স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি

এই অংশে আমরা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করব। মূল আলোচনার আগে বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ্ এম. এন. শ্রীনিবাসের সংস্কৃতায়ণ (Sanskritization) তত্ত্বের

একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের জাতিব্যবস্থা সম্বন্ধে খ্রিষ্টান মিশনারি এবং ব্রিটিশ প্রশাসকদের প্রচারে প্রভাবিত হয়ে অনেকে একে অনড় অচল প্রথা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতানুসারে জাতিব্যবস্থায় সামাজিক সচলতার (social mobility) পথ একেবারে বন্ধ। কিন্তু এই অভিমতের বিরুদ্ধাচরণ করে এম. এন. শ্রীনিবাস সামাজিক সচলতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সংস্কৃতায়ণ (Sanskritization) ধারণাটিকে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি মনে করেন যে, অনেক সময় কোনো 'নীচু' জাতি সামাজিক স্তরবিন্যাসে 'উঁচু' জাতির পেশা, জীবনধারা প্রভৃতি অনুকরণের মাধ্যমে উন্নততর স্তরে উন্নীত হতে সচেষ্ট হয়ে থাকে। এই প্রয়াসকেই 'সংস্কৃতায়ণ' বলা হয়ে থাকে। শ্রীনিবাস মনে করেন যে, এই অপেক্ষাকৃত 'উঁচু' জাতি হিসাবে সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি কিন্তু সহজে স্বীকৃত হয় না। সাধারণত, এক বা দুই প্রজন্ম ধরে এই দাবি চলতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। প্রথমে শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়ণকে ব্রাহ্মণ্যকরণ প্রক্রিয়ার সমতুল্য হিসাবে তুলে ধরলেও পরবর্তীকালে তিনি তার পরিবর্তন সাধন করেন। এই প্রক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ ছাড়াও নজরীস্থাপক গোষ্ঠী (Reference group) হিসাবে অন্যান্য প্রভাবশালী গোষ্ঠীর গুরুত্বও তিনি স্বীকার করেন। তাঁর মতানুসারে বলা যায় যে সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণের আদর্শ, উত্তর ভারতে ক্ষত্রিয় আদর্শ এবং পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈশ্য আদর্শ নীচু জাতির পক্ষে অনুকরণীয় ছিল। রামপুর গ্রামে গবেষণা করতে গিয়ে শ্রীনিবাস দেখেন যে উচ্চ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও সংখ্যাবহুল নির্দিষ্ট পেশাজীবী জনসাধারণ অর্থনৈতিক ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে এক-একটি অঞ্চলে আধিপত্যকারী জাতিতে (Dominant caste) পরিণত হয়েছে। এই আধিপত্যকারী জাতি এবং সংস্কৃতায়ণ প্রক্রিয়ার মিলিত প্রভাবে সনাতন জাতিব্যবস্থার অচলায়তন ভেঙে গিয়ে ভারতীয় জাতি-প্রথায় সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সংস্কৃতায়ণের ফলে যে, সামাজিক গতিশীলতার উৎপত্তি হয়েছে, তা শুধু সমাজব্যবস্থায় স্থিতিগত পরিবর্তন এনেছে, কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন হয়নি।

সংস্কৃতায়ণ প্রক্রিয়া জাতিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলে শ্রীনিবাস মনে করেন। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক সময় নীচু জাতির মানুষ উচ্চবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে। এর মূল উদ্দেশ্য হল উঁচু জাতিভুক্ত হওয়া। এই প্রচেষ্টা সফল হলে সংশ্লিষ্ট নীচু জাতি উঁচু জাতিতে উন্নীত হতে পারে। জমিজমার মালিকানা উচ্চতর জাতিতে উন্নীত হওয়ার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের অভিমত হল যে সমাজের উপরের স্তরে উঠার জন্য যদিও জমির মালিকানা একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত নয়, তবুও এটি কিন্তু বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ভূমির স্বত্ব এবং জাতিবিন্যাসে উচ্চস্থান—এই দুয়ের মধ্যে সহযোগী ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের সর্বত্র জাতিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো এবং কঠোরতা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। শহরাঞ্চলের মতো গ্রামাঞ্চলেও জাতিভিত্তিক অর্থনীতি বিশেষভাবে হীনবল হয়ে পড়েছে। এর পিছনে বিভিন্ন কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিল্পায়ন (industrialization) নগরায়ণ (urbanization), আধুনিক অর্থব্যবস্থা (modern economic system) ইত্যাদি।

সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল অনড়, অচল প্রকৃতির। সমগ্র গ্রামীণ সমাজ জুড়ে ছিল জাতিভেদ প্রথার প্রভাব-প্রতিপত্তি। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের শিল্পায়ন (industrialization) এবং শিল্প সভ্যতার ব্যাপক বিস্তার জাতিভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের ফলে যন্ত্র সভ্যতা দ্রুতগতিতে বিকশিত হয় এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হওয়ায় গ্রাম থেকে দল দলে উঁচু-নীচু বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ শিল্পাঞ্চলগুলিতে আসতে শুরু করে এবং এই শিল্পাঞ্চলগুলিতে সকল শ্রেণির মানুষের সমাবেশ এবং সহাবস্থানের সৃষ্টি হয় বা জাতপাতভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। সমাজে মানমর্যাদা

এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে সম্পদ, শিক্ষা এবং গুণগত যোগ্যতার অবদান অনস্বীকার্য। একজন অতি নিম্নবর্ণের মানুষ ও বিত্তবান বিচরণ হতে শিক্ষিত হলে সামাজিক ক্ষেত্রে সহজেই মানমর্যাদা এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ্ এফ. জি. বেইলী উড়িষ্যার এক গ্রামে অনুসন্ধানমূলক সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রতিপন্ন করেছেন যে ঐ গ্রামে তথাকথিত নীচু জাতির ব্যক্তিবর্গ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদশালী হয়ে তার মাধ্যমে জমিজমার মালিকানা অর্জন করেছে এবং পরিণামে সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। শিল্পায়নের ফলেই এই সামাজিক পরিবর্তন সম্পাদিত হয়েছে। যদিও নগরাঞ্চলে এই পরিবর্তন বিশেষভীবে লক্ষ্য করা যায়, তবে গ্রামাঞ্চলও এই পরিবর্তনের প্রভাবকে এড়িয়ে থাকতে পারেনি।

শিল্পায়নের মতো নগরায়ণও (urbanization) জাতিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিকূল প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। শিল্পায়নের সাথে সাথে সূত্রপাত হয়েছে নগরায়ণের। কর্মসংস্থানের আশায় গ্রাম থেকে আগত মানুষরা শহরের পরিবেশের সাথে মিলেমিশে যায়। ফলে জাতিভিত্তিক পেশা ব্যবস্থার ভিত্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে।

জাতিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে আধুনিক অর্থব্যবস্থার (modern economic system) অবদানও অনস্বীকার্য। বর্তমানে ব্যক্তির বৃত্তি নির্ধারিত হয় গুণগত যোগ্যতা, লাভক্ষতি এবং পছন্দ-অপছন্দের বিচার-বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে। প্রাচীন ভারতের সনাতন হিন্দু সমাজে সামাজিক ক্ষেত্রের মতো অর্থনীতিক ক্ষেত্রেও উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গ বাড়তি এবং বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। কিন্তু আধুনিক অর্থব্যবস্থায় বর্ণগত বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে এরকম বৈষম্য করা সম্ভব নয়। আধুনিক অর্থব্যবস্থার কল্যাণে নানা ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ এবং ভোগ করা এখন নিম্নবর্ণের ব্যক্তিদের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে। এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের দরিদ্র মানুষের তুলনায় নিম্নবর্ণের ব্যক্তিবর্গ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশি মানমর্যাদা ভোগ করতে পারছে।

৭১.৬ জাতিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির সামগ্রিক মূল্যায়ন

জাতিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বে জাতিব্যবস্থা গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোয় একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ যুগ এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল এবং ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। তথাপি, আমরা এই কথা কখনোই বলতে পারি না যে বর্তমানে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোয় জাতিব্যবস্থার কোনো ভূমিকা নেই। শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং আধুনিক শহরাঞ্চলের মতো গ্রামাঞ্চলেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে ঠিকই, কিন্তু গ্রামাঞ্চল এখন জাতিভিত্তিক অর্থনীতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়।

ভারতীয় সমাজে শিল্পায়নের সাথে সাথে ক্রমশ অর্থনৈতিক শ্রেণির উদ্ভব হলেও তার মধ্যে জাতির বৈশিষ্ট্য একেবারে অবলুপ্ত হয়নি। অধ্যাপক এস. সি. দুবের অইভমত অনুসারে বলা যায় যে, জাতপাতকেন্দ্রিক সনাতন গোষ্ঠীর আনুগত্য এখনও ভারতীয় সমাজে প্রবলভাবে বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে, জাতিভিত্তিক সামাজিক মর্যাদার মতো এখনকার শ্রেণিভিত্তিক সামাজিক মর্যাদাও অনেকাংশে 'আরোপিত' (ascribed)। আধুনিক শ্রেণিসমাজের পরিপ্রেক্ষিতেও একথা বলা যায় যে উচ্চবিত্ত পরিবারগুলির সন্তানরাও সাধারণত তাদের পারিবারিক মানমর্যাদার অধিকারী হয় এবং তুলনামূলকভাবে সমাজে বেশি সুযোগ-সুবিদা লাভ করে। গ্রামাঞ্চলে জাতিভিত্তিক বৃত্তি বা পেশার অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। ব্রাহ্মণরা পুরোহিত হিসাবে

এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা আবার কৃষিকাজের সাথেও সংযুক্ত হয়ে পড়েছে। জমির অধিকারভোগী আধিপত্যকারী জাতিগুলি (dominant castes) জাতিব্যবস্থার ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসে (hierarchy) উচ্চ এবং মধ্যম পর্যায়ভুক্ত। অন্যদিকে সমাজে যারা নীচু জাতি, যারা জমির ভোগদখল থেকে বঞ্চিত, বিশেষত ক্ষুদ্র এবং প্রান্তীয় চাষিরা (small and marginal peasants), তারা কৃষিক্ষেত্রে মজুরির বিনিময়ে কাজ করে থাকে। কারিগর জাতি যেমন ছুতোর, কামার প্রমুখরা তাদের চিরাচরিত বৃত্তি বা পেশার সাথেই সংযুক্ত থাকে। যদিও গ্রামাঞ্চল থেকে মানুষ শহরে এসে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হচ্ছে এবং এর ফলস্বরূপ জাতিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে সাময়িক মুক্তি লাভ করছে, তবুও গ্রামাঞ্চলে জাতিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখনও প্রবলভাবে অস্তিত্বশীল।

৭১.৭ সারাংশ

অর্থনীতি বলতে বোঝানো হয় বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত দ্রব্য এবং সেবা সামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন এবং ভোগকে। গ্রামীণ অর্থনীতি মূলত জমি এবং অন্যান্য সম্পদের ওপর ভোগদখল, উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি, উৎপাদন সংগঠন এবং তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক, গ্রামীণ কুটিরশিল্প প্রভৃতির মাধ্যমে আবর্তিত হয়ে থাকে।

সিন্ধু সভ্যতার আমলে এক ঋক্-বৈদিক যুগে জাতিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি অনুপস্থিত ছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে বৃত্তি বা পেশার ওপর ভিত্তি করে শ্রমদান পদ্ধতির উদ্ভব হল অর্থাৎ জাতিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা হল। গুপ্তযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির ধারণা বিকশিত হতে শুরু করে।

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। সমাজতাত্ত্বিক এ. আর. দেশাই, এইচ. এস. মেইন, এলফিনস্টোন, ডেনজিল ইবেটসন, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রামীণ সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতার তত্ত্বকে বিচার-বিশ্লেষণ করেন। অন্যদিকে, এম. এন. শ্রীনিবাস, এম. সি. দুবে প্রমুখরা প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের তত্ত্ব সম্পূর্ণ অর্থে গ্রহণ করেননি। তবে এই বিতর্কের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সেটি হল স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও তুলনামূলকভাবে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের গ্রামীণ সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অনেক বেশি ছিল।

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের সমাজে জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যজমানি ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়াইজার, এডমন্ড লীচ, ডেভিড জি. ম্যান্ডেলবাম্, ঈশ্বরণ প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন। সাধারণ অর্থে, জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর তাগিদে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই হল যজমানি ব্যবস্থা। তবে পরবর্তীকালে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, শিল্পায়ন, শহরীকরণ প্রভৃতি কারণে এই ব্যবস্থা জটিল হয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ আমলে জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তে জাতীয় অর্থনীতির উদ্ভব হয়। শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের দৌলতে জাতিনির্দিষ্ট পেশা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আর আগের মতো থাকে না।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে এম. এন. শ্রীনিবাস তাঁর 'সংস্কৃতায়ণ' তত্ত্বের মাধ্যমে জাতিব্যবস্থার সামাজিক সচলতাকে তুলে ধরেন। শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং আধুনিক অর্থব্যবস্থা বর্তমান ভারতবর্ষের জাতিকেন্দ্রিক অর্থনীতিকে দুর্বল করে তুললেও ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ এখনও এর প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি।

৭১.৮ অনুশীলনী

(১) নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান :

	ঠিক	ভুল
(ক) গ্রামীণ অর্থনীতিতে জমির কোন ভূমিকা নেই।	☐	☐
(খ) সিন্ধুবাসীদের জীবনযাত্রা ছিল পশুপালনভিত্তিক এবং আধা-যাযাবর কেন্দ্রিক।	☐	☐
(গ) জাতি এবং বর্ণ অনুসারে সমাজ গঠিত হয় পরবর্তী বৈদিক যুগে।	☐	☐
(ঘ) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য।	☐	☐
(ঙ) প্রাক্-ব্রিটিশ গ্রামীণ সমাজে সাধারণত যারা সেবা গ্রহণ করত, তাদের বলা হত কামিন বেং যারা সেবা প্রদান করত, তাদের বলা হত যজমান।	☐	☐
(চ) যজমানি সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী, সুনির্দিষ্ট এবং বহুমুখী বলে অভিহিত করেছেন ম্যান্ডেলবাম্।	☐	☐
(ছ) সংস্কৃতায়ণ তত্ত্বের প্রবর্তক হলেন বেইলী।	☐	☐
(জ) শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং আধুনিক অর্থব্যবস্থা জাতিভিত্তিক অর্থনীতিকে দুর্বল করেছে।	☐	☐
(ঝ) জাতি একটি অর্জিত মর্যাদা (achieved status)।	☐	☐
(ঞ) যজমানি সম্পর্ককে পৃষ্ঠপোষক-গ্রাহক সম্পর্কও (patron-client relations) বলা হয়।	☐	☐

(২) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর লিখুন :

(ক) গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে জাতিব্যবস্থার অর্থনৈতিক স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(খ) প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' গ্রামসমাজ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত আলোচনা করুন।

(গ) যজমানি ব্যবস্থা কী? এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করুন।

(ঘ) স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি কি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছে? এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য যুক্তি সহকারে লিখুন।

৭১.৯ উত্তরমালা

(১) (ক) ভুল; (খ) ভুল; (গ) ঠিক; (ঘ) ভুল; (ঙ) ভুল; (চ) ঠিক; (ছ) ভুল; (জ) ঠিক; (ঝ) ভুল; (ঞ) ঠিক।

৭১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) A. R. Deasi : *Rural Sociology in India;* Popular Prakshan, 1988.

(২) David G. Mandelbaum : *Society in India;* Bombay Popular Prakashan, 1966.

(৩) M. N. Srinivas : *Social Change in Modern India;* Orient Longmann, 1997.

(৪) Ram Ahuza : *Indian Social System;* Rawat Publication, 1993.

(৫) ডঃ অনিরুদ্ধ চৌধুরী : *ভারতের সমাজ প্রসঙ্গে;* চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০।

একক ৭২ ❑ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো : পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা

গঠন

৭২.১ উদ্দেশ্য
৭২.২ প্রস্তাবনা
৭২.৩ পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
    ৭২.৩.১ প্রাচীন ভারতীয় সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা
    ৭২.৩.২ ব্রিটিশ আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা
৭২.৪ স্বাধীন ভারতীয় সমাজে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা
    ৭২.৪.১ সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী
    ৭২.৪.২ বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটি
    ৭২.৪.৩ অশোক মেহেতা কমিটি
    ৭২.৪.৪ জি. ভি. কে. রাও কমিটি
    ৭২.৪.৫ এল. এম. সিংভী কমিটি
    ৭২.৪.৬ ৭৩তম সংবিধান সংশোধন বিল
৭২.৫ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা
৭২.৬ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কার্যাবলী
    ৭২.৬.১ গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা মণ্ডল পঞ্চায়েতের কার্যাবলী
    ৭২.৬.২ পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলী
    ৭২.৬.৩ জেলা পরিষদের কার্যাবলী
৭২.৭ ভারতবর্ষের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়ন
৭২.৮ সারাংশ
৭২.৯ অনুশীলনী
৭২.১০ উত্তরমালা
৭২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৭২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন এবং বিচার-বিশ্লেষণে সক্ষম হবেন :

- পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বলতে কী বোঝানো হয়ে থাকে;
- পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট;
- স্বাধীন ভারতীয় সমাজ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রকৃতি;

- পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা;
- পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কার্যাবলী;
- পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্য এবং ব্যর্থতা

৭২.২ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় জাতিভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো হিসাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হবে। 'স্বায়ত্তশাসন' বলতে বোঝায় নিজের বা নিজেদের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন শাসন। যখন গ্রাম, নগর, জেলা এবং শহরের মতো ছোট ছোট অঞ্চলের শাসনকার্যাদি পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তখন সেই ব্যবস্থাকে 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা' নামে অভিহিত করা হয়। গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বায়ত্তশাসন নানা দিক থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান নাগরিকদের স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনার সাথে সংযুক্ত হতে সাহায্য করে। এর ফলে তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়।

অন্যান্য উন্নয়শীল দেশগুলির মতো ভারতবর্ষেও স্বাধীনতার পর থেকে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক নীতিসমূহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে গড়ে উঠেছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা এইরকম একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উদাহরণ। মনে করা হয় যে, পঞ্চায়েতের মতন একইরকম একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় সরাসরি জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসুচির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব।

ভারতীয় সংবিধানের ৪০নং ধারার চতুর্থ পর্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিসমূহে (Directive Principle of State Policy) বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং এই প্রতিষ্ঠানকে এমন কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা প্রদান করতে হবে যাতে এই প্রতিষ্ঠানটি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের হাতে এমন ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা নিজেরা নিজেদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি এবং কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ ক্ষমতার একটি উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামো হিসাবে গড়ে উঠেছে।

আমরা এই একক গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থল হিসাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করব।

৭২.৩ পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

গ্রামীণ ক্ষমতার পরিকাঠামোয় পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্তমান। যদিও প্রাচীনকালে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচিত ছিল না, তবুও এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (elements) সেই যুগে বর্তমান ছিল।

আমরা পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে দুইটি যুগে বিভক্ত করে আলোচনা করব। সেগুলি হল—(১) প্রাচীন ভারতীয় সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং (২) ব্রিটিশ আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা।

৭২.৩.১ প্রাচীন ভারতীয় সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

আমরা যদি প্রাচীন ভারতের বিশেষ করে প্রাক্-বৈদিক এবং বৈদিক যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে বেদে বলা হয়েছে তদানীন্তন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রত্যেকটি গ্রামকে দেখাশুনার দায়িত্ব একজন ব্যক্তির হাতে অর্পিত হবে যিনি 'গ্রামণী' (Gramani) নামে পরিচিত। আবার, পরবর্তী গুপ্তযুগের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সেই আমলে আমরা 'গ্রামপতি' (Gramapati) এবং 'বিশ্বপতি' (Vishyapati)-এর প্রসঙ্গ পাই। গ্রামপতির হাতে ছিল একটি গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এবং বিশ্বপতির হাতে ছিল একটি জেলার পরিপূর্ণ দায়িত্ব।

গ্রামীণ গ্রামপতি এবং বিশ্বপতির ভূমিকার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু আধুনিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কিছুটা প্রতিফলন দেখতে পাই। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাচীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাথে আধুনিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মূল পার্থক্য কিন্তু নির্বাচনী উপাদান (elective element)-কে কেন্দ্র করে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নির্বাচনের বিষয় সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল, যা আধুনিক সমাজব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত।

ব্রিটিশদের আমাদের দেশে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পুর্বে আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন যুগের স্যামাজিক প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত আলোচনায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রসঙ্গ দেখতে পাই।

৭২.৩.২ ব্রিটিশ আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

ব্রিটিশ আমলে গ্রামীণ ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ক্রমশ অধঃপতনের দিকে এগিয়ে চলেছিল। বিংশ শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধী সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষের হাতে 'স্বরাজ' (self-rule) তুলে দেওয়া। এই কারণে তিনি পঞ্চায়েতের হাতে আরো বেশি করে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 'মানুষের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ' (Power over people)-এর পরিবর্তে 'মানুষের হাতে ক্ষমতা প্রদান' (Power to the people)-এর আহ্বান জানিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে গান্ধীজী সন্দিহান ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে রাষ্ট্রের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য যেমন গ্রামীণ কুটিরশিল্প এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন অস্পৃশ্যতা (untouchability) দূরীকরণ। তিনি মনে করতেন যে, পঞ্চায়েতের অধীনে গ্রাম একটি প্রজাতন্ত্র (Republic) হিসাবে কাজ করবে যেখানে ঐক্যমতের ওপর ভিত্তি করে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

ব্রিটিশ শাসকরা ভারতবর্ষে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি কায়েম করার পর কতকগুলি স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। যেমন—জেলা বোর্ড (District Board), স্থানীয় বোর্ড (Local Board), পৌরপ্রতিষ্ঠান (Municipalities) প্রভৃতি। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত ব্রিটিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের (Higher Authorities) নির্দেশ অনুসারে কাজ করত। এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে মানুষকে সংযুক্ত করতে পারেনি। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির একটি ব্যবধান রচিত হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে আধুনিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয় যার

মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের (Democratic Decentralization) দ্বারা গ্রামের সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে তাদের সাথে সরকার এবং আমলাদের (Bureaucrats) ব্যবধান দুর করা সম্ভব হবে।

৭২.৪ স্বাধীন ভারতীয় সমাজে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকতা (Democratic Decentralisation)-এর উপর ভিত্তি করে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হল। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর আর্থ-সামাজিক লক্ষের ওপর ভিত্তি করে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থাকে নতুনভাবে সুগঠিত করবার জন্য প্রবর্তিত হল 'সমষ্টি-উন্নয়ন কর্মসূচী' (Community Development Programme)।

৭২.৪.১ সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী

সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী (Community Development Programme)-এর মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত গ্রামীণ শ্রেণীকাঠামো অটুট রেখে জমি এবং সম্পদের অসম বণ্টনের প্রেক্ষাপটেই গ্রামের উন্নয়ন। এই ক্ষেত্রে আশা করা হয়েছিল যে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর প্রাথমিক পর্বে সামাজিক স্তরবিন্যাসের (Social stratification) উপরের অংশের লোকেরা তুলনায় বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভ করলেও ক্রমশ তা 'চুইয়ে পড়ে' (Trickle down) একসময় গ্রামের সব অংশের মানুষেরই উপকারে আসবে। তাঁদের জীবনমানের (quality of life) উন্নতি হবে এবং গ্রামোন্নয়নে গতি আসবে এবং গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গ্রামোন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শরিক হবেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৫৭ সালে সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রক (Ministry for Community Development) তৈরি করা হল। কিন্তু, অভিজ্ঞতায় দেখা গেল যে গ্রামের অধিকাংশ মানুষের জীবনমানের উন্নতি তো হয়ই নি, বরং গ্রামসমাজে অসাম্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭২.৪.২ বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটি

সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী (Community Development Programme)-এর আশানুরূপ সফলতা না পাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৭ সালের ১৬ই জানুয়ারী বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটি (Balwant Rai Mehta Committee) গঠন করেন। এই কমিটি ১৯৫৭ সালের ২৪শে নভেম্বর একটি প্রতিবেদন (report) জমা দেয় যাতে ত্রিস্তর বিশিষ্ট (three-tier) পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়। এই তিনটি স্তর হল ঃ

(ক) পঞ্চায়েত ঃ গ্রামে নির্বাচনের ওপর ভিত্তি করে একটি পঞ্চায়েত থাকবে যেখানে তফশিলী জাতি (Scheduled Castes), উপজাতি (Scheduled Tribes) এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

(খ) পঞ্চায়েত সমিতি ঃ ব্লক (Block) স্তরে নির্বাচনের ওপর ভিত্তি করে পঞ্চায়েত সমিতি গড়ে তুলতে হবে।

(গ) জেলা পরিষদ ঃ জেলা স্তরে একটি জেলা পরিষদ তৈরি হবে যেখানে জেলার প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা, জেলা থেকে নির্বাচিত বিধায়ক (MLAs)-রা এবং সাংসদ (MPs)-রা এবং কিছুসংখ্যক জেলা আধিকারিকরা (District Officers) থাকবেন এবং সর্বোপরি সভাপতি (Chairman) হিসাবে একজন সংগ্রাহক (Collector) থাকবেন। তবে জেলা পরিষদের প্রধান কাজ হবে পরিকল্পনা করা, বিভিন্ন কাজের মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপন করা এবং তত্ত্বাবধান করা। তবে এর হাতে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রদর্শন ও কর চাপানো সংক্রান্ত কোন অধিকার দেওয়া হবে না।

অর্থাৎ, উপর থেকে চাপানো আমলাতান্ত্রিক গ্রামোন্নয়ন পদ্ধতির পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণ গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক উন্নত প্রশাসন—সহজ কথায়, এই ছিল বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটি (Balwant Rai Mehta Committee)-এর সুপারিশ।

এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে, ১৯৫৯ সালে রাজস্থান এবং অন্ধ্রপ্রদেশে প্রতম পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। এরপর ১৯৬০ সালে অসম, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকে, ১৯৬২ সালে মহারাষ্ট্রে; ১৯৬৩ সালে গুজরাটে এবং ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা চালু হয়।

কিন্তু কমিটি যা চেয়েছিল তার বাস্তবায়ন হল না। আইনগতভাবে পঞ্চায়েতের অধিকার বা দায়দায়িত্ব তেমনভাবে নির্দিষ্ট হল না, গ্রামীণ প্রশাসন পদ্ধতিরও তেমনভাবে পরিবর্তন ঘটল না। বিকেন্দ্রীভূত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের গ্রামোন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের বিষয়টা বেশিরভাগ রাজ্যেই প্রবর্তন করা যায়নি। নানাবিধ কারণে প্রথম পর্যায়ের এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সাফল্যলাভ করতে পারেনি। সমাজবিজ্ঞানীরা বৈষম্যমূলক স্তরবিভক্ত গ্রামীণ সমাজ, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, আমলাতান্ত্রিক অনীহা, ধনী চাষিদের রাজনৈতিক প্রভাব এবং আর্থসামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁদের আধিপত্য ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়কেই ব্যর্থতার কারণ বলে মনে করেছেন।

৭২.৪.৩ অশোক মেহেতা কমিটি

১৯৭৭ সালে ভারতবর্ষের জাতীয় স্তরে সরকারের পরিবর্তন ঘটল। জনতা সরকার তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য সচেষ্ট হল। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ঐ বছরই গঠিত হল অশোক মেহেতা কমিটি (Ashok Mehta Committee)। এই কমিটি পঞ্চায়েতীরাজ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা উল্লেখ করল। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ, এই ব্যবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং জেলা পরিষদ পর্যায়ে সামাজিক ন্যায় বিচার কমিটি গঠন করা। ১৯৭৮ সালে এই কমিটি প্রতিবেদন (report) পেশ করে এবং ১৯৭৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে তা নিয়ে আলোচনা হয়। পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং অর্থ সরবরাহ প্রসঙ্গে সম্মেলনে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হয়। তা ছাড়াও সবাই একমত হন যে গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প রচনা এবং তার রূপায়ণে পঞ্চায়েতকে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে। কিন্তু এইসব সুপারিশ কার্যকর করার আগেই জনতা সরকারের পতন ঘটে।

৭২.৪.৪ জি. ভি. কে. রাও কমিটি

১৯৮৫ সালে জি. ভি. কে. রাও কমিটি (G. V. K. Rao Commttee)-ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচি রূপায়ণের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলবার সুপারিশ করে। এই সুপারিশ অনুযায়ী সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতগুলির হাতে গ্রামোন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচনা এবং 'রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পণের কথা বলা হয়।

৭২.৪.৫ এল. এম. সিংভী কমিটি

পঞ্চায়েতীরাজের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সেই বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য ১৯৮৭ সালে এল. এম. সিভী কমিটি (L.M. Singhvi Commttee) গঠন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তৎকালীন রাজীব গান্ধী সরকার ৬৪তম সংবিধান সংশোধন বিল ১৯৮৯ সালের শেষদিকে লোকসভায় পেশ করেন। এই বিলে প্রত্যেক রাজ্যে ত্রিস্তর (three tier) পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা, তাতে ৫ বছর পর পর নিয়মিত নির্বাচন করা, তফশিলী জাতি-উপজাতি এবং মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েত আসন সংরক্ষম, রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন প্রভৃতি প্রস্তাব করা হয়। এই বিল লোকসভায় গৃহীত হলেও রাজ্যসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমর্থন পায়নি।

৭২.৪.৬ ৭৩তম সংবিধান সংশোধন বিল

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ইতিহাসে ৭৩তম সংবিধান সংশোধন বিল এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ১৯৯২ সালের ২২শে এবং ২৩শে ডিসেম্বর লোকসভা এবং রাজ্যসভায় ৭৩তম সংবিধান সংশোধন বিল গৃহীত হয় এবং ১৯৯৩ সালের ২৪শে এপ্রিল তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এর ফলে গ্রামীণ পরিকাঠামো হিসাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। সংশোধিত সংবিধানে বড় রাজ্যগুলির জন্য ত্রিস্তর এবং ছোট রাজ্যগুলির জন্য ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সংবিধান সংশোধনী আইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(ক) এই সংবিধান সংশোধনের নির্দেশ ও রূপরেখা মেনে প্রত্যেক রাজ্যকে আইন পাশ বা সংশোধন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

(খ) পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হবার আগেই পঞ্চায়েতগুলিতে নিয়মিতভাবে নির্বাচন করতে হবে।

(গ) কোনো কারণে পঞ্চায়েত ভেঙে গেলে সেখানে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে।

(ঘ) জনসংখ্যার অনুপাত অনুসারে তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত হবে এবং এই সংরক্ষিত আসনের এক-তৃতীয়াংশ তফশিলী জাতি ও উপজাতি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে।

(ঙ) পঞ্চায়েতের মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

(চ) প্রত্যেক রাজ্যে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে।

(ছ) পঞ্চায়েতগুলির আর্থিক অবস্থা খতিয়ে দেখতে এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশ করতে প্রতি ৫ বছর অন্তর একটি রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়েছে।

(জ) সংবিধানের ১১ নম্বর তফশিলে ২৯টি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে যেগুলি পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। কোনো রাজ্য সরকার ইচ্ছে করলে আরও কিছু উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত করতে পারে।

(ঝ) এলাকার অধিবাসীদের নিয়ে গ্রামসভা গঠন করতে হবে।

মূলত ৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইনের মাধ্যমে সরকারের কাজের ভার অনেকখানি কমিয়ে দিয়ে সেই ভার অর্পণ করা হয়েছে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের কাঁধে। ফলে গান্ধীজির 'মানুষের হাতে ক্ষমতা অর্পণ' (Power to the people)-এর লক্ষ্য অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়েছে এই সংশোধনী আইনরে মধ্য দিয়ে।

তবে অনেক সমাজবিজ্ঞানী ৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইনের কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। রজনীরঞ্জন ঝা প্রমুখের মতে, প্রাথমিক শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়, আর্থিক উন্নয়নের মতো বিভিন্ন কাজকে পঞ্চায়েতের অধিকারভুক্ত করা হলেও পঞ্চায়েতের হাতে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করার বিষয়টি সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে এ বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। অধ্যাপক ঝা মনে করেন যে এই ব্যবস্থা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নীতিগত ধ্যানধারণার পরিপন্থী।

৭২.৫ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা

পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার সময় পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার প্রসঙ্গ খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। এই অংশে আমরা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব।

সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মূল্যায়ন করে অনেক সমাজবিজ্ঞানী গ্রামোন্নয়নের একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শাসনক্ষমতার অধিষ্ঠিত বামফ্রন্ট

সরকার প্রথম থেকেই ভূমিসংস্কার (Land Reforms)-এর ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি গ্রামের রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিকাঠামো বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যও এই সরকারের ছিল।

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন পাস হলেও রাজ্যের গ্রামগুলির মোটামুটি অর্ধেক ১৯৬৩ সাল নাগাদ এই ব্যবস্থার আওতায় আসে। পঞ্চায়েত আইন প্রণয়ন করা হলেও তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। এর প্রধান কারণ হল, রাজনৈতিক এবং আমলাতান্ত্রিক সদিচ্ছার অনুপস্থিতি। সেই সময় গ্রামীণ অর্থনীতিতে এবং সমাজে ধনী চাষিদের অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল।

স্বল্প সময় ক্ষমতায় থাকলেও যুক্তফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে একটি সামগ্রিক আইন বিধানসভায় পেশ করে। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেস সরকার আবার ক্ষমতায় আসে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে তাঁরা ১৯৭৩ সালে পঞ্চায়েত আইন বিধানসভায় পাস করান। আইন হলেও পঞ্চায়েতগুলিকে তেমন কোনো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গেল না। তখন পঞ্চায়েতগুলিতেও নিয়মিত নির্বাচন হত না।

১৯৭৭ সালে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এলেন। বামফ্রন্ট সরকার মূলত চারটি লক্ষ্য মাথায় নিয়ে তাঁদের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করার কথা ঘোষণা করেন, সেগুলি হল :

(ক) গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করা।

(খ) নিয়মিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের বন্দোবস্ত করা।

(গ) শ্রেণিসম্পর্কের ভারসাম্য বদল করা।

(ঘ) আমলাতন্ত্রের আধিপত্য হ্রাস করা।

১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট গরিষ্ঠতা পায়। ঐ বছর থেকেই নির্দিষ্ট সময়ে রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহার এবং প্রতীকের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে নিয়মিত পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অনেক সমাজবিজ্ঞানীই পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। জি. কে. লিটন, নীলওয়েবস্টার প্রমুখদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা এবং অধিকারবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। অতুল কোহলির মতে, আগেকার গ্রামীণ ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর থেকে পশ্চিমবঙ্গের নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা। সেই সময় ভারতবর্ষের পঞ্চায়েতগুলি ধনী কৃষকের প্রভাবাধীন ছিল। পশ্চিমবঙ্গে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। তে. ওয়েস্টারগার্ডের অভিমত অনুযায়ী, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচিতে গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আবার অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্তার ব্যর্থতার দিকটিও তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রথম দিকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও এখন এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে নতুন এক আমলাতান্ত্রিক শ্রেণিরও আবির্ভাব হচ্ছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন। অনেকে আবার এই ব্যবস্থার দুরবস্থার জন্য সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অধঃপতনকেও দায়ী করেছেন।

এই সমস্ত সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও আমরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জীবনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সদর্থক ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারব না। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামগুলিতে একটি সামাজিক পরিবর্তন এনেছে। এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। তফশিলী জাতি, তফশিলী উপজাতি এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা পঞ্চায়েতে সুদূরপ্রসারী গুণগত সাংগঠনিক পরিবর্তন এনেছে যার ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। নিম্নবর্গের পুরুষ ও মহিলারা বর্তমানে ক্ষমতার অংশীদার হয়েছেন।

৭২.৬ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কার্যাবলী

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে আমাদের তিনটি স্তরে সেটিকে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেগুলি নিম্নরূপ :

৭২.৬.১ গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা মণ্ডল পঞ্চায়েতের কার্যাবলী

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রথম স্তরে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত (Gram Panchyat) অথবা মণ্ডল পঞ্চায়েত (Mandal Panchyat, অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী)। এদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং দায়িত্ব হল—জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, জন নিকাশ, পানীয় জল সরবরাহ, জলপথ রক্ষণাবেক্ষণ, জনপথের বেআইনি দখল বন্ধ, শ্মশান বা কবরখানার তত্ত্বাবধান, জঞ্জাল অপসারণ ইত্যাদি। অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে আছে—প্রাথমিক, সামাজিক বিষয়ক এবং কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা, পল্লী চিকিৎসালয়, পতিত জমিচাষের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং মাতৃ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, সেচ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ইত্যাদি। এছাড়াও ইচ্ছাধীন কর্তব্যগুলির মধ্যে কূপ, পুষ্করিণী ও দিঘি খনন, কুটিরশিল্পে উন্নয়ন, গ্রন্থাগার স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, বাজার স্থাপন, বৃক্ষাদি রোপন এবং সংরক্ষণ, আদমশুমারি, কৃষিপণ্য, বেকার ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলিল সংরক্ষণ, সরকারি ঋণ বণ্টন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৯২ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক এবং প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা, ক্ষুদ্রসেচ, সামাজিক বনসৃজন, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্প, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ ও বিদ্যুৎ বণ্টন ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। এছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণসাধন, বিশেষভাবে তফশিলী জাতি এবং উপজাতিদের কল্যাণসাধন প্রভৃতিও গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

৭২.৬.২ পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলী

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় অথবা মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি যা আবার মণ্ডল প্রজা পরিষদ (Mandal Praja Parishad) বা জনপদ পঞ্চায়েত (Janapada Panchayat) বা ক্ষেত্র সমিতি (Kshetra Samiti) নামেও পরিচিত। কৃষি, কুটিরশিল্প, গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য, প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং আর্থিক সাহায্য দান পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব। বিদ্যালয়, পাঠাগার স্থাপন, ত্রাণকার্য, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দান, গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট অনুমোদন হল পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। জেলাপরিষদ ও পঞ্চায়েতকে আর্থিক সাহায্য দান, ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করা প্রভৃতিও পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলীয় অন্তর্ভুক্ত।

৭২.৬.৩ জেলা পরিষদের কার্যাবলী

জেলা পরিষদ বা জেলা উন্নয়ন পরিষদ (District Development Council) বা জেলা প্রজা পরিষদ (Zilla Praja Parishad) হল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তর। জেলা পরিষদের কার্যাবলী হল কুটিরশিল্প, সমবায় আন্দোলন, কৃষি, পশুপালন, সেচ, জল সরবরাহ, যোগাযোগ, কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ, আর্তদের ত্রাণের ব্যবস্থা, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে অনুদান প্রদান। এ ছাড়াও অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে রাজ্য সরকার কর্তৃক ন্যস্ত কোনো প্রকল্প পরিচালনা, পঞ্চায়েত সমিতিসমূহ কর্তৃক প্রণীত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে পরামর্শদান, মহামারি প্রতিরোধ ইত্যাদি। এছাড়াও,

রাজ্য সরকার জেলা পরিষদের হাতে যে দায়িত্বভার অর্পণ করবে সেই দায়িত্ব পালন করা এর কর্তব্য। দুই বা ততধিক জেলা পরিষদ যুক্তি অনুযায়ী যে-কোনো উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। জেলা পরিষদ জেলার অধীনস্থ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কাজের তত্ত্বাবধান করে, জেলার অধীনস্থ পঞ্চায়েত সমিতির স্থাবর সম্পত্তি পরিদর্শন অথবা পঞ্চায়েত সমিতির নির্দেশে পরিচালিত কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করে। জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতির যে-কোনো বিভাগের কার্যাবলী কিংবা সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত যে-কোনো কার্যের অগ্রগতি ও পরীক্ষা এবং এই উদ্দেশ্যে কোনো আধিকারিক নিয়োগ করতে পারে।

১৯৯২ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে জেলা পরিষদ গ্রাম-পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে কোনো করণীয় বিষয় বিবেচনা, তথ্যপ্রদান, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো কার্য সম্পদানের নির্দেশদান কিংবা কোনো গ্রাম-পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি আইন অনুসারে কোনো কর, পথকর (টোল), অভিকর, ফি (Fee) সংগ্রহে ব্যর্থ হলে ঐ কর, পথকর, অভিকর এবং ফি ধার্যের জন্য নির্দেশ দিতে পারে। আইন অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সভা অনুষ্ঠিত না হলে সভা আহ্বানের জন্য জেলা পরিষদ নির্দেশ দিতে পারবে। জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে এবং তার সাহায্য নিয়ে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা নির্দেশ জারি করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য বেশিরভাগ রাজ্যেই পঞ্চায়েতের অধিকাংশ দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের গুরুভার অর্পণ করা হয়েছে দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী এবং তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তরের উপর। পশ্চিমবঙ্গেই উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর দায়িত্ব এবং কর্তব্য প্রথম বা সর্বনিম্ন স্তর অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

৭২.৭ ভারতবর্ষের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়ন

এতক্ষণ আমরা ভারতবর্ষে গ্রামীণ ক্ষমতার পরিকাঠামো হিসাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার যে আলোচনা করলাম তার থেকে এই সিদ্ধান্তেই হওয়া যায় যে কয়েকটি রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি) বাদ দিয়ে ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যেই পঞ্চায়েত আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। অনেক রাজ্যেই পঞ্চায়েতগুলিতে এখনও বৃহৎ ভূস্বামীদের আধিপত্য বর্তমান। পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নিয়মিত পঞ্চায়েত নির্বাচন অনেক রাজ্যেই হয় না। অনেক সমাজবিজ্ঞানী একমত যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং ভূমিসংস্কার কর্মসূচির সফল রূপায়ণের উপর ভিত্তি করেই শক্তিশালী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। জমির কেন্দ্রীভবন অটুট রেখে পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে ক্ষমত বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব নয়।

৭২.৮ সারাংশ

আমাদের এই আলোচনার মূল বিষয়বস্তুর সারাংশ করলে দাঁড়ায় যে—

ভারতবর্ষে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হল পঞ্চায়েত। এর উৎপত্তি ইতিহাস সুপ্রাচীন। বৈদিক এবং গুপ্তযুগে আমরা এই ব্যবস্থার কিছুটা আভাস পাই। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। গান্ধীজি এই ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষে গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। নানাকারণে এটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারেনি। এরপর এল বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটি। এই কমিটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতের কথা বলে। কিন্তু কমিটির সুপারিশগুলিকে প্রকৃত অর্থে বাস্তবায়িত করা যায়নি। এরপর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পুনর্গঠনের জন্য একে একে এল অশোক মেহতা কমিটি, জি. ভি. কে. রাও

কমিটি, এল. এম. সিংভী কমিটি ইত্যাদি। কিন্তু এদের প্রচেষ্টাও পরিপূর্ণ অর্থে সাফল্যলাভ করতে পারেনি। ৭৩তম সংবিধান সংশোধন বিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে নতুন করে সঞ্জীবিত করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও সামগ্রিকভাবে অন্যান্য রাজ্যের থেকে সাফল্যের হার বেশি ছিল।

ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তার বহু ও বিভিন্ন কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ মানুষের অবস্থা কিছুটা হলেও উন্নত করতে পেরেছিল। তবে তার ব্যর্থতাকেও কোনোমতেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

৭২.৯ অনুশীলনী

(১) **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :**

(ক) ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা কোন্ জাতীয়তাবাদী নেতা সর্বপ্রথম অনুভব করেছিলেন?

(খ) স্বাধীন ভারতে প্রথম ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিল কোন্ কমিটি?

(গ) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তিনটি স্তর কী কী?

(ঘ) অশোক মেহতা কমিটি (Ashok Mehta Committee) কত সালে গঠিত হয়েছিল?

(ঙ) ৭৩তম সংবিধান সংশোধন বিল কত সালে গৃহীত হয় এবং কত সালের অনুমোদিত হয়?

(২) **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন :**

(ক) স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

(গ) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোকপাত করুন।

৭২.১০ উত্তরমালা

(১) (ক) মহাত্মা গান্ধী; (খ) বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটি (Balwant Rai Mehta Committee) ; (গ) পঞ্চায়েত অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা মণ্ডল পঞ্চায়েত; পঞ্চায়েত সমিতি অথবা মণ্ডল প্রজা পরিষদ বা জনপদ পঞ্চায়েত বা ক্ষেত্র সমিতি; এবং জেলা পরিষদ বা জেলা প্রজা পরিষদ বা জেলা উন্নয়ন পরিষদ; (ঘ) ১৯৭৭ সালে; (ঙ) ১৯৯২ সালের ২২শে এবং ২৩শে ডিসেম্বর লোকসভা এবং রাজ্যসভায় গৃহীত হয় এবং ১৯৯৩ সালের ২৪শে এপ্রিল তা রাষ্ট্রপতির দ্বারা অনুমোদিত হয়।

৭২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Atul Kohli : *The State and Poverty in India : The Politcs of Reform; Orient Longman 1987.*

(২) G Palantithura (Ed) : *New Panchayati Raj System—Status and Prospect*; Kanishka Publishers, Distributors, 1996, New Delhi-110002.

(৩) Krishna Chakraborty and Swapan Kumar Bhattacharya : *Leadershi[, Fuctions and Panchayati Raj–A Case Study of West Bengal*; Rawat Publications, 1993.

(৪) Swapan Kumar Pramanik and Prabhat Dutta : *Panchayat and People–The West Bengal Experience*; Sarat Book House, 1996.

(৫) ডঃ অনিরুদ্ধ চৌধুরী : *ভারতের সমাজ প্রসঙ্গে*; চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০।

একক ৭৩ ☐ গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী

গঠন

৭৩.১ উদ্দেশ্য

৭৩.২ প্রস্তাবনা

৭৩.৩ গ্রামীণ উন্নয়নের বলতে কী বোঝায়?

৭৩.৪ গ্রামীণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর অভিমত

৭৩.৫ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি

৭৩.৫.১ সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী

৭৩.৫.২ বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটি—পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ

৭৩.৫.৩ নিবিড় কৃষি জেলা কর্মসূচি এবং নিবিড় কৃষি এলাকা কর্মসূচি : 'সবুজ বিপ্লব'

৭৩.৫.৪ সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি

৭৩.৫.৫ গ্রামীণ যুবগোষ্ঠীর স্বনিযুক্তির জন্য শিক্ষণ কর্মসূচি

৭৩.৫.৬ জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি

৭৩.৫.৭ গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি

৭৩.৫.৮ জওহর রোজগার যোজনা

৭৩.৫.৯ অষ্টম এবং নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি

৭৩.৫.১০ ভূমি সংস্কার

৭৩.৫.১১ সমবায়

৭৩.৬ গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সার্বিক মূল্যায়ন

৭৩.৭ সারাংশ

৭৩.৮ অনুশীলনী

৭৩.৯ উত্তরমালা

৭৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৭৩.১ উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে সাধারণ দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচির (Rural Development Programme) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। এই এককটি পাঠের মাধ্যমে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচার-বিশ্লেষণে সক্ষম হবেন এবং সমাজতত্ত্বের গবেষণাভিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে এইগুলির সার্থক এবং যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে সমর্থ হবেন :

- গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে প্রকৃত অর্থে কী বোঝানো হয়;
- গ্রামীণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন ভারতীয় মনীষীর অভিমত;
- স্বাধীতা-উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি;
- গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহের সামগ্রিক মূল্যায়ন।

৭৩.২ প্রস্তাবনা

আমরা পর্ববর্তী এককে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো হিসাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিয়ে পুর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ উন্নয়ন এবং বিকাশের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এরই সূত্র ধরে বর্তমান এককে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বিশ্বে দরিদ্র শ্রেণির একটি বৃহৎ অংশ ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বসবাস করে থাকে। নানা ধরনের সামাজিক সমস্যায় তারা জর্জরিত। ভারতবর্ষে এই দরিদ্র মানুষের অবস্থার কথা, তাদের সমস্যার কথা ধ্বনিত হয় স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীষীদের কণ্ঠে। তাঁদের চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি হিসাবে সূত্রপাত ঘটে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির। এই কর্মসূচিগুলির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সাফল্য বা ব্যর্থতার খতিয়ান সম্পর্কিত আলোচনাকেই হল বর্তমান এককের মূল বিষয়বস্তু।

৭৩.৩ গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?

বর্তমানে ভারতবর্ষে সহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি (Developing countries) যে ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে যে সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে গ্রামীণ উন্নয়ন (Rural Development) একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সমস্ত দেশগুলির বেশিরভাগ মানুষই আজ দারিদ্র্য (poverty), অপুষ্টি (malnutrition) অশিক্ষা (illiteracy), অসুস্থতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ (unhealthy) ইত্যাদির শিকার। দারিদ্র্যসহ এই সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধারকল্পে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বিশেষত গ্রামীণ এলাকাগুলিতে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

'উন্নয়ন' এমন একটি ধারণা যেটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়। উন্নয়ন বলতে সাধারণ অর্থে বোঝায় যে পার্থিব অথবা বস্তুগত সম্পদসমূহ (material resources)-এর উৎপাদন এবং সেগুলির যথার্থ ব্যবহার অথবা মানবিক সম্পদসমূহের (Human resources) সমৃদ্ধিকরণ। পার্থিব বা বস্তুগত সম্পদের উৎপাদন বলতে বোঝায় উন্নয়নের সঙ্গে যে অর্থনৈতিক উপাদানগুলি (economic factors) জড়িত সেগুলিকে। আর মানবিক সম্পদের সমৃদ্ধিকরণ বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক উপাদন ব্যতীত অন্যান্য উপাদানসমূহ যেমন মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতিগত বা শিক্ষাগত পটভূমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে গ্রামীণ এলাকাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে বস্তুগত এবং মানবিক সম্পদসমূহের যথার্থ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নকেই বোঝানো হয়।

আমাদের দেশের সার্বিক বিকাশের জন্য গ্রামীণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই অনুভূত হয়েছিল।

৭৩.৪ গ্রামীণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর অভিমত

স্বাধীনতা লাভের অনেক আগে থেকেই গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। যেসব মনীষীর চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে স্বাধীনতার পূর্বে গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গড়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধী।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রামীণ উন্নয়ন চিন্তার মূল ভিত্তি ছিল মানুষের সেবা এবং কর্মযোগ। দলিত, অবহেলিত এবং পীড়িত মানুষকে তিনি শিব জ্ঞানে গ্রহণ করেছেন এবং মানুষের সেবা ছিল তার কাছে ঈশ্বরের উপাসনা। ভারতের উন্নয়ন বলতে তিনি বুঝতেন সার্বিক উন্নয়ন। স্বামীজি শিক্ষার প্রসারকে সকল জাগতিক সমস্যার সমাধানের পথ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং জনশিক্ষা প্রসারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, জনশিক্ষার মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হবে, নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হবে এবং সর্বোপরি অবস্থার উন্নতি ঘটানো ও প্রয়োজন মেটাবার উপায় নিজেরাই স্থির করবে। কিন্তু তিনি যথার্থই বুঝেছিলেন যে জনশিক্ষা প্রসারের মূল বাধা হল দারিদ্র্য। স্বামীজির অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক চিন্তাগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল নারীজাতির উন্নয়ন। স্বামীজির উন্নয়নমূলক চিন্তাধারা এখন পর্যন্ত ভীষণভাবেই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু মূল ঘাটতি হল এই সমস্ত চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং তা কাজে পরিণত করা। বিবেকানন্দের চিন্তায় জাতীয় উন্নয়ন ঘটতে পারে সকল শ্রেণি ও সকল ধর্মের মানুষের সমন্বয়ের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরও পল্লী উন্নয়নে সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। ভারতবর্ষের গ্রামগুলির দুর্দশার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি দারিদ্র্যের ওপরই বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, বিচ্ছিন্নতা এবং ভরসাহীনতাই গ্রাম তথা দেশের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ। সার্বিক বিকাশের জন্য তাই প্রয়োজন ভরসা দেওয়া এবং মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা। পল্লী পুনর্গঠনের লক্ষ্যে নিজের চিন্তাধারাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে একদিকে শিক্ষা ও অন্যদিকে কর্মের ক্ষেত্র হিসাবে শ্রীনিকেতনে তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করার জন্য একটি বা দুটি গ্রামের ওপর সমস্ত শক্তি প্রয়োগের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি পল্লী পুর্নগঠনের কাজে কোনোও বাইরের সাহায্য নেওয়া পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন যে গ্রামের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই গ্রামের উন্নয়ন সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের মূল ভিত্তি হল ঈশ্বর পূজার সাথে মানবসেবাকে একাত্ম করা। ভগবানে উপাসনা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা মোচন করা। গ্রামোন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য হল এটাই।

মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মূল কেন্দ্রেই রয়েছে গ্রামোন্নয়ন এবং স্বরাজ অর্জন। তাঁর মতে গ্রামোন্নয়নের মূল ভিত্তিই হল স্বনির্ভরতা। হরিজন পত্রিকায় (৩০ শে নভেম্বর, ১৯৩৪) তিনি বলেছেন যে, লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীকে কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য সনাতন শিল্প পদ্ধতিই গ্রহণ করা উচিত। এইজন্য তিনি গ্রামোন্নয়নের জন্য খাদি ও চরকার প্রচলনের কথা বলেছেন। তাঁর আদর্শ ছিল বেশি মানুষকে উৎপাদনশীল কাজের সুযোগ দেওয়া। গান্ধীজির অভিমত অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশের দুর্দশার মুল কারণ অভাব নয়, আলস্য। তিনি গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে আর্থসামাজিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা একসাথে অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, গ্রামীণ শিল্পকে জাগ্রত করে এবং কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করা যেতে পারে। গান্ধীজির অর্থনৈতিক চিন্তার মূলে ছিল গ্রামের মানুষের দুর্দশা ও তার নিরসন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, গ্রামীণ ভারতের উন্নতি ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৭৩.৫ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি

গ্রামোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীষীরা যে সমস্ত অভিমত ব্যক্তি করেছিলেন সেগুলির বাস্তবায়ন ঘটতে থাকে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি (Rural Development Programmes) গ্রহণের মাধ্যমে। এই অংশে আমরা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করব।

৭৩.৫.১ সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি

স্বাধীনতার পরে গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচি প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতেই এসে যায় সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি (Community Development Programme)। এই প্রসঙ্গে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি পূর্ববর্তী এককে (গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো : পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা)। এখানে আমরা সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করব।

সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তনের আগে প্রাক্-পরিকল্পনাকালে যে দুটি গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল, সেগুলি হল ১৯৪৮ সালে গৃহীত নিলোখরি প্রকল্প এবং অ্যালবার্ট মেয়ারের এটাওয়া প্রকল্প। নিলোখেরি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু পরিবারের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা। এই প্রকল্পের নীতি ছিল গ্রামীণ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুরূপে একটি কৃষি-শিল্পপণ্যোৎপাদক নগর গড়ে তোলা। এটাওয়া প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পভিত্তিক উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নতিসাধন। এই প্রকল্প গ্রামের মানুষের মধ্যে আগ্রহ, স্বনির্ভরতা এবং সহযোগিতার মনোভাব তৈরির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। এই প্রকল্পের জনক অ্যালবার্ট মেয়ার গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বদাই আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রীকরণের ওপর জোর দিয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালে গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে আর একটি পদক্ষেপ হল ওয়াটজারের ভারতীয় গ্রামীণ পরিষেবা (Indian Village Services)। এই কর্মসূচি উত্তরপ্রদেশেই গৃহীত হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের মানুষের দ্বারাই গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করা।

এইসব পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতেই ১৯৫২ সালে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি (Community Development Programme) গ্রহণ করা হয় যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের গ্রামীণ এলাকার সর্বাধিক উন্নতি ঘটানো। এই কর্মসূচিকে ধরা হয়েছে জনগণের আন্দোলন হিসাবে, যাতে মুখ্য রূপকার জনগণ নিজেরাই। সরকার এই কাজে নেতৃত্ব দেবে।

সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির চারটি উদ্দেশ্য ছিল : (১) মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটানো, (২) গ্রামীণ মানুষের মধ্যে স্বনির্ভরতার মানসিকতার অনুপ্রবেশ ঘটানো, (৩) জনগণের নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে সকলের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করা এবং (৪) এই তিনটি উদ্দেশ্যের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নতুন চিন্তা, শক্তি এবং আশার সঞ্চার ঘটানো।

সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির রূপরেখায় উন্নয়নের ভিত্তি করা হয়েছিল অঞ্চলকে। আঞ্চলিক প্রশাসনের দায়িত্বে থাকবেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (Block Development Officer বা সংক্ষেপে B.D.O)। তাঁকে সহায়তা করবেন কৃষি, পশুপালন, শিক্ষা, সমবায় প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আধিকারিকরা। গ্রামোন্নয়নের গ্রামসেবকদের প্রধান দায়িত্ব হবে গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে প্রশাসনের সংযোগসূত্র বজায় রাখা এবং অঞ্চলের আধিবাসীদের উন্নয়ন কর্মসূচিতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু উন্নয়নে গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বলা হলেও বাস্তবে আমলাতান্ত্রিক গ্রামোন্নয়ন ব্যবস্থাই গড়ে তোলা হয়। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে কোনো সমন্বয় গড়ে উঠল না।

৭৩.৫.২ বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটি—পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ

এই বিষয়ে পূর্ববর্তী এককে (গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো : পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা) সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করা হল।

স্বাধীনতা পরবর্তী দশকগুলিতে গ্রামোন্নয়ন খাতে প্রচুর অর্থব্যয় করা হলেও তাতে বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) কালের সমাপ্তির সাথে সাথেই সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচিরও পাঁচ বছর পূর্ণ হয়। কিন্তু এই কর্মসূচির আশানুরূপ সফলতা লাভ না করার কারণ খতিয়ে দেখতে তৈরি হয়

বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটি (Balwant Rai Mehta Committee)। এই কমিটির মতে, আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামোর গ্রামোন্নয়ন অসম্ভব। গ্রামের মানুষকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শরিক করতে হবে। প্রতিনিধিত্বমূলক এবং গণতান্ত্রিক উন্নত প্রশাসন ছিল এই কমিটির মূল সুপারিশ। কমিটির প্রতিবেদন আরও বলা হয়েছিল যে প্রতিনিধিত্বমূলক এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানটি যেন অতিরিক্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণের চাপে সঙ্কুচিত না হয়। স্থানীয় স্তরে কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণে পূর্ণ ক্ষমতা হাতে থাকলেই এই প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। তৃণমূলে সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণও এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই করতে হবে।

গণ উদ্যোগকে গ্রামোন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করার উদ্দেশ্যেই বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ করেছিল। এই সুপারিশ অনুসারে ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান গঠিত হতে শুরু করে।

৭৩.৫.৩ নিবিড় কৃষি জেলা কর্মসূচি এবং নিবিড় কৃষি এলাকা কর্মসূচি : 'সবুজ বিপ্লব'

ষাটের দশক থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন অনগ্রসর দেশগুলিতে গুরুতর খাদ্যসংকট দেখা দেয়। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেই সময় একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে খাদ্যসংকট একটি চরম আকার ধারণ করেছে এবং এই সমস্যার অবিলম্বে সমাধান না করলে চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেবে। এই কারণেই ষাটের দশকের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ওপর জোর দেওয়া হয়।

এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৬০-৬১ সালে নিবিড় কৃষি জেলা কর্মসূচি (Intensive Agricultural District Programme বা I.A.D.P) শুরু হয়। প্রথমে তিনটি জেলায় এই কর্মসূচি শুরু হলেও পরে আরও তেরোটি জেলার এর কার্যপরিধিকে বিস্তৃত করা হয়। জেলা কর্মসূচিটির মূল লক্ষ্য ছিল কতকগুলি নির্দিষ্ট ফসলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া। দেশের সমগ্র অংশে উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বিস্তৃত না করে দ্রুত অধিক সুফল লাভ করার জন্য নিবিড় কৃষি উৎপাদন প্রচেষ্টার মাধ্যমে কয়েকটি নির্বাচিত এলাকায় এই কর্মসূচি গৃহীত হয়। নিবিড় কৃষিজেলা কর্মসূচির অন্তর্গত জেলাগুলিতে উচ্চ ফলনশীল খাদ্যশস্য চাষ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল নতুন কৃষি কারিগরি পদ্ধতির প্রয়োগ। এই কর্মসূচিতে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল ধান, গম এবং জোয়ার উৎপাদনের ওপর। এই কর্মসূচির দ্বিতীয় বছরের মূল্যায়ন থেকে দেখা যায় যে কর্মসূচিটি মূলত সরকারি প্রশাসনের সাহায্যে রূপায়িত হয়েছে, সাধারণ মানুষের সাথে এর তেমন কোন যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি।

কৃষি উন্নয়নকে আরও জোরদার করার জন্য নিবিড় কৃষি জেলা কর্মসূচির থেকে নিবিড়তম কর্মসূচি চালু করা হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নিবিড় কৃষি এলাকা কর্মসূচি (Intensive Agricltural Area Programme বা সংক্ষেপে I.A.A.P)। এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল নির্বাচিত এলাকায় উৎপাদনমুখী সবরকম সহায়তার মাধ্যমে প্রধান প্রধান ফসলগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি। মোটামুটিভাবে এই দুটি কর্মসূচির রূপায়ণ পদ্ধতি ছিল প্রায় একই রকম। যদিও উভয়ের লক্ষ্য ছিল নিবিড় কৃষি উন্নয়ন বাস্তব করা, কিন্তু কর্মসূচি দুটিতে যেসব ফসল নেওয়া হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে সারের প্রয়োগে খুব একটা উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়নি। ফলে নিবিড় কৃষি উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়।

যাই হোক, বৃহৎ জমির মালিক ধনী চাষিদের স্বার্থ বিঘ্নিত না করে এবং ভূমিসংস্কারকে সযত্নে এড়িয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সূচনা হল সবুজ বিপ্লব (Green Revolution)-এর। অধিক ফলনশীল বীজ, জলসেচ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক নিবিড় চাষের দ্বারা কৃষি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়। কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনায় 'বিত্তবান' কৃষকদের 'প্রগতিশীল' কৃষক হিসাবে চিহ্নিত করে, ভর্তুকির সাহায্যে তাঁদের প্রযুক্তিগত এবং পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করে, ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে বৃহৎ জমির মালিকদের জন্য অর্থের সংস্থান করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা হল। কিন্তু এই উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগসুবিধা সাধারণ গরিব চাষিরা ভোগ করতে পারেনি। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণত হিসাবে অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের জীবনমান তো বাড়েইনি বরং আঞ্চলিক অসাম্য এবং শ্রেণি বৈষময বৃদ্ধি পায়।

৭৩.৫.৪ সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি

সত্তরের দশকের শেষের দিকে ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য এবং ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি রোধ করতে তৈরি হল লক্ষ্যবস্তু ভিত্তিক (Target-oriented) দ্রারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি। ষষ্ঠ পরিকল্পনার মূল্য লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ। এই সময় বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়। ডঃ অংশুমান বসু এবং ডঃ দিলীপ কুমার ঘোষের মতে, গৃহীত কর্মসূচিগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

(১) গ্রামের গরিব মানুষদের সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি;

(২) অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য বিশেষ এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি;

(৩) সম্পূরক আয়ের জন্য মজুরিভিত্তিক কর্মসূচি।

প্রথম স্তরের কর্মসূচির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'সুসংসহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি' (Integrated Rural Development Programme–IRDP)। ১৯৭৬-৭৭ সালের কেন্দ্রীর বাজেটে এই বিস্তৃত এবং পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি প্রস্তাবিত হয়। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, স্বনিযুক্তির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলির কর্মসংস্থান করা এবং আয় বৃদ্ধি করা। ১৯৮০ সালে দেশের মোট ৫:০১১টি ব্লক এলাকায় এই কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষি, কৃষি শ্রমিক, ভূমিহীন পরিবারবর্গ, গ্রামীণ কারিগর শ্রেণি এবং অন্য বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির দরিদ্র মানুষ।

এই দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং এটিকে সঠিকভাবে প্রণয়নের দায়িত্ব কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার—উভয়েরই। জেলা স্তরে সার্বিক গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্বে আছে 'জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা' (District Rural Development Agency বা সংক্ষেপে DRDA)। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরের দায়িত্ব অবশ্য সংশ্লিষ্ট সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দফতরের, কিন্তু কর্মসূচি রূপায়ন বা বাস্তবায়িত হয় জেলা এবং ব্লক স্তরে। ব্লক স্তরে এই কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব বর্তায় 'ব্লক উন্নয়ন অফিস'-এর ওপর। সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবারকে উন্নয়নের মূল একক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় অনেক পরিবারকেই উন্নয়নের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়।

সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যাবলী নিয়ে জাতীয় এবং রাজ্য স্তরে যোজনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন সংস্থা (Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission বা PEO), ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reseve Bank of India বা R.B.I), জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (National Bank for Agriculture and Rural Development বা NABARD), আর্থিক পরিচালন গবেষণা সংস্থা (Institute of Financial Management and Reserch বা IFMR) প্রভৃতি সংস্থা সমীক্ষা চালান। এই সমীক্ষায় দেখা যায় যে উপকৃত (Beneficiary) বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে গড়ে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ পর্যন্ত ভুল বাছাই হয়েছে। কোথাও কোথাও সত্তর পর্যন্ত ভুল বাছাই হয়েছে। পরিবারভিত্তিক প্রকল্প (scheme) বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উপকৃতদের কর্মদক্ষতা সঠিকভাবে বিচার করা হয়নি। গ্রামের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই প্রকল্পের সিংহভাগ সুবিধা ভোগ করেছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের ইপ্সিত লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

৭৩.৫.৫ গ্রামীণ যুবগোষ্ঠীর স্বনিযুক্তির জন্য শিক্ষণ কর্মসূচি

সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল স্বনিযুক্তির উদ্দেশ্যে গ্রামীণ যুবগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষণ কর্মসূচি (Training of Rural Youth for Self Employment বা TRYSEM)। ১৯৭৯ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে এই কর্মসূচি শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ এলাকার যুবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন বৃত্তি ও কারিগরিতে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা এবং নতুন দক্ষতার সাহায্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আগ্রহী এবং সক্ষম করে তোলা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ট্রাইসেমের লক্ষ্যমাত্রা হল সারা দেশে প্রতি বছর দু লক্ষ যুবক-যুবতীকে (ব্লক প্রতি বছরে ৪০ জন) বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা প্রদান করা। অবশ্য যেসব যুবক-যুবতী কোনও বিষয়ে ইতিমধ্যে দক্ষতা আছে, সেই দক্ষতার উন্নতি ঘটানোও এই কর্মসূচির অন্তর্গত। ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের দরিদ্র পরিবারের যুবক-যুবতীরা ট্রাইসেমের আওতায় আসবেন। কর্মসূচি রূপায়ণের সময় আরোপিত শর্ত হল শিক্ষার্থী বেং শিক্ষাপ্রাপকদের মধ্যে অন্তত শতকরা ৩০ শতাংশ তফশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত পরিবারের সদস্য হবেন এবং অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মহিলা হবেন।

ট্রাইসেম প্রকল্প রূপায়ণের মূল দায়িত্ব জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার হলেও জেলা শিল্প কেন্দ্রগুলির এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজনের কথা সরকারি আদেশনামায় উল্লিখিত আছে। এই শিল্পকেন্দ্রগুলির কাজ হল কারিগরী উপদেশ এবং পরামর্শদান, প্রকল্প রচনা ও পরিচালনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞের কাজ করা এবং প্রকল্পকে চালু রাখার জন্য উপযুক্ত সাহায্যদান করা। প্রথমদিকে ট্রাইসেম কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীর স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মে নিয়োজিত করা। কিন্তু স্বনিযুক্তি প্রকল্পে নিযুক্ত হওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব না হওয়ায় ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার যুবক-যুবতীর স্বনিযুক্তি এবং মজুরিভিত্তিক উভয় কাজেই নিয়োজিত হওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, যেহেতু মূল লক্ষ্য আয় এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৭৩.৫.৬ জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি (National Rural Employment Programme বা N.R.E.P) ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে প্রবর্তিত হয় এবং পরের বছরে অর্থাৎ ১৯৮১ সাল থেকেই আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধারাবাহিক প্রকল্প হিসাবে গৃহীত হয়। প্রথমে এই কর্মসূচির নাম ছিল 'কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচি' (Food for Work Programme বা FFWP)। ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাস থেকেই এই কর্মসূচি এন. আর. ই. পি. নামে পরিচিত হয়।

এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হল গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। এই সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আরো কিছু উদ্দেশ্য পূরণ করা যেতে পারে। সেগুলি হল : (১) সকল শ্রেণির কর্মহীন গ্রামীণ মানুষের জন্য অতিরিক্ত লাভজনক কর্ম সৃষ্টি করা; (২) দরিদ্র শ্রেণির মানুষের প্রত্যহ কাজে লাগে এমন উৎপাদনক্ষম সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে কাজ জুগিয়ে গ্রামীণ বেকারত্বের চাপ কমানো; (৩) কর্ম সৃষ্টির সাথে সাথে গ্রামীণ অর্থনীতির পরিকাঠামো মজবুতভাবে গড়ে তোলা, যাতে ভবিষ্যতে এই সম্পদের ব্যবহার স্থায়ী কর্মসৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে পারে এবং (৪) গ্রামীণ জীবনধারণের মানকে উন্নত করা।

জেলাস্তরে এই কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 'জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা' (District Rural Development Agency বা DRDA)-কে। কেন্দ্রীয় পোষিত কর্মসূচি হিসাবে এন. আর. ই. পি. রূপায়ণের ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি ৫০ : ৫০ এই আনুপাতিক হারে বহন করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়।

এন. আর. ই. পি কর্মসূচির সমগ্র ব্যয়বরাদ্দের শতকরা দশভাগ হরিজন, তফশিলী জাতি এবং উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য সংরক্ষিত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী নির্দেশ জারী হয়েছে। ব্যয়বরাদ্দের আরো দশভাগ সংরক্ষিত রাখার কথা সামাজিক বনসৃজন এবং জ্বালানি কাঠের বৃক্ষরোপণের জন্য। এইসব ছাড়াও গ্রামীণ মহিলাদের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে কর্মসূচির সাথে সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব পরিকল্পনায় ছিল।

৭৩.৫.৭ গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি

গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (Rural Landless Employment Guarantee Programme বা R.L.E.G.P) ১৯৮৩ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে প্রবর্তিত হয়। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল—(১) গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান সুযোগের উন্নতিসাধন এবং বিস্তৃতিকরণ যাতে প্রতি ভূমিহীন পরিবারের অন্তত একজন সদস্য বছরে একশো দিন পর্যন্ত কাজ পেতে পারেন এবং (২) গ্রামীণ অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাবার জন্য স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা। এর উদ্দেশ্য হল স্থায়ী সম্পদের সাহায্যে দীর্ঘস্থায়ী এবং অবিরত কর্মসৃষ্টি করা যাতে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি এবং জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচির মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য সামান্যই।

কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা রূপায়ণের জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল। এই কর্মসূচির রূপায়ণের দায়ভার ন্যস্ত করা হয় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারের ওপর। সামাজিক বনসৃজন, ক্ষুদ্রসেচ, ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি ছিল এই কর্মসূচির অন্তর্গত অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে উৎপাদনক্ষম প্রকল্পের কিছু উদাহরণ।

কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচির প্রারম্ভিক দুই বছরে আশানুরূপ না হলেও কর্মসূচির বিভিন্ন দিক বিচারে আশা করা হয়েছিল যে এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণ স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা যাবে এবং একই সাথে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোরও উন্নতি করা যাবে।

৭৩.৫.৮ জওহর রোজগার যোজনা

এন. আর. ই. পি. এবং আর. এল. ই. জি. পি.—এই দুইটি কর্মসূচিকে একত্র করে ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে জওহর রোজগার যোজনা (Jawahar Rozgar Yojna বা J.R.Y.) ঘোষিত হয়। এই কর্মসূচিতে আশা করা হয় যে প্রত্যেক দরিদ্র পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্যের জন্য তাঁর বাসস্থানের কাছাকাছি বছরে ৫০ থেকে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান করা হবে। এই কর্মসূচিতে ৩০ শতাংশের মতো কাজ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সাহায্যের ভাগ ৮০ শতাংশ। গ্রাম পঞ্চায়েরে মাধ্যমে এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়। অষ্টম পরিকল্পনায় আনুমানিক ৩০,০০০ কোটি টাকা গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল যার মধ্যে জওহর রোজগার যোজনা পেয়েছিল প্রায় ১৮,৪০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা ছাড়াও এই যোজনা রাজ্য সরকারের থেকেও প্রায় ৪০০ কোটি টাকার মতো পায়। ভারতীয় জনগণের ৪৬ শতাংশকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) সময়সীমার মধ্যেই এই রোজগার প্রকল্প ঘোষিত হয়েছিল।

৭৩.৫.৯ অষ্টম এবং নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিলে গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচির ব্যর্থতার জন্য মূলত প্রশাসনিক দুর্বলতাকেই দায়ী করা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালের জি. বি. কে. রাও কমিটির রিপোর্টে প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এই কারণে পঞ্চায়েতের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করার কথা বলা হয় এর মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষ গ্রামোন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ডঃ অংশুমান বসু এবং দিলীপ কুমার ঘোষের মতে, বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও

এইক্ষেত্রে এখানো পর্যন্ত আশানুরূপ কোনো ফল পাওয়া যায়নি। তাঁদের মতে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে সদর্থক করে তোলার জন্য সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে অনেক বেশি গুণসম্পন্ন করা প্রয়োজন এবং প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে জনমুখী করা প্রয়োজন। এ কথা মাথায় রেখেই অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯২২-৯৭) গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং জনগণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মানব সম্পদ উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য ও কর্মসৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনায় গ্রামীণ মহিলাদের জন্য সম্পূরক আয় সৃষ্টির প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মন্ত্রীসভার অনুমোদন পায় ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে। কৃষি, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং পরিকাঠামোগত উন্নতিকেই এই পরিকল্পনার মূল্য লক্ষ্য করা হয়। কৃষির উন্নতির জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। নবম পরিকল্পনাকারে অনেকে পরিষেবা উন্নয়নভিত্তিক পরিকল্পনা হিসাবে অভিহিত করে থাকেন।

দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনায় বিশেষভাবে পরিকল্পিত কর্মসূচিগুলি ছাড়াও গ্রামোন্নয়নের কাজে স্বাধীনতার পর থেকে বিস্তৃত ভূমিসংস্কার এবং সমবায় উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

৭৩.৫.১০ ভূমিসংস্কার

ভূমিসংস্কার (Land Reform) গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে, উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে, সম্পদহীন দরিদ্রের হাতে সম্পদ এবং আত্মবিশ্বাস যোগাতে, অর্থনৈতিক অসাম্য কমাতে এবং সর্বোপরি গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করতে ভূমিসংস্কার পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ভূমিসংস্কার কর্মসূচির বিষয়বস্তু হল—(১) মধ্যস্বত্ব (Intermediary tenures) প্রথার বিলোপ; (২) জমির ভোগদখল বা স্বত্ব সংক্রান্ত নীতির সংস্কারখাতে আছে এমন খাজনার নিয়ন্ত্রণ, ভোগসত্বের সংরক্ষণ (Security of tenures) এবং প্রজাদের মালিকানা স্বত্ব প্রদান (Conferment of ownership right) (৩) জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ এবং উদ্বৃত্ত জমির বণ্টন; (৪) পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে জোতের একত্রীকরণ বা দৃঢ়ীকরণ (Consolidation of holdings) এবং (৫) ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সংকলন এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে তার হালনাগাদীকরণ (Updating of land records)।

ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধান কাজ হল আরে পরিকল্পনাগুলিতে গৃহীত এবং অবলম্বিত কর্মসূচির যথাযথ রূপায়ণ। এই পরিকল্পনাকালে এইসব কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য যে সম্ভাব্য সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

(ক) ১৯৮১-৮২ সালের মধ্যে সকল রাজ্যে প্রজাদের মালিকানা প্রদান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা।

(খ) উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ এবং বণ্টন পরিকল্পনা সূচনার দুই বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮২-৮৩ সাল নাগাদ শেষ করা।

(গ) জমি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সংকলন এবং হালনাগাদকরণ ষষ্ঠ পরিকল্পনার পাঁচ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সমাপ্ত করা। যেসব রাজ্যে এই সংক্রান্ত কাজে অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে এবং যার ফলে আধুনিকীকরণের কাজ অনেক জমে গেছে সেইসব রাজ্যে সমীক্ষার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আকাশপথে সমীক্ষা করার প্রয়োগ কৌশল অবলম্বন করা।

(ঘ) পুনর্বিন্যাসের সাহায্যে জোতের একত্রীকরণ এবং সংযুক্তিকরণের (consolidation of holdings) কাজ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে গ্রহণ করা এবং এই কাজ ষষ্ঠ পরিকল্পনার সূচনাবছর থেকে পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে শেষ করা। এই কাজে সেচযুক্ত এলাকায় অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ষষ্ঠ পরিকল্পনাতে বলা হয়েছে। সেচসেবিত এলাকায় এই কাজের জন্য সময়সীমা তিন থেকে পাঁচ বছর ধার্য করা হয়েছে।

উদ্বৃত্ত জমিপ্রাপকদের আর্থিক সহায়ক দেওয়ার জন্য ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে একটি নতুন কর্মসূচির প্রবর্তন হয়। এই কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতি হেক্টর জমির জন্য ২,৫০০ টাকা পর্যন্ত সাহায্যদানের ব্যবস্থা আছে। এর কারণ হল সিলিং বহির্ভূত ন্যস্ত জমি বহুক্ষেত্রেই চাষের উপযোগী হয় না। তাই ভূমিহীন চাষি এই জমি চাষযোগ্য করার জন্য, জমির উন্নয়ন করতে অথবা চাষের উপকরণ সংগ্রহ করতে বা নিজের আশু প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রাপ্ত সাহায্য ব্যয় করতে পারেন। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই কর্মসূচির জন্য কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে ৩০ কোটি টাকার বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে এবং একই পরিমাণ অর্থ রাজ্যগুলিরও দেওয়ার কথা। কিন্তু এই কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহারের পরিমাণ অত্যন্ত কম। কারণ রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সমপরিমাণ টাকা ব্যয়ের জন্য ছাড়েননি এবং কেন্দ্র কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার সংক্রান্ত কোনো প্রতিবেদনও কেন্দ্রকে পাঠাননি। সুসংহত বা সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি, জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি এবং গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ইত্যাদি গ্রামোন্নয়নের অন্যান্য কর্মসূচির সাথে উদ্বৃত্ত জমিপ্রাপকদের সহায়তা কার্যসূচির কোনো সংযোগ অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় না। ভূমিসংস্কার তাই অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক কর্মসূচির স্থান গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৭৩.৫.১১ সমবায়

গ্রামীণ এলাকায় সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের তথা অনুন্নত শ্রেণির মানুষের আর্থিক উন্নয়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনার সাথে সাথেই প্রয়োজনীয় গুরুত্ব লাভ করেছে। পরিকল্পনা রচয়িতাদের মতে সমবায়ের ওপর ভিত্তি করে দৃঢ় এবং স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজ গঠন করা সম্ভব। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে এই কর্মসূচি স্বাভাবিকভাবেই যথোচিত গুরুত্ব পায়। সমবায় আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ এই পরিকল্পনা পর্বে গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি হল :

(ক) প্রাথমিক গ্রামস্তরের সমবায় সমিতিগুলি (Primary Village Societies) যাতে সর্বার্থসাধক এবং বহু উদ্দেশ্যমূলক প্রতিষ্ঠানরূপে উন্নীত হতে পারে তার জন্য এক সুপরিকল্পিত কর্মসূচির প্রস্তাবনা করা হয়েছে।

(খ) বর্তমান সমবায় আইন এবং নীতির পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে আইন ও নীতির যথাযথ পরিবর্তন সাধন যাতে সমবায় প্রচেষ্টায় গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণির মানুষের দারিদ্র্য মোচন করা যায়।

(গ) সমবায়ভিত্তিক সংঘবদ্ধ সংস্থাগুলির কর্মপদ্ধতি পুনরায় স্পষ্ট করে নির্দেশিত করা এবং দৃঢ় করা যাতে এই সংস্থাগুলি তাদের প্রাথমিক স্তরের সংস্থার মাধ্যমে দ্রুত কৃষি, পশুপালন, তুঁত চাষ, মৎস চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রের উৎপাদনশীল প্রকল্পকে ঋণদান, কাঁচামাল সরবরাহ, বিপণন এবং অন্যান্য পরিষেবা দিয়ে সহায়তা করতে পারে।

(ঘ) সমবায় সমিতির সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত মানব সম্পদ সংগ্রহ এবং যথাযথ পেশাদার কর্মচারীর ব্যবস্থা করা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সমবায় ক্ষেত্রের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যৌথ বরাদ্দ ছিল ৯১৪.২৩ কোটি টাকা। প্রধানত, সমবায় সংস্থাগুলির মূলধনের ভিত্তিকে দৃঢ় করা এবং আরও বেশি ও ফলপ্রসূ পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য এই টাকা ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু সমবায়ের উন্নয়ন এবং কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে পরিচালন ব্যবস্থা এবং নেতৃত্বের গুণগত মানের ওপর। যদিও সমবায়ের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং প্রকল্পে পরিমাণগতভাবে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তথাপি কিন্তু ক্ষেত্রে অগ্রগতি শ্লথ এবং বিপরীতগামী।

৭৩.৬ গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সার্বিক মূল্যায়ন

অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পার করে অনেকগুলি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বড়ো বড়ো প্রকল্প রূপায়িত করবার পরেও গ্রামোন্নয়ন ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করা যায়নি। গ্রামীণ পরিকাঠামোর তুলনামূলকভাবে উন্নতি হয়েছে, উন্নত পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে, কৃষি উৎপাদনে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান তেমনভাবে উন্নত হয়নি। অনেকেই তাই একে সঠিক অর্থে গ্রামোন্নয়ন বলে গ্রহণ করতে রাজি নন।

ভূমিসংস্কার যে গ্রামোন্নয়নের পূর্ব শর্ত এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। পঞ্চাশের দশকে ভারতবর্ষে দুটি ভূমিসংস্কার আইন পাস করা হলেও তা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছার বড়ই অভাব দেখা যায়। ভূমিসংস্কারের উদ্যোগ সফল না হওয়ার পিছনে অনেকে ভূমিসংস্কার আইনের দুর্বলতা, প্রশাসনিক, নির্লিপ্ততা প্রভৃতিকে মূলত দায়ী করেছেন। আবার কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, গ্রামে জমির অসম বণ্টন থাকবে, গ্রামীণ সম্পদ উচ্চবর্গের কুক্ষিগত থাকবে এবং তাঁদের রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় থাকবে। আবার একই সাথে গ্রামের নিম্নবর্ণে অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের কাছে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির সুফল পৌঁছে যাবে—এমনটি হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই স্তরবিভক্ত গ্রামীণ সমাজকে অটুট রেখে ভারতবর্ষে গ্রামোন্নয়নের (Real Rural Development) কথা ভাবা খুবই কঠিন।

৭৩.৭ সারাংশ

ভারতবর্ষ সহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বিশেষত গ্রামীণ এলাকাতে নানাধরনের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

ভারতবর্ষে গ্রামীণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীষীরা অনেক আগেই তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে গেছেন। তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য এবং আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামে বসবাসকারী দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জীবনধারার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন—সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি, নিবিড় কৃষি জেলা এবং নিবিড় কৃষি এলাকা কর্মসূচি, সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, গ্রামীণ যুবগোষ্ঠীর স্বনিযুক্তির জন্য শিক্ষণ কর্মসূচি, জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি। কর্মসূচীগুলি গ্রামীণ কতকগুলি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

এই সমস্ত বিশেষভাবে পরিকল্পিত কর্মসূচিগুলি ছাড়াও গ্রামোন্নয়নের জন্য বিস্তৃত কর্মসূচি হিসাবে শুধু হয়েছিল ভূমিসংস্কার এবং সমবায়।

কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগে গৃহীত বিভিন্ন ধরনের গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচিগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও সার্বিকভাবে সমাজ-বিজ্ঞানীদের বিচার-বিশ্লেষণ দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রায় প্রকৃতি উন্নয়নের তেমনভাবে সাফল্যলাভ করতে পারেনি।

৭৩.৮ অনুশীলনী

(১) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

(ক) গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে কী বোঝেন?

(খ) নিলোখেরি প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং নীতি কী ছিল?

(গ) এটাওয়া প্রকল্পের প্রবর্তক কে ছিলেন এবং এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য কী ছিল?

(ঘ) সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

(ঙ) বলবন্ত রাই মেহেতো কমিটির সুপারিশ কী ছিল?

(চ) নিবিড় কৃষি, জেলা কর্মসূচি কোন্ সালে শুরু হয় এবং এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য কী ছিল?

(ছ) সবুজ বিপ্লব বলতে কী বোঝেন?

(জ) সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির রূপায়ণের দায়িত্ব জেলা এবং ব্লক স্তরে কাদের ওপর বর্তায়?

(ঝ) ট্রাইসেম প্রকল্পের লক্ষ্য কী ছিল?

(ঞ) ভূমিসংস্কার কর্মসূচির মূল বিষয়বস্তু কী ছিল?

(ট) সমবায় প্রকল্পের লক্ষ্য কী ছিল?

(২) নিম্নলিখিত শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন :

(ক) ——— এর অভিমত অনুসারে সকল জাগতিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হল জনশিক্ষা।

(খ) গ্রামোন্নয়ন এবং স্বরাজ অর্জন ——— এর অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মূল বিষয়বস্তু ছিল।

(গ) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রবর্তিত হয় ——— সালে।

(ঘ) ——— সালে গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়।

(ঙ) ১৯৮৯ সালে এপ্রিল মাসে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প হিসাবে ——— ঘোষিত হয়।

(চ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কাল হয় ———।

(৩) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিশদ্ উত্তর দিন :

(ক) গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে কী বোঝেন? গ্রামীণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতীয় মনীষীদের বক্তব্য বিষয় কী ছিল?

(খ) সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে একটি আলোচনা করুন।

(গ) সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

(ঘ) গ্রামীণ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে ভূমিসংস্কার এবং সমবায় কর্মসূচির আলোচনা করুন।

(ঙ) স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন যে এই বিভিন্ন কর্মসূচিগুলির ফলে ভারতবর্ষের দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান প্রকৃত অর্থে উন্নত হয়েছে?

৭৩.৯ উত্তরমালা

(১) (ক) স্বামী বিবেকানন্দ; (খ) মহাত্মা গান্ধী; (গ) ১৯৮০ সালে; (ঘ) ১৯৮৩ সালে; (ঙ) জওহর রোজগার যোজনা; (চ) ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত।

৭৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) ডঃ অনিরুদ্ধ চৌধুরী : *ভারতের সমাজ প্রসঙ্গে*; চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০।

(২) ডঃ অংশুমান বসু ও দিলীপ কুমার ঘোষ : *ভারতের গ্রামোন্নয়ন পর্যালোচনা*; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫

(৩) U.R. Nahar & Ambika Chandrani : *Sociology of Rural Development*; Rawat Publications, 1995.